বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞানাচার্য

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার

রায়-সাহেব

জগদানন্দ রায়

প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস

২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২১/১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রক
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস (পাবলিকেশন) প্রাইভেট লিমিটেড
বারাণসী-শাখা, বারাণসী

উৎসর্গ

বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানে ও কর্ম্মে

যিনি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন,

বীণাপাণির সেই একনিষ্ঠ উপাসক

মাননীয় ডক্টর

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী

এম, এ; ডি, এল্; ডি, এস্-সি; সি, এস্, আই

মহোদয়ের কর-কমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ

অর্পিত হইল।

শ্রীজগদানন্দ রায়

ভূমিকা

অতি সঙ্কোচের সহিত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভুবন-বিখ্যাত আবিষ্কার-বিবরণী বঙ্গীয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সহজবোধ্য করিয়া বাঙ্গালায় লেখা যে কত কঠিন, গ্রন্থ-প্রণয়ন-কালে তাহা পদে পদে অনুভব করিয়াছি। প্রতি পৃষ্ঠায় হয় ত পাঠক গ্রন্থকারের অক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের কাহিনী নানা দেশে নানা ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু যে-দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে-দেশের ভাষায় তাহা প্রচারিত না হওয়া, বড়ই ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আচার্য্যবরের সকল আবিষ্কার-বিবরণ স্থান পায় নাই, কেবল কয়েকটি স্থূলতত্ত্বের কথাতেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং ইহা দ্বারা উক্ত ক্ষোভ দূর হইবার নহে। বাঙ্গালা ভাষাকে আর দৈন্যের অপবাদ দেওয়া যায় না, যে সকল সম্পদে ভাষা ঐশ্বর্য্যশালী হয়, তাহা ভাণ্ডারে সঞ্চীকৃত রহিয়াছে। এখন কোন যোগ্যতর ব্যক্তি আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কার-বিবরণী আমূল বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত করিলে ক্ষোভের প্রকৃত নিরাস হইবে।

গ্রন্থস্থ প্রবন্ধগুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ যোগরক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাই নাই। পাঠক যে-কোনো প্রবন্ধ পড়িয়া যাহাতে বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য যিনি পুস্তকখানির আগাগোড়া পর পর পড়িবেন তিনি নানা প্রবন্ধে একই কথার পুনরুক্তি দেখিতে পাইবেন। যদি ইহাকে দোষ বলা যায়, তবে তাহা ইচ্ছাকৃত বলিয়া পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

গ্রন্থে যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল তাহাদের কতকগুলি "প্রবাসী", "ভারতী", "উপাসনা", "বঙ্গভাষা" প্রভৃতি মাসিক পত্রে নানা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরম ভক্তিভাজন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং কাশিমবাজারাধিপতি স্বনামধন্য বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তজ্জন্যই এই সুযোগে তাঁহাদের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের উৎসাহ না পাইলে আমি কখনই গ্রন্থপ্রকাশে সাহস করিতাম না।

আশ্বিন, ১৩১৯
বোলপুর

জগদানন্দ রায়।

ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

"বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে অনেক বিষয় সহজ ভাষায় নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষ অংশে সার্ জগদীশচন্দ্রের আধুনিক আবিষ্কারের স্থূল বিবরণ স্থান পাইয়াছে। এগুলি প্রথম সংস্করণে ছিল না। ইহাতে পুস্তকের আকার বাড়িয়া গেল। সার্ জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কৃত আধুনিক তত্ত্বগুলির বিবরণ গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন। এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলে পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। গ্রন্থরচনার সময়ে যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় বক্তব্যগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

এই সুযোগে প্রকাশক মহাশয়দিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না এক এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ই নানা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার দৈন্য দূর করিবার সহায়তা করিতেছেন। তাঁহারা বঙ্গবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

শান্তিনিকেতন,

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

শ্রীজগদানন্দরায়।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড (বৈদ্যুতিক গবেষণা)

দ্বিতীয় খণ্ড (প্রাণী ও উদ্ভিদ্)

তৃতীয় খণ্ড (জড় ও জীব)

চতুর্থ খণ্ড (উদ্ভিদের দৈহিক ক্রিয়া)

বিজ্ঞানাচার্য্য

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

ভারতের সুসন্তান বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। বিদ্যাভিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার অদ্ভুত আবিষ্কারগুলির বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ও তাহাদের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে স্যার জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারগুলির দ্বারা প্রচলিত জীব-বিজ্ঞানের গবেষণার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলির প্রসার এত বৃহৎ এবং তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে এত সত্য নিহিত আছে যে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেও, আবিষ্কার-বিবরণী বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের প্রধান আবিষ্কারগুলির আভাস গ্রহণ করিয়াই পাঠক-পাঠিকাগণকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে।

গত শতাব্দীর শেষে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কাশীনাথ ত্রিম্বক তৈলঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি ভারতবাসী প্রত্নতত্ত্ব ও শাস্ত্রীয় গবেষণায় য়ুরোপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য প্রতিপত্তি সমগ্র ভারতবর্ষে একক জগদীশচন্দ্রই পাইয়াছেন। বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল জর্ম্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিস্ময়াবিষ্ট বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে বেদী গ্রহণ করিয়া নানা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভ্রমপ্রদর্শন, এবং পারিষদগণের উত্থাপিত কূটতর্কের শতধা খণ্ডন, কেবল

জগদীশচন্দ্রের গৌরবের কথা নয়,—এই ব্যাপারে সমগ্র ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের জয় বার্ত্তা ভারতে পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠায় মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি হউক, ইহাই জগদীশ্বরের নিকট আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩০এ নবেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পিতা স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসু, ফরিদপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। দৃঢ় এবং উদার চরিত্রের জন্য তিনি সর্ব্ব-জনপ্রিয় ছিলেন। গতানুগতিক-ভাবে যাহাতে পুত্রের শিক্ষা না হয়, ভগবানচন্দ্র তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে টেক্‌নিকাল বিদ্যালয় ছিল, বালক জগদীশচন্দ্র তাহাতে নিজের হাতে ছুতার ও কামারের কাজ করিতেন। সূক্ষ্ম যন্ত্র-নির্ম্মাণে জগদীশচন্দ্রের যে নিপুণতা দৃষ্ট হয়, তাহার বীজ সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম বিজ্ঞানশিক্ষা কলিকাতা সেণ্ট্ জেভিয়ার্স্ কলেজে আরম্ভ হয়। এই বিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট্ কলেজে ১৮৮১ অব্দে পদার্থ-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। বিলাত হইতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়া জজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন, ইহাই জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পিতা, পুত্রের যোগ্যতা বিশেষ রূপে জানিতেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে বৈজ্ঞানিক হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। ক্রাইষ্ট্ কলেজে জগদীশচন্দ্র ভুবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড্ র‍্যালের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া, প্রসিদ্ধ ক্যাভেণ্ডিস্ পরীক্ষাগারে নানা জটিল ও কৌশলসাধ্য পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্ররচনা-নৈপুণ্য সেই সুশিক্ষার ফল-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডগমনের তিন বৎসর পরেই ইনি লণ্ডনের বি, এস-সি ও কেম্‌ব্রিজের ট্রাইপস্ পরীক্ষায় একসঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইহার পরেই ১৮৮৫ অব্দে জগদীশচন্দ্র ভারতে প্রত্যাগত হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকার্য্যে যোগদান করেন।

এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারের অবস্থা এখনকার মত ভাল ছিল না; উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে জগদীশচন্দ্র তৎকালে ইচ্ছামত পরীক্ষাদি করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার মনোগত মৌলিক গবেষণাগুলিতেও হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। জগদীশচন্দ্রের চেষ্টায় এই অসুবিধা কিছুদিন পরে আংশিকভাবে দূরীকৃত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের আধুনিক উন্নত পরীক্ষাগার অনেক বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের নিকট ঋণী। তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া দেশীয় কারিগর দ্বারা, অনেক মূল্যবান্ সূক্ষ্ম যন্ত্র কলেজের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৮৯৫ অব্দে জগদীশচন্দ্র এসিয়াটিক্ সোসাইটি গৃহে তাঁহার মৌলিক গবেষণালব্ধ ফলের প্রথম বিবরণী পাঠ করেন। বিদ্যুৎ-উৎপাদক ঈথর-তরঙ্গের কম্পনের দিক্-পরিবর্ত্তন অর্থাৎ Refraction of the Electric Rays, তাঁহার সেই প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল। এই ব্যাপারে উপযুক্ত যন্ত্রাভাবে জগদীশচন্দ্রের বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে বৈদ্যুতিক রশ্মির দিক্ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ আবিষ্কার করিয়া, তিনি এই পরিবর্ত্তন ধরিবার একটি সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নিয়োলাইট্ ও সার্পেন্টাইন প্রভৃতি প্রস্তরের বৈদ্যুতিক কম্পন-পরিবর্ত্তন-ক্ষমতা এই সময়েই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পরেই বৈদ্যুতিক রশ্মিসম্বন্ধীয় মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ইঁহার দুইটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ইলেকট্রিসিয়ান্ নামক বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়।

পদার্থবিশেষের ভিতর দিয়া চলিবার সময়ে বৈদ্যুতিক রশ্মির পথ-পরিবর্ত্তন-নির্দ্ধারণ (The determination of the indices of Refraction of various substances for the Electric Rays) সেই সময়ে জগদীশচন্দ্রের আর একটি গবেষণার বিষয় ছিল।

ঈপ্সিত ফল লাভে কৃতকার্য্য হইলে, জগদীশচন্দ্র এই আবিষ্কার-বিবরণী ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসের রয়াল্ সোসাইটির এক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং পর বৎসর জুন মাসে সেই সভাতেই তাঁহার আবিষ্কৃত তরঙ্গ-পরিমাপক যন্ত্রসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছিল। কেবল ইহাই নহে,—জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিবরণী রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ইহা বিশেষ সম্মানের নিদর্শন বলিয়া স্বীকৃত হইত। কেবল ইহাই নহে,—জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটি হইতে কিছু বৃত্তি পাইতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের এই অযাচিত সম্মান লাভে গবর্ণমেণ্টও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। যাহাতে তিনি স্বচ্ছন্দে গবেষণা করিতে পারেন তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণাপটুতার প্রচুর নিদর্শন পাইয়া এই সময়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ জগদীশচন্দ্রকে ডি, এস্-সি, উপাধি প্রদান করেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টও উদাস ছিলেন না, আবিষ্কারের সৌকর্য্যের জন্য রাজকীয় ব্যয়ে ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই বৎসরই লিভারপুল্ বৃটিশ এসোসিয়েসনের এক বিশেষ অধিবেশনে বৈদ্যুতিক রশ্মিসম্বন্ধীয় তাঁহার যাবতীয় যন্ত্র ও পরীক্ষাদি বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে দেখাইয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বিদ্যুদ্‌বিদ্ হার্জ সাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণ যে-সকল পরীক্ষা দেখাইতে সুযোগ পান নাই, নিঃসহায় জগদীশচন্দ্র স্বহস্ত-রচিত ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা, সেই সকল সূক্ষ্ম পরীক্ষা অবলীলাক্রমে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন তার-হীন বার্ত্তাবহ যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, তখন কলিকাতা টাউন্ হলে জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক রশ্মির সাহায্যে কয়েকটি অদ্ভুত পরীক্ষা দেখাইয়াছিলেন। তাহার কথা আজও দর্শকগণ ভুলিতে পারেন নাই। তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্রের আবিষ্কারকগণের মধ্যে জগদীশচন্দ্র

অন্যতম ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক রশ্মিসম্বন্ধে আরো দুটি প্রবন্ধ রয়াল সোসাইটির অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে খুব আলোচনা হইয়াছিল।

এই বৈজ্ঞানিক অভিযানে জগদীশচন্দ্র য়ুরোপের প্রধান প্রধান পরীক্ষাগারগুলি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ফ্রান্স, জর্ম্মানি প্রভৃতি সকল দেশেরই প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আবিষ্কারকের নিকট নূতন তথ্যগুলির বিশেষ বিবরণ শুনিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরেই ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে জগদীশচন্দ্র ভারতে প্রত্যাগত হন।

স্বদেশে আসিয়া কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিরাম ছিল না। সেই বৎসর নভেম্বর মাসেই "কাচ ও বায়ুর রশ্মিপথ পরিবর্ত্তন শক্তির" (Refraction) উপর দুইটি সারগর্ভ প্রবন্ধ রয়াল্ সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার আরো দুইটি প্রবন্ধ উক্ত সভায় পঠিত হইয়াছিল। কোন গ্রন্থিযুক্ত পদার্থের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক রশ্মি চালনা করিলে রশ্মি-তরঙ্গের যে পরিবর্ত্তন হয় (Rotation of Polarisation of Electric waves by Twisted Structure) তাহাই পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে একটিতে আলোচিত হইয়াছিল। পাটের গোছায় গ্রন্থি বাঁধিয়া বা গ্রন্থিযুক্ত কাষ্ঠ ইত্যাদি লইয়া নানা সহজ পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যটি প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন।

নানাপ্রকার ধাতুচূর্ণের উপর বিদ্যুৎরশ্মির প্রভাব (Systematic study of the Cohering action of Different metals) নির্দ্দেশ করা জগদীশচন্দ্রের আর একটি গবেষণার বিষয় ছিল। কোন ধাতুচূর্ণের উপর বিদ্যুৎরশ্মি-পাত করিলে তাহার বিদ্যুদ্‌পরিচালন-শক্তি হঠাৎ কমিয়া যায়, বৈজ্ঞানিকগণ এপর্য্যন্ত এই ব্যাপারটিকে ধাতুমাত্রেরই

বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। অনেক ধাতু যে, বৈদ্যুতিক রশ্মিপাতে অধিকতর বিদ্যুৎ-পরিচালনক্ষম হইতে পারে, জগদীশচন্দ্র এই গবেষণায় শেষে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই সকল পরীক্ষা দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত ফল দেখিয়া বৈজ্ঞানিকমাত্রেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই আবিষ্কারের পরে, পদার্থ-বিশেষের বিদ্যুৎ পরিচালনা-শক্তির পূর্ব্বোক্ত হ্রাসবৃদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করার জন্য জগদীশচন্দ্র কিছুকাল গবেষণানিরত ছিলেন এবং এই গবেষণার ফল ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রয়াল সোসাইটিতে আলোচিত হইয়াছিল। বিদ্যুৎপরিচালন-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন যে, পদার্থের আণবিক অবস্থার ফল, জগদীশচন্দ্র এই আবিষ্কার দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন।

১৯০০ সালের বিখ্যাত প্যারিস মহাপ্রদর্শনীর বৈজ্ঞানিক মহাসম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হওয়ায়, ভারত গবর্ণমেণ্ট্ জগদীশচন্দ্র আর একবার য়ুরোপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বিদ্বজ্জন-সম্মিলনীতে ইঁহাকে সকল আবিষ্কারগুলির বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কার্য্যশেষে জগদীশচন্দ্র পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়াই "জীব ও জড় পদার্থের উপর বিদ্যুদ্রশ্মির সাড়ার একতা" (Similarity of Effects of Electric Stimulus on Inorganic and living substances) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ব্রাড়-ফোর্ড বৃটিশ এসোসিয়েসনের অধিবেশনে পাঠ করেন; এই প্রবন্ধটি আমূল জীববিদ্যা ও জড়বিদ্যা সম্বন্ধীয় নানা অভিনব তথ্যে পূর্ণ ছিল। জড় ও জীব বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় যে ঠিক একই প্রকারে সাড়া দিতে পারে, জগদীশচন্দ্র সাড়ালিপি অঙ্কন করিয়া তাহা এই সময়ে স্পষ্ট দেখাইয়া-ছিলেন এবং পদার্থের আণবিক বিকৃতি যে পূর্ব্বোক্ত সাড়ার মূল কারণ, তাহাও এই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। সুকৌশলে কৃত্রিম অক্ষিপর্দ্দা

নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দৃশ্য ও অদৃশ্য রশ্মির কার্য্য যে অবিকল প্রাণিচক্ষুরই অনুরূপ, জগদীশচন্দ্র তাহাও বৃটিশ এসোসিয়েসনস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলীকে এই সময়ে দেখাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে থাকিয়া ইহার পরেই জগদীশচন্দ্র ফোটোগ্রাফ-তত্ত্ব ও সজীব নির্জীব পদার্থে আঘাত-উত্তেজনাজাত ফলের একতা প্রভৃতি নানা পরীক্ষাদি দেখাইয়া বৈজ্ঞানিক-জগতে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠকপাঠিকাগণ তাহার কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন। আজও বৈজ্ঞানিক-সমাজে সেই সকল আবিষ্কার লইয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। লিনিয়ান্ সোসাইটির বিশেষ অধিবেশনে নানা পরীক্ষাদিসহ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মনে জগদীশচন্দ্র যে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিলেন, সেই বিস্ময় অদ্যাপি অপসৃত হয় নাই। জগদ্বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক হার্‌বার্ট্ স্পেন্‌সার্ মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়াও জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলির আলোচনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সুস্থ ও সবল থাকিলে তিনি যে, এই বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলির বিশদ আলোচনা করিতেন, মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে স্পেন্‌সার সাহেব জগদীশচন্দ্রকে তাহা জানাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযান শেষ করিয়া এবং পরে আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়া জগদীশচন্দ্র ভারতে প্রত্যাগত হইলে সর্ব্বত্রই পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল অবিরাম শ্রম করতঃ নানা বিষয়ের মৌলিক গবেষণা শেষ করিলে, দুর্দ্দমনীয় অনুসন্ধিৎসা বশতঃ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্তও তিনি নানা বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

সুদীর্ঘকাল আমেরিকা ও ইংলণ্ডে থাকিয়া জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারগুলির সুসাধনের খুব সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুসজ্জিত পরীক্ষাগারের সাহায্য ব্যতীত

তিনি অধিক কিছু সুবিধা পান নাই, বরং তাঁহাকে নানা অসুবিধাই ভোগ করিতে হইয়াছিল। সুপরামর্শ দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলি চাপা থাকিয়া যায়, তজ্জন্য কতকগুলি লোক যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কোন এক বিখ্যাত জীবতত্ত্ব-বিদ্ জগদীশচন্দ্রের একটি আবিষ্কারের বিবরণ কোন সুযোগে জানিতে পারিয়া, সেটাকে স্বাবিষ্কৃত ব্যাপার বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সত্যের জয় ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন জগতের অখণ্ড নিয়ম,—তাই জগদীশচন্দ্র নানা বাধাবিঘ্নের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অক্ষত-ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ প্রথমে জগদীশচন্দ্রের উপরে সুদৃষ্টিপাত করেন নাই। রয়াল সোসাইটি কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে গবর্ণমেণ্টও নানাপ্রকারে জগদীশচন্দ্রকে সম্মান দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গত ১৯০৩ সালে তিনি C. I. E. এবং ১৯১১ সালে C.S.I. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে ১৯১৭ সালে তাঁহাকে "স্যার" উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্রের বিদেশ ভ্রমণের বিরাম ছিল না। গত ১৯১৫ সালে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার আবিষ্কার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পরেও পৃথিবীর নানা বিজ্ঞান-সভা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বিলাতের বখ্যাত রয়াল সোসাইটি, তাঁহাকে সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া পরম সম্মানিত করিয়াছিলেন। এ সম্মান সাধারণ বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যে ঘটে না। পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাঁহারাই ইহা লাভ করেন। জগদীশচন্দ্রের এই সম্মানে সমগ্র প্রাচ্য দেশ আজ গৌরবান্বিত হইয়াছে।

কলিকাতার "বসু গবেষণা-মন্দির" (The Bose Research Institute) জগদীশচন্দ্রের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি। সরকারী কার্য্য হইতে

অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ১৯১৬ সালে এই বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। হাতের কাছে ভালো পরীক্ষাগার না থাকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে কত বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা তিনি ভুক্তভোগী হইয়া জানিতেন। তাই আজীবন-সঞ্চিত সর্ব্বস্ব দান করিয়া তিনি এই গবেষণা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু যুবক আজ সেখানে গবেষণা করিতেছেন। আমাদের তক্ষশিলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীনকালে দেশ-বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীদিগকে আহ্বান করিয়া নানা বিদ্যা শিক্ষা দিত। জগদীশচন্দ্রেব গবেষণা-মন্দির অতি অল্পকালের মধ্যেই ভারতের একটি মহাতীর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গিরিডি নামক স্থানে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ নবেম্বর ভারতের এই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাতেই সৌম্যমূর্ত্তি ও প্রতিভার দীপ্তবহ্নি জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার কথা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই কবিতা হইতে কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

> "হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জ্জনে
> 'উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!' ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
> পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হ'তে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
> ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
> একত্র দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
> আর বার এ ভারত আপনাতে আসুক্ ফিরিয়া
> নিষ্ঠায় শ্রদ্ধায় ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত-চিতে
> লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!"

বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ বা অদৃশ্যালোকের প্রকৃতি

যদি একগাছি লৌহতারের প্রান্তদ্বয় দুইটি কীলকে খুব শ্লথভাবে আবদ্ধ করিয়া, পরে তারটি টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেটি কিয়ৎকাল উভয় পার্শ্বে আন্দোলিত হইয়া স্থির হইয়া পড়ে,—শিথিল তারের কম্পন হইতে কোন শব্দই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু তার পর সেটি খুব টানিয়া কীলবদ্ধ করিলে, অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শেই তার স্পন্দিত হইয়া মধুর শব্দ উৎপাদন করিতে থাকে। এই সহজপরীক্ষণীয় ব্যাপারটির সহিত আমরা সকলেই চিরপরিচিত,—কিন্তু প্রথমে কীলকবদ্ধ তন্তুর নীরবতা এবং তৎপরক্ষণেই আবার তাহার মুখরতার কারণ কি ?

তদুত্তরে বিজ্ঞানবিদ্ বলেন,—কোন প্রকার তন্তু আন্দোলিত হইলেই পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিও তাহার সংস্পর্শে ঠিক সেই প্রকারে স্পন্দিত হইতে থাকে, তার পরে উক্ত বায়ুরাশির কম্পন শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিলেই, শব্দ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু মানব-শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বড়ই সঙ্কীর্ণ, এজন্য বায়ুর কম্পনমাত্রই কর্ণপ্রবিষ্ট হইলে শব্দ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। শিথিল তারের ধীর আন্দোলন হইতে যে-সকল বায়ু-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, স্পন্দনসংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত সেগুলি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াও অক্ষম শ্রবণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতে পারে না—এজন্য শ্লথ তারের শব্দ শ্রবণে আমরা চিরবঞ্চিত। এতদ্ব্যতীত বায়ুরাশির অতিদ্রুত স্পন্দন-জাত উচ্চ স্বরও আমরা শুনিতে পাই না,—অতি উচ্চ এবং অতি "খাদ" উভয় শব্দ গ্রহণেই আমাদের কর্ণ বধির,—এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী কেবল মাত্র এগারটি গ্রামের 'পরদা' দ্বারা যে সকল শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই মানব-শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।*

* পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশের অনধিক বার বায়ুর কম্পন হইলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই না—আবার সেকেণ্ডে ৩৪৮০০ বারের অধিক কম্পনজাত উচ্চশব্দও আমরা অনুভব করিতে পারি না।

বায়ুর স্পন্দন হইতে যে-প্রকার শব্দের উৎপত্তি হয়, ঈথর বা 'আকাশ নামক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ পদার্থের কম্পন হইতে' সেইরূপ আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঈথর-হিল্লোলগুলি বায়ুতরঙ্গের ন্যায় দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া আমাদের আলোক জ্ঞান উৎপাদন করে,—কিন্তু এখানেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের পূর্ব্ববর্ণিত অক্ষমতার ন্যায়, মানব চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিরও আমরা একটা সীমা দেখিতে পাই। এই সীমা কর্ণের শ্রবণশক্তির সীমা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অতি উচ্চ ও অতি 'খাদের' সুরের মধ্যবর্ত্তী এগারটি 'গ্রামের' শব্দ মানব-শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, কিন্তু মানব-চক্ষুর আকাশ-কম্পনজাত রক্তপীতাদিযুক্ত কেবল একটি গ্রামের আলোক দেখিতে পায়। প্রতি সেকেণ্ডে চারি শত লক্ষ কোটি বার * ঈথর স্পন্দিত হইতে থাকিলে, তদ্দ্বারা আমাদের দৃশ্যমান প্রাথমিক-আলোকের (রক্তবর্ণের) জ্ঞান জন্মে, তার পর স্পন্দনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে পীত, হরিৎ, ভায়লেট্ ইত্যাদি আলোকের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু স্পন্দনমাত্রা ক্রমে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার দ্বিগুণ হইয়া পড়িলে, মানব-চক্ষুর আর সেই স্পন্দনজাত আলোক অনুভূতির ক্ষমতা থাকে না।

স্থূল কথায় বলিতে গেলে,—রক্ত-বর্ণোৎপাদক স্পন্দন অপেক্ষা ধীর এবং ভায়লেট। আলোকজনক কম্পন অপেক্ষা দ্রুত, ঈথর কম্পন দ্বারা যে সকল বর্ণ বা আলোক উৎপন্ন হয়, মানব-চক্ষু তদ্দর্শনে বঞ্চিত। কেবল এক 'সপ্তক'-যুক্ত একটি হারমোনিয়ম পাইলে সুদক্ষ বাদককে যেমন ক্ষুদ্র যন্ত্রস্থ কয়েকখানি পরদা টিপিয়া কোন প্রকারে সঙ্গীত-লালসা তৃপ্ত করিতে হয়,—আমাদিগকেও সেই প্রকার বিধাতার ইচ্ছায় ক্ষুদ্রশক্তিযুক্ত চক্ষুর

*Four hundred billions.

সাহায্যে কেবল লোহিতাদি কয়েকটি মৌলিক বর্ণ ও তাহার কয়েকটি যৌগিক বর্ণ দেখিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত ধীর ঈথর-কম্পনজাত আলোক আমাদের চক্ষু বা অপর কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয় বলিয়া এবং আরও নানা কারণে অদৃশ্যালোকের প্রকৃতিগত কোন তথ্যই বহুকাল আবিষ্কৃত হইয়া উঠে নাই,—কেবল লোহিতালোক-উৎপাদক ঈথর স্পন্দন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ধীরস্পন্দন দ্বারা তার উৎপন্ন হয় ইহাই আমাদের পরিজ্ঞাত ছিল। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্য হার্জ (Hertz) ও তাঁহার শিষ্যবর্গ, উক্ত ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য ধীর ঈথর-স্পন্দনকে "বৈদ্যুতিক তরঙ্গ" আখ্যা প্রদান করিয়া তৎসম্বন্ধে অনেক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় ইচ্ছানুরূপ ধীর ঈথর-স্পন্দন উৎপাদন করিবার একটি উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিন্তনীয় বিঘ্ন আসিয়া তাঁহাদের মহদাবিষ্কার-সাধনের পথে বাধা প্রদান করিল;—গবেষণা অধিকদূর অগ্রসর না হইতেই হার্জ সাহেবের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুতে সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইয়া গেল। নিশ্চিন্তরূপে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করা এবং যন্ত্রযোগে তাহা ইন্দ্রিয়-গোচর করা অতীব দুঃসাধ্য, এই কারণে অনেক দিন অবধি পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্যালোক বা 'বৈদ্যুতিক' তরঙ্গসম্বন্ধীয় গবেষণার বিশেষ উন্নতি হয় নাই;—ভারতের সুসন্তান ডাক্তার জগদীশচন্দ্র স্বহস্তনির্ম্মিত যন্ত্র-সাহায্যে তৎসম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ই আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থায় কলিকাতার ন্যায় স্থানে বাস করিয়া একটা মহদাবিষ্কার সাধন করা বাস্তবিকই বিস্ময়ের কথা, এবং ইহা যে আবিষ্কর্ত্তার অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

জগদীশচন্দ্রের সমগ্র যন্ত্রটি সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, এবং ইহার প্রত্যেকটিকেই উদ্ভাবকের অসামান্য সূক্ষ্মদর্শন এবং শিল্পকুশলতার চরমাদর্শ

বলা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রথমাংশ দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় পূর্ব্ববর্ণিত ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য ঈথর-তরঙ্গ বা "বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ" উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উক্ত তরঙ্গের অস্তিত্ব-পরিজ্ঞাপন ও তৎসম্বন্ধীয় নানা পরীক্ষাদি-প্রদর্শনকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে।

তরঙ্গোৎপাদক প্রথম অংশটি এ-প্রকার সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, সামান্য চাপ দিয়া যন্ত্রস্থিত একটি 'স্প্রিং' ঈষৎ টিপিলেই দর্শকগণের অলক্ষ্যে অদৃশ্যালোকের "বৈদ্যুতিক-তরঙ্গে" সমগ্র পরীক্ষাগার পূর্ণ হইয়া পড়ে।

সাধারণ আলোকে, অতি মৃদু ঈথর-কম্পন হইতে আরম্ভ করিয়া, ভায়লেট্ বর্ণোৎপাদক তরঙ্গ অপেক্ষাও দ্রুততর নানা শ্রেণীর স্পন্দন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতে কেবল অদৃশ্যালোক-উৎপাদক ধীর তরঙ্গগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া বড়ই কঠিন হয়। জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, কেবলমাত্র অদৃশ্যালোক-উৎপাদক "বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ"-উৎপাদনের একটি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

এই যন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটির গঠননৈপুণ্য ও কার্য্য আরও বিস্ময়জনক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠনের দোষে আমরা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না,—ধীর বৈদ্যুতিক-তরঙ্গজাত আলোকসম্বন্ধে মানব-চক্ষু চির-অন্ধ। 'বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ' ব্যতীত বহুবিধ অদৃশ্য আলোক বিদ্যমান আছে, আমরা অসীম আলোক-সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়াও অন্ধবৎ অবস্থায় আছি।" জগদীশচন্দ্র এক 'কৃত্রিম চক্ষু' নির্ম্মাণ করিয়া সেই অসীম ও অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোকরাশিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—আমাদের অক্ষি-গোলকের পশ্চাদ্ভাগে একখানি পর্দ্দা থাকে, বহিঃস্থ পদার্থের আলোক-মন্ন

ছবি সেই পর্দ্দায় পতিত হইলেই তাহার রাসায়নিক অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পর্দ্দা ব্যাপ্ত স্নায়ুজাল উত্তেজিত হইয়া, (সম্ভবতঃ) কোন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের অংশবিশেষে আঘাত প্রদান করিতে থাকে;—মস্তিষ্কের এক নির্দ্দিষ্ট অংশের এই প্রকার উত্তেজনাই আমাদের দৃষ্টি-জ্ঞানের কারণ। জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় যন্ত্রটির কার্য্য কতকটা অক্ষি-তিরস্করিণীতে (Retina) পতিত আলোকের অনুরূপ। অক্ষিগোলকের পশ্চাৎস্থিত পর্দ্দার ন্যায়, ইহাতে রাসায়নিক-দ্রব্য-গঠিত একখানি পর্দ্দা সংলগ্ন থাকে, অদৃশ্যালোক-উৎপাদক বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ তাহাতে পতিত হইবামাত্র, দুইটি তার দ্বারা বিদ্যুৎ বাহিত হইয়া তাহা যন্ত্রস্থিত একটি তড়িদ্বীক্ষণ (Galvanometer) যন্ত্রকে আন্দোলিত করিতে থাকে কিন্তু এই আন্দোলন অতীব মৃদু,—এই নিমিত্ত ইহা হঠাৎ দর্শকগণের চক্ষে পতিত হয় না। এজন্য তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রে * একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ আবদ্ধ থাকে, এবং তাহার পার্শ্বেই একটি দীপ সজ্জীকৃত রাখা হয়, পরীক্ষা আরম্ভের পূর্ব্বে স্থির দর্পণ হইতে দীপালোক-রশ্মি প্রতি-ফলিত হইয়া সম্মুখস্থ দেওয়াল বা পর্দ্দায় আসিয়া অচঞ্চল অবস্থায় পতিত থাকে, তার পরে পরীক্ষাকালীন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তড়িদ্বীক্ষণের সহিত দর্পণ আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিলেই, দেওয়ালে পতিত প্রতিফলিত আলোকও দর্শকগণের সম্মুখে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এপর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য ঈথর-তরঙ্গের যে কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, জগদীশচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহার অস্তিত্ব দর্শক-মাত্রকেই প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন।

এখন পাঠক-পাঠিকাবর্গ প্রশ্ন করিতে পারেন,—"যন্ত্রজাত তরঙ্গ যে বাস্তবিকই ধীর ঈথর-কম্পনোৎপন্ন অদৃশ্যালোকের তরঙ্গ, তাহার প্রমাণ

* এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি মৃদু তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্বের লক্ষণ এবং তাহার শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায়।

কোথায়? এটি রহস্যময়ী প্রকৃতির অনন্ত রহস্য ভাণ্ডারবিচ্ছিন্ন কোনও একটা অপরিজ্ঞাত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার হইতে পারে না কি?" নানা পরীক্ষা দ্বারা সাধারণ আলোক-তরঙ্গের সহিত বৈদ্যুতিক স্পন্দনের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য এই কলের সাহায্যে সপ্রমাণিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গের সাদৃশ্যের প্রমাণ পাঠক পর প্রবন্ধপাঠে জানিতে পারিবেন।

বৈদ্যুতিক-তরঙ্গই কি অদৃশ্যালোকোৎপাদক আকাশতরঙ্গ ?

জগদীশচন্দ্র তাঁহার যন্ত্রসাহায্যে কি প্রকারে বৈদ্যুতিকতরঙ্গ উৎপাদন করিয়া তাহার অস্তিত্বের সহজ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—এই বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ যে ধীর ঈথর-স্পন্দনজাত অদৃশ্যালোকের তরঙ্গ, তাহার প্রমাণ কোথায়? জগদীশচন্দ্রের অদম্য উৎসাহ কেবল বৈদ্যুতিক হিল্লোল উৎপাদন-প্রসঙ্গে পর্য্যবসিত হয় নাই, অদৃশ্যালোক-তরঙ্গ ও বৈদ্যুতিক-হিল্লোল যে, একই শ্রেণীর আকাশ-স্পন্দন হইতে উৎপন্ন, জগদীশচন্দ্র তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহুবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানের একটা প্রধান অঙ্গ। বিধাতা নানা সজীব ও নির্জীব পদার্থ সৃষ্টি করিয়া যথেচ্ছা জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক সেইগুলি বহু যত্নে আহরণ করিয়া তাহাদের গুণ, ধর্ম্ম ও পরস্পরের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন। বাহ্য অনৈক্য বৈজ্ঞানিকগণের নিকট একটা তুচ্ছ ব্যাপার। রসায়নশাস্ত্র প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে এই শ্রেণীবিভাগের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়;—ক্লোরিন্ (Chlorine) একটা বায়বীয় পদার্থ এবং আইওডিন (Iodine) একটা কঠিন রূঢ় জিনিস, এই মৌলিক পদার্থদ্বয়ের বাহ্য অনৈক্যসত্ত্বেও ইহাদের আণবিক গঠন ও রাসায়নিক ধর্ম্মের অভিন্নতা হেতু জড়বিদ্গণ পদার্থ দুইটিকে একই শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর অক্ষমতাপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য হইলেও, ইহা যে সাধারণ আলোকোৎপাদক ঈথর-স্পন্দনবিশেষ, জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র-সাহায্যে তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়।

পূর্ব্বেই পাঠক পাঠিকাগণ দেখিয়াছেন, মানব-দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি অতীব সঙ্কীর্ণ; লোহিতপীতাদি কেবলমাত্র কয়েকজাতীয় আলোক আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; কাজেই, কেবল সেই অক্ষম চক্ষুর সাহায্যে লোহিতবর্ণোৎপাদক ঈথর-স্পন্দন অপেক্ষা মৃদু-স্পন্দন অনুভব করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই জন্য অপর নির্জ্জীব পদার্থের উপর বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য্য আবিষ্কার করিয়া এবং সেইগুলির সহিত তদবস্থ দৃশ্যমান আলোকের কার্য্যের সাদৃশ্য বিচার করিয়া, তারপরে নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ বাস্তবিকই মৃদু ঈথর-তরঙ্গ কি না স্থির করা আবশ্যক।

সাধারণ আলোকের স্থূলতঃ চারিটি প্রধান কার্য্য আমরা সহজে দেখিতে পাই।

১ম,—বর্ণোৎপাদন; ২য়,—দর্পণাদিতে পতিত রশ্মির প্রতিফলন; ৩য়,—বিবর্ত্তন অর্থাৎ অসমঘন পদার্থে প্রবেশকালে আলোকরশ্মির পথ পরিবর্ত্তন; ৪র্থ,—কয়েকজাতীয় স্বচ্ছ ভাস্বর (Crystals) পদার্থে সাধারণ আলোকরশ্মিমাত্রেরই সমতলীভবন (Polarisation) দৃশ্যমান আলোকমাত্রেরই এই কয়েকটি বিশেষ ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত আলোক অর্থাৎ আকাশ-স্পন্দনের আর একটি গুণ আছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে অল্পই জানা আছে। এই প্রভাবের বলেই প্রাণী জীবিত রহিয়াছে, সজীব, নির্জ্জীব বলে সর্ব্বদা স্পন্দিত হইতেছে।

অধ্যাপক হার্ট্জ, যে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা এক গজ হইতেও অধিক দীর্ঘ। এই প্রকাণ্ড তরঙ্গ লইয়া পরীক্ষা করা ও তাহা হইতে পদার্থের আলোকগত বিবিধ ধর্ম্ম পরিমাণ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন গুণ নির্ণয় করা অনেক সময়ে অসম্ভব। এই জন্য আচার্য্য বসু বিবিধ উপায়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপাদন করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের

যন্ত্রের তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ-সাগরে ৫০০ কোটি বার স্পন্দিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গসাহায্যে তিনি অনায়াসে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। যাহা হউক ডাক্তার বসু প্রথম প্রস্তাবোল্লিখিত যন্ত্রসাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া তাহা সেই তরঙ্গপরিজ্ঞাপক দ্বিতীয় যন্ত্রের যথারীতি প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন; এবং তার পর বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ দ্বারা যন্ত্রস্থিত ক্ষুদ্র দর্পণটি আন্দোলিত হইয়া সম্মুখস্থ পর্দ্দায় চঞ্চল আলোক প্রতিফলিত করিতে থাকিলে, কোন্ কোন্ পদার্থ দ্বারা বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের গতিরোধ হয় এবং কোন্ পদার্থের মধ্য দিয়াই বা তরঙ্গ অবাধে বহির্গত হইতে পারে তিনি তাহা স্থির করিয়াছিলেন।

একখণ্ড স্থূল ধাতুফলক দ্বারা তরঙ্গের পথ অবরোধ করা হইয়াছিল। কোন অস্বচ্ছ পদার্থ সাধারণ আলোকের পথে ধরিলে, আলোক যেমন তাহা ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে না, এস্থলেও ঠিক সেইপ্রকার দেখা গিয়াছিল। স্থূল ধাতুফলক দ্বারা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অবরুদ্ধ হইয়াছিল, কাজেই তরঙ্গের অভাবযুক্ত সেই তরঙ্গবিজ্ঞাপক যন্ত্রের আলোকবিম্ব পর্দ্দায় স্থিরভাবে ছিল।

তার পর একখণ্ড ইষ্টক দ্বারা তরঙ্গ-পথ অবরুদ্ধ করা হইল; পাঠক অবগত আছেন, ইষ্টক সাধারণ আলোকে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ; দৃশ্যমান আলোক কোনক্রমেই উক্ত পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ ইহার ব্যবধান অপ্রতিহতভাবে অতিক্রম করিয়া পরিজ্ঞাপক যন্ত্রস্থ দর্পণ সজোরে আন্দোলন করিয়াছিল।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—যদি বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ আলোকোৎপাদক ঈথর-তরঙ্গজাতীয় হয়, তবে এপ্রকার একটা বিসদৃশ ব্যাপার সংঘটন সম্ভবপর কি? যে-পদার্থ সাধারণ আলোকের নিকট

অস্বচ্ছ, একই ঈথরকম্পনজাত বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ বা অদৃশ্যালোকে তাহা কি স্বচ্ছ হইতে পারে ?

সহসা দেখিলে এই প্রকার সন্দেহ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু ; কোন এক নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আকাশ-কম্পনজাত আলোক পদার্থবিশেষের মধ্য দিয়া অবাধে গমন করিতে পারে বলিয়া তদপেক্ষা দ্রুততর বা ধীরতর কম্পনজাত আলোকও যে সেই পদার্থ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে বহির্গত হইবে, আলোক-বিজ্ঞানে এ প্রকার কোন নিয়ম নাই, বরং তাহার বিপরীত কার্য্যই দেখা যায়। কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থ দিয়া আলোক-বিশেষের অবাধ গমন, আবার তদ্দ্বারাই অপর আলোকের অবরোধ হওয়ার উদাহরণ, সাধারণ দৃশ্যমান আলোকেও বড় দুর্ল্লভ নয়।

একটা সহজসাধ্য পরীক্ষার কথা বলিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। কোন প্রকারে সবুজ ও লোহিতালোক উৎপাদন করিয়া * পরে উক্ত আলোকদ্বয় একখানি পর্দ্দার পৃথক্ পৃথক্ অংশে পাতিত করিয়া একখণ্ড লোহিত কাচ দ্বারা ক্রমে আলোকদ্বয়ের পথ অবরোধ করিলে, এক অভাবনীয় ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। লোহিতালোক উক্ত রক্তবর্ণের কাচের মধ্য হইতে অবাধে বহির্গত হইয়া পর্দ্দায় পতিত হইতে থাকে, কিন্তু সবুজ আলোক কোনক্রমেই কাচ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে, একই লোহিত কাচখণ্ড হরিদালোকে অস্বচ্ছ, আবার লোহিত আলোকের নিকট স্বচ্ছ হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং আচার্য্য বসুর পরীক্ষায় সাধারণ আলোকে অস্বচ্ছ ইষ্টকখণ্ডটি বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের নিকট স্বচ্ছ হওয়া বিস্ময়কর নয় ; পক্ষান্তরে সাধারণ আলোকের তরঙ্গ-বিশেষ যেমন কোন পদার্থের মধ্য দিয়া অবাধে বহির্গত হয়, আবার

---

* একখণ্ড লোহিত কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিলে বহির্গত আলোক লোহিত হইয়া যায়,—এই প্রথায় সবুজ কাচের দ্বারা সহজে হরিদালোকে উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

কোনও পদার্থে যেমন অবরোধ প্রাপ্ত হয়, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গেও ঠিক তদনুরূপ ঘটনা লক্ষিত হয় বলিয়া, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ যে সেই ঈথরকম্পন-জাত অদৃশ্যালোক-তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাহা অবিসম্বাদে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল।

পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, সাধারণ দর্পণ বা মসৃণ ধাতুফলকে বক্রভাবে আলোকরশ্মি পাতিত করিলে, নিকটবর্ত্তী দেওয়াল বা অপর পদার্থে আলোক প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। এই প্রতিফলনের একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে ;—দর্পণের যে স্থানে আলোকরেখা পতিত হয়, সেই স্থল হইতে ইহার তলের সহিত এক লম্বরেখা কল্পনা করিলে, আপতিত ও প্রতিফলিত আলোকরেখাদ্বয় সকল ক্ষেত্রেই উক্ত কল্পিত লম্ব-রেখার সহিত সমান সমান কোণ উৎপাদন করিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক-তরঙ্গও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই প্রতিফলন সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় আচার্য্য বসু প্রথমে তাঁহার উৎপাদক যন্ত্রদ্বারা তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া, ইহা একখণ্ড ধাতব দর্পণে পাতিত করিয়াছিলেন, এই ধাতব ব্যবধানে তরঙ্গ অবরুদ্ধ হইয়া গেল ; কাজেই, দর্পণের পশ্চাৎস্থিত সেই বিজ্ঞাপক যন্ত্রে তরঙ্গের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না, কিন্তু ঐ প্রকার অবস্থায় দর্পণে পতিত হইলে সাধারণ আলোক যেদিকে প্রতিফলিত হয়, ঠিক সেই দিকে তরঙ্গবিজ্ঞাপক যন্ত্রটি রাখায় তরঙ্গের অস্তিত্বলক্ষণ স্পষ্টই দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার পরে তরঙ্গের আপত (Angle of incidence) এবং প্রতিফলন (Angle of Reflection) কোণদ্বয় পরিমাপ করায় উভয় কোণেরই পরিমাণ সমান দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

এই ত গেল প্রতিফলনের কথা ; এখন বিবর্ত্তন অর্থাৎ কোন পদার্থ হইতে অসমঘন পদার্থে প্রবেশকালে আলোকপথের যে পরিবর্ত্তন (Refraction) দেখা যায়, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গেও তাহা লক্ষিত হয় কি না দেখা যাউক।

এই বিষয়টি বুঝিবার পূর্ব্বে আলোকবিবর্ত্তন-ব্যাপারটার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, একটি সরল দণ্ড বক্রভাবে আংশিক জলমগ্ন করিলে, দণ্ডটিকে তখন আর সরল বলিয়া বোধ হয় না, তাহার জলনিমজ্জিত অংশটিকে ই বাঁকা দেখায়। এই দৃষ্টি-বিভ্রমটি আলোক-বিবর্ত্তন দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। দণ্ডে জলনিমজ্জিত অংশ হইতে এক নির্দ্দিষ্ট সরল পথে আসিয়া দর্শকের নয়নগোচর হইবার পূর্ব্বে, আলোক রশ্মি অসমঘন বায়ুর মধ্যে পড়ে বলিয়া, জলের উপরিভাগ হইতে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়া উহা চক্ষে পতিত হয়। কিন্তু আলোকরশ্মি চক্ষে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে রেখাক্রমে আগমন করে, দর্শক আলোকোৎপাদক পদার্থটিকে সেই রেখার বর্দ্ধিতাংশে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।* এই জন্য পূর্ব্বাবলম্বিত পথ হইতে ভ্রষ্ট রশ্মি দ্বারা দণ্ডের নিমজ্জিত অংশটিকে স্বস্থানভ্রষ্ট দেখায়।

আলোকবিবর্ত্তনের আর একটি উদাহরণ আমরা "আতসী" কাচের কার্য্যে দেখিতে পাই। বায়ু হইতে উক্ত স্থূলমধ্য (Convex) কাচখণ্ডে প্রবেশ করিবার সময়ে এখানেও আলোকরশ্মির পথপরিবর্ত্তন ঘটে। বায়ুতে যে সরলপথ অবলম্বন করিয়া রশ্মি চলিয়া আসিতেছিল, কাচ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই তাহা ভিন্নপথাবলম্বী হইয়া পড়ে; তার পরে আবার কাচ হইতে বহির্গত হইয়া বায়ু-প্রবেশকালে তাহা সে পথও ত্যাগ করিয়া আবার এক নূতন তৃতীয় পথে চলিতে থাকে। কাচখণ্ডের গঠনচাতুর্য্যে আলোকরশ্মির এই উভয় বিবর্ত্তন একই দিকে হয় বলিয়া পূর্ব্বের সরল ও সমান্তর রশ্মির সকল একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে পুঞ্জীভূত হইয়া সেই স্থানের

* এই জন্য সূর্য্যরশ্মি দর্পণ হইতে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষুপাতিত হইলে আলোকোৎপাদক সৌরচ্ছবি সেই প্রতিফলিত রশ্মির বর্দ্ধিতাংশে অর্থাৎ দর্পণের পিছনে দেখা গিয়া থাকে।

তাপালোক বৃদ্ধি করে। এই জন্য "আতসী" কাচ সূর্য্যকিরণে উন্মুক্ত রাখিলে তাহার পৃষ্ঠপতিত সকল রশ্মিকে এক বিন্দুতে সঞ্চিত হইতে দেখা যায়।

আতসী বা স্থূলমধ্যে কাচের আরও একটা কার্য্য আছে: ইহার পূর্ব্ববর্ণিত রশ্মিকেন্দ্রে (Focus) একটি উজ্জ্বল দীপশিখা রাখিলে দীপের নানাদিগ্‌গামী রশ্মি কাচের মধ্য দিয়া বহির্গত হইলেই, উল্লিখিত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত প্রথায় এক একটি সমান্তর পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। আঁধারে-লণ্ঠনের (Bull's eye) সম্মুখে এই প্রকার স্থূলমধ্য কাচ আবদ্ধ থাকে বলিয়া, আলোক-কেন্দ্রস্থিত দীপের রশ্মিজাল কাচ হইতে বহির্গত হইয়াই এক সমান্তরপথ-ক্রমে বহুদূর যাইতে সক্ষম হয়। অস্বচ্ছ পিচ্, গন্ধক প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ দ্বারা স্থূলমধ্য ফলক প্রস্তুত করিয়া আচার্য্য বসু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সাধারণ আলোক-তরঙ্গের ন্যায় বৈদ্যুতিক-তরঙ্গকেও পূর্ব্ববর্ণিত বিবর্ত্তিত-প্রথায় পুঞ্জীভূত ও সমান্তরপথাবলম্বী হইতে দেখা যায়।

সাধারণ আলোকের রশ্মিপথ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা সময়ে, নানা ব্যাপারের মধ্যে ইহার একটি বিশেষত্ব সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে: কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থে প্রবেশকালে আলোকপথের যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন ঘটে, পদার্থান্তরে প্রবেশ করিবার সময়ে কিছুতেই তাহা সেই পরিমাণ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। প্রত্যেক ভিন্নজাতীয় পদার্থে আলোকপথ-পরিবর্ত্তনের পরিমাণ চিরনির্দ্দিষ্ট আছে। বৈদ্যুতিক-তরঙ্গে আলোকরশ্মির এই সাধারণ ধর্ম্মই স্পষ্টই লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বিজাতীয় পদার্থে প্রবেশকালে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের পথও এক এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

কয়েকজাতি স্বচ্ছ ভাস্বর পদার্থে প্রবিষ্ট হইলে সাধারণ আলোকরশ্মি

যে প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন (Polarisation) লক্ষিত হয়, তদবস্থায় বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের পরিবর্ত্তনাদি নির্ণয় করিবার জন্য আচার্য্য বসু অনেক গবেষণা করিয়াছেন। পর প্রবন্ধে তাহার বিশেষ বিবরণ এবং বৈদ্যুতিক-তরঙ্গসম্বন্ধীয় অপর জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইল।

বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের সমতলীভবন

সাধারণ আলোক-তরঙ্গের ন্যায় বৈদ্যুতিক-তরঙ্গও যে, একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রতিফলিত ও বিবর্ত্তিত হয়, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখন বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ সমতলীকরণ (Polarisation) প্রসঙ্গে আচার্য্য বসুর আবিষ্কার ও পরীক্ষাদির বিষয় আলোচনা করা যাউক।

বিষয়টি বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ সমতলীভবন ব্যাপারটা কি, জানা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণ আলোক-রশ্মিমাত্রেই ঈথর-স্পন্দন হইতে উৎপন্ন। বেহালার তার আন্দোলিত করিলে, তারটি যেমন ঊর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব প্রভৃতি সকল দিকে ও সকল সমতলেই স্পন্দিত হইতে থাকে, ঈথরও কতকটা সেই প্রকারে কম্পিত হইয়া আলোকোৎপাদন করে।

একটা উদাহরণ দিলে, বিষয়টা আরও পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা; প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পের কেশরগুলি, যেমন পুষ্প-কেন্দ্রের সকল দিকই পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে এবং কেন্দ্রের মধ্য দিয়া যতগুলি সমতল কল্পনা করিতে পারা যায়, তাহার প্রত্যেক তলেরই প্রান্তে যেমন কেশর দেখা যায়, আলোকরশ্মিস্থ কোনও বিন্দুর অবস্থাও কতকটা তদ্রূপ। প্রত্যেক বিন্দু হইতে বিভিন্ন সমতলস্থ অসংখ্য ঈথর-তরঙ্গ সকল দিক এবং সকল সমতল হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া একটা ঈথরময় কাল্পনিক ঘনবিন্যস্তকেশর কদম্ব পুষ্পের রচনা করে। ঈথরের এই সর্ব্বদিগ্‌গামী স্পন্দনগুলি এক সমতলস্থ করিলে, অর্থাৎ কোন উপায়ে এক নির্দ্দিষ্ট সমতলস্থ ঈথরতরঙ্গকে যথাপূর্ব্ব রাখিয়া, অবশিষ্ট নানা সমতলস্থ স্পন্দন অবরুদ্ধ করিলে, যে আলোক উৎপন্ন হয় তাহাকে সমতলীভূত-আলোক (Polarised light)

বলা গিয়া থাকে। একখণ্ড কাষ্ঠফলকে ঠিক পূর্ব্বোক্ত বেহালার তারের স্থূলতার অনুরূপ প্রশস্ত একটি লম্বা ছিদ্র করিয়া, তন্মধ্যে স্পন্দিত তারটি প্রবিষ্ট করাইলে, স্থানাভাব প্রযুক্ত সেটি আর পার্শ্বে আন্দোলিত হইতে পারে না ;—ইহাঁর স্পন্দন কেবল সেই ছিদ্রপথাবলম্বী হইয়া ঊর্দ্ধাধোভাবে বিস্তৃত একটি নির্দ্দিষ্ট সমতলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সমতলীভূত আলোকোৎপাদক ঈথরস্পন্দনের প্রকৃতিও কতকটা ঐরূপ।

টুর্‌মালীন (Tourmaline) প্রভৃতি কয়েকজাতীয় স্বচ্ছ আকরিক ভাস্বর পদার্থের মধ্য দিয়া সাধারণ আলোকরশ্মিপ্রকৃতিস্থ থাকিয়া বাহির হইতে পারে না। উদাহৃত বেহালার তারটিকে যেমন পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠফলকস্থ ছিদ্রে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কেবল সেই ছিদ্রপথস্থ সমতলে স্পন্দিত হইতে দেখা গিয়া থাকে, টুর্‌মালীন প্রস্তরে বাধা পাইয়া ঈথরস্পন্দনের অনেক অংশকে তদ্রূপ বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। যে স্পন্দনগুলি টুর্‌মালীন ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে, সেগুলি সর্ব্বতোমুখে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত না হইয়া কেবল এক তলে স্পন্দন আরম্ভ করে।* এই একসমতলস্থ ঈথরস্পন্দনজাত আলোককে, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সমতলীভূত আলোক এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। *

দুইটি আলোকের মধ্যে কোন্‌টি সমতলীভূত এবং কোন্‌টি বা সাধারণ আলোক, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত স্থির করা অসাধ্য। নগ্ন চক্ষে উভয় আলোকের মধ্যে কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না ; এজন্য সমতলীভূত আলোক পরীক্ষার জন্য একটি যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। একখানি টুর্‌মালীন দ্বারাই এই পরীক্ষা সম্পাদিত হইতে পারে। এই টুর্‌মালীনখণ্ডকে বিজ্ঞানবিদগণ বিশ্লেষক (Analyser) বলিয়া থাকেন।

* এতদ্ব্যতীত আলোক সমতলীকরণের আরও অনেক উপায় আছে। প্রতিফলিত সাধারণ আলোককেও অল্পাধিক পরিমাণে সমতলীভূত দেখা দিয়া থাকে।

পাঠক ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছেন, সাধারণ আলোকের পথে এক খণ্ড টূর্‌মালীন ধরিলে, এক নির্দ্দিষ্ট তলস্থিত স্পন্দনগুলিই বহির্গত হইতে পায়। টূরমালীনের অক্ষরেখা সমান্তরালভাবে অবস্থিত হইলে, প্রথম টূর্‌মালীন হইতে বহির্গত স্পন্দনগুলি দ্বিতীয় টূরমালীন ভেদ করিয়া যায়। কিন্তু উভয় অক্ষরেক্ষা তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত হইলে তাহা আর দ্বিতীয় টূর্‌মালীন সম্পূর্ণ ভেদ করিতে পারে না।

এই অবস্থায় একটা নূতন ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ;—এস্থলে সমতলীভূত স্পন্দনমাত্রই বিশ্লেষক দ্বারা অবরুদ্ধ না হইয়া আংশিক ভাবে লয়প্রাপ্ত হয়। বিশ্লেষকের অক্ষরেখা যত প্রথম ফলকের অক্ষরেখার সহিত লম্বভাবে অবস্থিত হইবার জন্য অগ্রসর হয়, লুপ্তস্পন্দনের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কোনও স্বচ্ছ ভাস্বর-পদার্থ আলোক-সমতলীকরণক্ষম কি না জানিতে হইলে, অনেক সময়েই পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এই পরীক্ষায় প্রথমতঃ অক্ষরেখা-দ্বয় পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করাইয়া দুইখানি টূর্‌মালীন প্রস্তর সজ্জিত রাখা হয় ; বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থায় প্রথম ফলকটি দ্বারা সমতলীকৃত ঈথর-স্পন্দন, বিশ্লেষকে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার সম্মুখে চক্ষু রাখিয়া পরীক্ষা করিলে আলোকের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। তার পরে এই দুই প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে পরীক্ষাধীন অজ্ঞাতধর্ম্ম পদার্থটি স্থাপিত করিলে, যদি আলোক-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে মধ্যস্থিত পদার্থটিই যে, পূর্ব্বের সমতলীভূত ঈথর-স্পন্দনগুলিকে স্বীয় অক্ষরেক্ষার অনুরূপে নূতন সমতলীভূত করিতেছে এবং তজ্জন্যই যে পূর্ব্বাবরুদ্ধ স্পন্দন অধুনা বিশ্লেষকের বাধা অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থাপিত ফলকদ্বয়ের মধ্যে

অজ্ঞাতধর্ম্ম পদার্থ রাখিয়া, তাহার আলোক-সমতল করণের শক্তি স্থির করা হইয়া থাকে।

আচার্য্য বসু ঠিক পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করিয়া, সাধারণ আলোকোৎপাদক ঈথর-তরঙ্গের ন্যায় বৈদ্যুতিক-তরঙ্গেরও সমতলীভূত হওয়ার বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় আচার্য্য বসু প্রথমতঃ লম্বভাবে স্থাপিত দুইখানি নিমেলাইট্ (Nemalite) প্রস্তর-ফলকের অভিমুখে, তাঁহার সেই তরঙ্গোৎপাদক যন্ত্র হইতে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ চালিত করিয়াছিলেন। এই প্রস্তর তড়িৎ-তরঙ্গে স্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও, তাহাদের বাধা অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইতে পারে নাই। কিন্তু তৎপরে তড়িৎ তরঙ্গ সমতলীভূত করিবার উপযোগী আইডোক্রেস (Idocrase) নামক প্রস্তর বিশেষ প্রথমোক্ত প্রস্তরযুগলের ব্যবধানে তির্য্যকভাবে স্থাপিত করিলেই, আচার্য্য বসুর সেই তরঙ্গ-বিজ্ঞাপক "কৃত্রিম চক্ষুতে" তরঙ্গের অস্তিত্ব স্পষ্টই লক্ষিত হইয়াছিল।

সমতলীভূত আলোকোৎপাদক পদার্থমাত্রেরই একটা সাধারণ বিশেষত্ব আছে। এই শ্রেণীর পদার্থের অণু সকল কোন স্থানেই সমঘন-বিন্যস্ত দেখা যায় না। কোনও বিশেষ কারণে ইহাদের একাংশের অণু সকল অপরাংশের তুলনায় ঘন বা বিরল-বিন্যস্ত থাকে। এইজন্য পদার্থের আনবিক বিন্যাসের বৈচিত্র্যেই, তাহাদের সমতলীভূত আলোকজনন-শক্তির মূল কারণ বলিয়া আলোকতত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন। প্যারাফিন (Paraffin) নামক একপ্রকার প্রস্তরজ আকরিক পদার্থের আণবিকবিন্যাস তাপসংযোগে ক্ষণিক অ-সমঘন করিয়া, সমতলী-ভবনের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি যে, বৈদ্যুতিক তরঙ্গপ্রসঙ্গেও প্রযোজ্য, তাহাও আচার্য্য বসু প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া কোন্ কোন্ পদার্থে

উহা সমতলীভূত হয়, তাহা স্থির করিতে আচার্য্য বসুকে বহু দিন পরীক্ষায় আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমেই টুর্‌মালীন প্রস্তর লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রস্তর অদৃশ্যালোক সমতলীভূত করিতে পারে নাই। * তার পরে বহু পরীক্ষাদি দ্বারা নিমেলাইট ও সারপেণ্টাইন (Serpentine) নামক দুই জাতীয় প্রস্তর ঈপ্সিত কার্য্যের উপযোগী দেখিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উভয় প্রস্তরই দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তখনও আচার্য্য বসু পদার্থ-অন্বেষণে বিরত হইতে পারেন নাই। এখন তিনি পাট, আনারস-পত্র, কদলীবৃক্ষজাত সূত্র প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ-তন্তু এবং মানব-কেশ প্রভৃতি আরও নানা পদার্থের অদৃশ্যালোক সমতলীভূত করিবার শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন।

অদৃশ্যালোক সমতলীভূত করিবার এই অদ্ভুত শক্তির কারণ উল্লেখ-প্রসঙ্গে আচার্য্য বসু বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত আণবিক বিন্যাসের বৈচিত্র্য ব্যতীত ইহার অপর একটা প্রবল কারণ আছে। প্রত্যেক সমতলীভূত তরঙ্গোৎপাদক পদার্থ পরীক্ষা করিলে ইহাদের সর্ব্বাংশের তাড়িত-পরিচালন (Conductivity) ক্ষমতা সমান দেখা যায় না। ইহাতে পরিচালকতার সহিত সমতলীভূত করিবার শক্তির কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া, আচার্য্য বসুর প্রথমে কতকটা বিশ্বাস হয়। তার পরে নানা পরীক্ষা করিয়া তিনি এই বিশ্বাসের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

একখানা পুস্তকের সর্ব্বাংশের তড়িৎপরিচালন-ক্ষমতা সমান নয়,—ইহার পার্শ্বের ও উপরিভাগের পরিচালকতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আচার্য্য বসু একখানি স্থূল পুস্তকের পার্শ্বদেশ ও উপরিভাগ ক্রমে

* এই কার্য্য বিসদৃশ হইলেও বিস্ময়কর নয়—কারণ যখন আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি সাধারণ অস্বচ্ছ পদার্থের বাধা অতিক্রম করিয়া বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বহির্গত হইতেছে, তখন এপ্রকার হওয়াই সম্ভব।

তড়িৎ-তরঙ্গপথে উন্মুক্ত রাখিয়া সমতলী-ভবন ব্যাপারে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী অনেক কার্য্য স্পষ্ট দেখাইয়া দর্শকবর্গকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

সাধারণ আলোকোৎপাদক ঈথর-তরঙ্গের ন্যায় তড়িৎ-তরঙ্গকে প্রতিফলিত, বিবর্ত্তিত ও সমতলীভূত করাইয়া, উভয় তরঙ্গই যে, ঈথর-স্পন্দন হইতে উৎপন্ন আচার্য্য বসু তাহা পূর্ব্ববর্ণিত সুন্দর উপায়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উভয়ই ঈথর-স্পন্দন হইতে উৎপন্ন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ ধীর ও আলোক-তরঙ্গ দ্রুত স্পন্দন হইতে উৎপন্ন। মানব-চক্ষুর গঠন ধীর ঈথর-স্পন্দন উপভোগের উপযোগী নয়; তাই বৈদ্যুতিক-তরঙ্গোৎপন্ন আলোক আমরা আমাদের চক্ষুসাহায্যে দেখিতে পাই না।

নানা নৈসর্গিক কারণে আকাশে বহু মাইল দীর্ঘ হইতে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অসংখ্যক ঈথর-তরঙ্গ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তরঙ্গ-সাগরে নিমজ্জিত থাকিযাও মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা হেতু সকল তরঙ্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না। যে সকল স্পন্দনের সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে চারি হাজার কোটি, চক্ষুর সাহায্যে মানুষ কেবল তাহাদেরই অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে,—তারপর স্পন্দন সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি সেকেণ্ডে আট হাজার কোটি হইলে মানব-দর্শনেন্দ্রিয় আবার অন্ধ হইয়া যায়। অতিদ্রুত ও অতিধীর স্পন্দনের তরঙ্গ নিয়তই জড়জগৎ প্লাবিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু অক্ষম মানব তাহাদের সৌন্দর্য্য উপভোগে চির বঞ্চিত। অনন্ত কম্পনজাত অনন্ত আলোক-মালার মধ্যে; কেবল কয়েকটি বর্ণের আলোক লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া মানবকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়;—ইহাই কবির উচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রধান অবলম্বন এবং নিপুণ চিত্রকরের বর্ণযোজনার প্রধান সহায়।

আচার্য্য বসু মহাশয় অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত গবেষণানিরত থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে যে সকল বিস্ময়কর আবিষ্কার সাধন করিয়াছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, মানবের অক্ষম জ্ঞানেন্দ্রিয়কে কৃত্রিম উপায়ে তীক্ষ্ণ করিয়া সৃষ্টির অনেক জটিল তত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করিতেছে। ধীর ঈথর-স্পন্দনজনিত অদৃশ্যালোকের তথ্যাবিষ্কার-ব্যাপারে আজ সমগ্র জগৎ আচার্য্য বসুর নিকট কৃতজ্ঞ, ভারতভূমি আজ কৃতার্থ, এবং আবিষ্কর্ত্তার অসাধারণ প্রতিভার মৌলিকতায় সকলেই মুগ্ধ।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাণী ও উদ্ভিদ্

জড় ও জীব

আচার্য্য বসু বৈদ্যুতিক আবিষ্কারের পর, জড় ও জীবের বিশেষত্ব লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই আচার্য্য বসুকে বিখ্যাত করিয়াছে।

আমরা বর্ত্তমান খণ্ডে আচার্য্য বসুর প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের কথা বিবৃত করিব। এই বিবরণ বুঝিতে হইলে জড় ও জীব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণা কি-প্রকার এবং আচার্য্য বসু মহাশয় সেই জড় ও জীবকে কি-প্রকারে দেখেন, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় প্রদান আবশ্যক হইবে।

জীবতত্ত্বসম্বন্ধীও গ্রন্থাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা প্রতিপৃষ্ঠায় "জীবনীশক্তি" (Vitality) নামক একটা কথা দেখিতে পাই। এত বড় ব্যাপার এবং এত বড় নিরর্থক শব্দ বোধ হয় কোন শাস্ত্রেই নাই। নানা শক্তি নানা আকার পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগের চারিদিকে এমন ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে যে, তাহাদের মূল খুঁজিতে গেলে মানুষকে দিশাহারা হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে বিচলিত না হইয়া যদি কেহ ঠিক্ পথ ধরিয়া চলিতে পারেন, তবে তাঁহার ভাগ্যে সত্যের দর্শন অবশ্যম্ভাবী। ভাগীরথীর মূল খুঁজিতে গিয়া সাধু যেমন হিমালয়ের পাদনিঃসৃত গোমুখীর সহস্রধারায় মূলের সন্ধান পান, যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, শক্তির মূল সন্ধান করিতে গেলে সর্ব্বশেষে তাঁহাকে বিশ্বেশ্বরের চরণতলে পৌছিতেই হয়।

মূল আবিষ্কারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র; মূলাধারের পরিচয়-লাভ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মদৃষ্টি বা সূক্ষ্মযন্ত্রের মোটেই আবশ্যক হয় না। যে

প্রশস্ত ভিত্তির উপর মূলাধারের শক্তির কিয়দংশমাত্র পুঞ্জীভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচিত্র খেলা দেখায়, সেই ভিত্তির নির্দ্দেশ করাই বৈজ্ঞানিকের চরম লক্ষ্য। যাহা হউক এই লক্ষ্যসাধনে কোন্ বৈজ্ঞানিক কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

জীবের শারীরক্রিয়ার অতি সুপরিচিত ব্যাপারগুলির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট হইতে সদুত্তর পাওয়া যায় না। "জীবনী-শক্তি" নামক একটা নিছক কাল্পনিক জিনিষকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ইঁহারা জীবন-ব্যাপারের খুঁটিনাটি সকলেরই ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করেন, অথচ ঐ জিনিষটা যে কি এবং তাহার পূর্ণ মূর্ত্তিই বা কি-প্রকার তাহা কেহই দেখাইতে পারেন না। যে জিনিসের গোড়ায় এতটা গলদ তাহাকে লইয়া অতি সাবধানে নাড়াচাড়া করিলেও একটা বিভ্রাটের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত এই অনুমানের অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, এবং বিভ্রাটেরও চূড়ান্ত হইয়াছে।

জীবনী-শক্তিকে মানিয়া লইয়া তাহা দ্বারা যে, কোনও দৈব ব্যাপারের ব্যাখ্যান পাওয়া যায় নাই, এ-কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। জীবনী-শক্তির কতকগুলি ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া তৎ-সাহায্যে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক ব্যাপারের সত্যই ব্যাখ্যান দিয়াছেন। কিন্তু অপর কতকগুলি ব্যাপারের ব্যাখ্যানের জন্য সেই জীবনীশক্তিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিফল হইতে দেখা গিয়াছে; তখন ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের কলে ফেলিয়াও জীবনীশক্তির নানা কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখান যায় নাই।

উদাহরণ লওয়া যাউক। উদ্ভিদের মূল ও কচি ডগার এক পার্শ্বে তাপ বা আলোক প্রয়োগ করিয়া আহত করিতে থাকিলে দেখা যায়, বৃক্ষের মূল উত্তেজনা হইতে দূরে থাকিবার জন্য বাঁকিয়া যাইতে চায়, কিন্তু কচি ডগা সেই উত্তেজনারই দিকে ঘাড় বাঁকাইতে থাকে। অর্থাৎ একই উত্তেজনা একই

উদ্ভিদের দুই ভিন্ন অঙ্গে ভিন্ন প্রকারে কাজ করে। গাছের ডালের পার্শ্বে ঐ প্রকারে আলোকপাত কর, একই ডাল কখন বাঁকিয়া আলোর দিকে অগ্রসর হইবে, এবং কখন বা আলোক হইতে দূরে যাইতে চাহিবে।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের আলোচনা করিলে পদে পদে এই প্রকার বিসদৃশ ব্যাপার দেখা যায়। ডারুইন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত এই সকল লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভিতরকার খবর প্রকাশ পায় নাই। উদ্ভিদের গতিবিধি লইয়া কোন জটিল প্রশ্ন উপস্থিত হইলেই, ইঁহারা প্রকারান্তরে বলেন, উদ্ভিদের অন্তর্নিহিত শক্তি অন্ধ নয়, এজন্য গাছের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাহা আবশ্যক, ঐ শক্তি গাছকে তাহাই করায়। কিন্তু এই শক্তির ঐ বিশেষ ধর্ম্মটি কোথা হইতে আসিল, তাহার মীমাংসা ইঁহারা করিতে পারেন না। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর নিকট পূর্ব্বের মত ব্যাখ্যানগুলি কতটা সন্তোষকর, পাঠক তাহা বিবেচনা করুন।

আচার্য বসু উদ্ভিদ্‌-তত্ত্বের নানা সমস্যার সুমীমাংসার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন এবং এই সকল গবেষণার ফল প্রথমে দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থে * লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নানা পরীক্ষায় প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনক্রিয়ার ভিতরে তিনি যে সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহার পূর্ব্বাভাস দিবার চেষ্টা করিব।

গাছপাতার নড়াচড়া বৃদ্ধি বা রসশোষণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে, লোকবিশেষের মনে এ-সম্বন্ধে দুইটি ভাবের উদয় হওয়ার সম্ভাবনা। কতক লোকে মনে করিতে পারেন, জীবতত্ত্বের এই সকল তথ্য ঘোর রহস্যে আবৃত। সেই রহস্যের যবনিকা উঠাইয়া ভিতরের কার্য্য দেখিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আবার কতক লোক মনে করিতে

*(1) Plant Response (2) Comparative Electro-Physiology. Published by Messrs Longmans Green & Co London

পারেন, বাহির হইতে শক্তি আহরণ করিয়া যেমন রেলের ইঞ্জিন্ নানা প্রকার অদ্ভুত কার্য্য দেখায়, জীবের দেহটাও বুঝি সেই প্রকার একটি জটিল কল। বাহিরের শক্তি তাহাকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার খেলা দেখায়। ইহাতে শক্তির কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না, যা কিছু বাহাদুরি সে কেবল কলেরই।

জীবের বিচিত্র কার্য্যের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা খুঁজিয়া না পাইয়া প্রাচীন ও আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত দুই দলের মধ্যে প্রথমটিতেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাহিরের অন্ধশক্তি বায়ুকে আশ্রয় করিয়া যখন প্রবল ঝটিকার উৎপত্তি করে, এবং তাহার পরিচয় যখন সে ভগ্নগৃহ ও হতশ্রী পল্লীতে রাখিয়া যায়, নানা বিশৃঙ্খলার এই সুস্পষ্ট লক্ষণে তখন ঠিক বুঝা যায় যে, ঝটিকা অন্ধশক্তিরই কার্য্য বটে। কিন্তু রাত্রি আসিলেই যে শক্তি গাছের পাতাকে নিমীলিত করে, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই যে শক্তি দ্বারা সেই মুদ্রিত পত্র উন্মীলিত হইয়া যায়, তাহাকে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অন্ধশক্তি বলিতে পারেন নাই। জীবের অন্তর্নিগূঢ় কোন একটা বিশেষ শক্তিই গাছপালাকে লইয়া এই প্রকার সচেতনভাবে খেলা করে বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় পাশ্চাত্য বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াও ঐ প্রকার একটা বিশ্বাসে তাঁহার চিত্তকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। বিশ্বেশ্বরের যে শক্তির কণামাত্র পাইয়া অগ্নি উত্তাপ প্রদান করে, মেঘ বারি বর্ষণ করে এবং বায়ু সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিরই কিয়দংশ তাপ বা আলোকের আকারে জীবের উপর পড়িয়া যে তাহাকে সচেতনভাবে নানা-কার্য্য করায়, আচার্য্য বসুর তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। কেবল প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে সজীবতা দিবার জন্য বিধাতা জীবনীশক্তি বলিয়া একটা বিশেষ শক্তির সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—এই প্রচলিত কথায় তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।

মতবিশেষের উপর অন্ধ অনুরাগ মানুষকে যে প্রকার অক্ষম করে, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই করে না। যে সকল কার্য্য নিরপেক্ষ বিচারের প্রতীক্ষা করিয়া আছে, ইহাতে তাহাদের প্রতীক্ষা কালক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আচার্য্য বসু চিরাগত প্রথায় পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত তত্ত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি যে একটু সত্যের আভাস পাইয়াছিলেন, তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন এবং শেষে সত্য পূর্ণ মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিল।

আচার্য্য বসু আবিষ্কারের স্থূলমর্ম্ম বুঝিতে হইলে, প্রথমে জড় ও শক্তির দুই একটি মোটামুটি ব্যাপার মনে রাখা আবশ্যক হইবে।

পাঠক অবশ্যই জানেন, জড়ই শক্তির লীলাভূমি. শক্তি জড়কে আশ্রয় করিয়াই নিজের ক্ষমতা দেখায় এবং জড়ের অভাব হইলেই শক্তি পঙ্গু হইয়া পড়িয়া থাকে। এখন জড়ের উপর শক্তি কি প্রকার কাজ করে, দেখা যাউক। কিন্তু এই কার্য্যের পরিধি এত ব্যাপক যে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেখান অসম্ভব। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ সকলই জড় ও শক্তির কার্য্য। সুতরাং এ কার্য্যের আবার সীমা কোথায়? বিষয়টি খুব ব্যাপক হইলেও প্রত্যেক কার্য্যের গোড়ায় পৌঁছিলে দেখা যায়, পদার্থের অণুগুলির বিন্যাস বিকৃত ও চঞ্চল করাই শক্তির একটা প্রধান কাজ।

মনে করা যাউক, একটা সরল লোহশলাকা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ইহারা অণুগুলি বেশ এক প্রকার সুসজ্জিত হইয়া জিনিসটাকে সরল করিয়া রাখিয়াছে। ইহার দুই প্রান্ত ধরিয়া যদি আমার দেহের শক্তি প্রয়োগ করি, তবে তাহার অণুগুলি পূর্ব্বে যে প্রকারে সজ্জিত ছিল, এখন আর সে প্রকার থাকিবে না। অণুসজ্জা এলোমেলো হইয়া গিয়া শলাকাটিকে বাঁকাইয়া দিবে, এবং প্রযুক্ত শক্তির মাত্রা অধিক না হইলে শলাকা কিছুক্ষণ বাঁকা থাকিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় সরল হইয়া দাঁড়াইবে। অণুকে এই প্রকারে

বিকৃত করা শক্তির একটা প্রধান কাজ, এবং পূর্ব্বের অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টাও জড়ের একটা প্রধান ধর্ম্ম।

আচার্য্য বসু মহাশয় জড় ও শক্তির এই সুপরিচিত সহজ ধর্ম্মগুলিকে অবলম্বন করিয়া, জীবনক্রিয়ার রহস্যসম্বন্ধে অনেক নূতন খবর সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি উদ্ভিদের নানাপ্রকার অঙ্গসঞ্চালন পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া প্রতিক্ষণেই বাহির হইতে ইহারা যে তাপ ও আলোকাদির শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাই দেহের সুবিন্যস্ত অণুগুলিকে বিকৃত করিয়া দেহকে আঁকাইয়া-বাঁকাইয়া দেয়।

এখন পাঠক মনে করিতে পারেন, উদ্ভিদ্মাত্রই যখন অবিরাম তাপালোকের শক্তি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন বৃক্ষমাত্রকেই চলৎশক্তি না দেখিয়া, আমরা কেবল লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ্কেই সসাড় দেখি কেন? আচার্য্য বসু এই প্রশ্নেরও সুমীমাংসা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, উদ্ভিদমাত্রেরই দেহস্থ অণু বাহিরের উত্তেজনায় সত্যই বিকৃত হয়, কিন্তু সকল বৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া-চুরিয়া সাড়া দিবার উপযোগী নয় বলিয়া আণবিক বিকৃতির ফল চোখে ধরা পড়ে না। লজ্জাবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরের আণবিক বিকৃতিকে চাক্ষুষ করিয়া প্রকাশ করিবার উপযোগী; তাই এই জাতীয় উদ্ভিদ্গুলি পাতা উঠাইয়া-নামাইয়া সাড়া দেয়।

পূর্ব্বের কথাটাকে উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। মনে কর, এক খণ্ড স্থূল ইবোনাইটের (Ebonite) সহিত ঠিক সেই আকারের এক খণ্ড রবার জোড়া দেওয়া হইয়াছে। তাপ দিলে ইবোনাইট্ জিনিসটা রবারের চেয়ে অধিক প্রসারিত হয়। এখন মনে করা যাউক, ঐ যুগ্ম জিনিসটার উপর-নীচ সমানভাবে তাপ প্রয়োগ করা গেল। এ-অবস্থায় ইবোনাইট্ রবারের চেয়ে অধিক প্রসারিত হইয়া পড়িবে, এবং ইহার ফলে জিনিষটা ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইবে। লজ্জাবতী প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদ্ পাতা ও ডাল

উঠাইয়া-নামাইয়া বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেয়, তাহাদের পত্রবৃন্তের উপর-নিচের অংশ সমান প্রসারণক্ষম নয়। কাজেই, কোন প্রকার উত্তেজনা পাইলেই পূর্ব্বোদাহৃত রবার ও ইবোনাইটের মত বৃন্ত বাঁকিয়া গিয়া পাতাকে উঠাইয়া-নামাইয়া থাকে। কেবল লজ্জাবতী নহে, অধিকাংশ বৃক্ষলতাদির নড়াচড়া যে তাহাদের দেহের বিভিন্ন অংশের অণুগুলির অসম উত্তেজন-শীলতারই উপর নির্ভর করে, আচার্য্য বসু তাঁহার নিজেরই উদ্ভাবিত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র-সাহায্যে তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গাছের নড়াচড়া তাহাদের স্বেচ্ছা ও জীবনী শক্তির বিশেষ কার্য্য বলিয়া পূর্ব্বপণ্ডিতগণ যে ব্যাখ্যান দিতেন, তাহা কোনক্রমেই প্রকৃত ব্যাখ্যান নয়। বিধাতার শক্তিভাণ্ডারেরই কিঞ্চিৎ শক্তি উদ্ভিদদেহে পড়িয়া দেহযন্ত্রের গুণে নানা ইন্দ্রজালের রচনা করে। উদ্ভিদের দেহযন্ত্রের গঠন অতি সরল। সুতরাং ইহাকে একবার বুঝিয়া লইলে যে সকল সঞ্চালনকে আমরা তাহাদিগের আংশিক চেতনার লক্ষণ ও অসম্বন্ধ ব্যাপার বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতেছিলাম, তাহাদের প্রকৃত কথা ধরা পড়িয়া যাইবে। সদ্যোজাত উদ্ভিদের সরল দেহ কি প্রকারে ক্রমে জটিল হইয়া পড়ে, এবং যে সকল ব্যাপারকে কেবল অভিব্যক্তির দোহাই দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাদের ক্রমোন্নতির ধারাটা যে কি প্রকার, আচার্য্য বসু নানা পরীক্ষায় তাহা দেখাইয়াছেন।

পূর্ব্বের উদাহরণে রবার ও ইবোনাইট্ যে কারণে বাঁকিয়া যায়, গাছের ডালপালা যদি ঠিক সেই কারণেই নড়াচড়া করে, তবে জীব ও জড়ের ভিতরকার পার্থক্য কোথায়? উল্লিখিত ব্যাখান শুনিলে প্রশ্নটা আপনা হইতেই মনে আসিয়া পড়ে। এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য বসু জীব ও জড় সকল পদার্থই যখন অণু দ্বারা গঠিত এবং অণুকে বিকৃত করাই যখন শক্তির কাজ, সে স্থলে অণুর অবস্থা একই হইলে জীব ও জড় ভেদে শক্তির কাজের

কোন পার্থক্য না থাকিবারই কথা। ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য, আচার্য্য বসু শত শত পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নির্জীব ধাতুপিণ্ড এবং সজীব প্রাণী বা উদ্ভিদদেহে বিষ ও মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করায়, সকলে একই প্রকারে সাড়া দিয়াছিল। সুতরাং জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ উত্তেজনায় সাড়া দেওয়াকেই যে সজীবতার অন্যতম লক্ষণ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা কোন ক্রমেই স্বীকার করা যায় না।

পাঠক অবশ্য জানেন, অতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া যদি উন্নততর উদ্ভিদের কার্য্যকলাপ ক্রমে আলোচনা করা যায়, তবে এমন একটা পর্য্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় যে, সেখানকার জীবটাকে উদ্ভিদ্ বলিব কি প্রাণী নামে অভিহিত করিব, তাহা স্থির করা দায় হইয়া পড়ে। উচ্চজাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে নিম্নতর উদ্ভিদের দিকে নামিলেও এমন অনেক জিনিস আমাদের চোখে পড়ে, যাহাকে জড় ও উদ্ভিদ্—এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ শ্রেণীতে ফেলিব, তাহা ঠিক করা যায় না। আচার্য্য বসু জড়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাড়া পরীক্ষা করিয়াও ঐ প্রকার দেখিয়াছেন। এইখানে জড়ের শেষ ও উদ্ভিদের আরম্ভ—এবং এইখানে উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ—সাড়া পরীক্ষা করিয়া এ প্রকার রেখা টানা তিনি অসম্ভব দেখাইয়াছেন। এমন কি মৃত্যুকেও তিনি সজীবতার লক্ষণ বলিতে স্বীকৃত হন নাই। বাহিরের উত্তেজনায় যখন পদার্থের অণুর বিকৃতি অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে, এবং অণুগুলি তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চরম চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল হয়, তখনই পদার্থকে মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করে। আচার্য্য বসু ধাতুপিণ্ডাদি নানা পদার্থে বিষপ্রয়োগ করিয়া তাঁহাদেরও ঐ প্রকার চিরবিকার অর্থাৎ মৃত্যু দেখাইয়াছেন। সুতরাং মৃত্যুর অসাড়তাকেও পূর্ব্ব-সজীবতার লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আচার্য্য বসু মহাশয় দেহের স্বাভাবিক জটিলতাকে সজীবতার একটা লক্ষণ বলিতে চান। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, আমরা যাহাদিগকে জীব বলি,

তাহাদের সকলেরই দেহ নির্জীব পদার্থ অপেক্ষা অনেক জটিল এবং তাহাদের ভিতরকার অণুগুলি সহজেই বিকৃত ও উত্তেজিত হইতে পারে। কাজেই, এই সকল জিনিস্ সহজেই খুব সাড়া দেয় এবং উত্তেজনার মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে শীঘ্রই চিরবিকার অর্থাৎ মৃত্যুর সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

উদ্ভিদাদির রসশোষণ, বৃদ্ধির বৈচিত্র্য প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার অদ্যাপি উদ্ভিদ্-তত্ত্বে এক একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। বড় বড় পণ্ডিত সাধারণ প্রাকৃতিক শক্তি এবং জীবনীশক্তিকে অবলম্বন করিয়া এই সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয়, এই সম্বন্ধে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া আসিতেছে। আচার্য্য বসু কেবল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে এগুলিরও সুন্দর ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ইহাতে জীবনীশক্তি বা জীবন বলিয়া কোন একটা সৃষ্টিছাড়া শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করার মোটেই প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং রসশোষণ বা বৃদ্ধিবৈচিত্র্য প্রভৃতিকেও সজীবতার লক্ষণ বলা যায় না। এক দেহযন্ত্রের জটিলতা ব্যতীত অপর কোন ব্যাপারেই সজীব পদার্থের বিশেষত্ব নাই।

আণবিক বিকৃতির ন্যায় একটা অতি সহজ ও সুপরিচিত ব্যাপার অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বসু যে সকল তত্ত্বাবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বাহিরের শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে যে আণবিক বিকৃতি আসিয়া দেহের অণুগুলিকে আক্রমণ করে, তাহাই দেহের ভিতরে রাসায়নিক কার্য্য করে। পূর্ব্বপণ্ডিতগণ এই ব্যাপারটি ধরিতে পারেন নাই বলিয়া যত গোলযোগ। ইঁহারা সজীব পদার্থের ভিতরে একটা শক্তির খেলা দেখিয়া সেই শক্তিটাকে জীবনীশক্তি নাম দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সেই শক্তি যে, বাহিরের শক্তিরই অংশমাত্র, তাহা তাঁহাদের নজরে পড়ে

নাই। বিশেষতঃ, বাহিরের শক্তি যে কাজ করায়, ভিতরের শক্তি কখন কখন ঠিক তাহার বিপরীত কার্য্য করে দেখিয়া, ভিতর ও বাহিরের শক্তি যে সম্পূর্ণ পৃথক্, এই সংস্কারটা তাঁহাদিগকে আরও বিপথগামী করিয়াছিল। আচার্য্য বসু বলিয়াছেন, দুই শক্তি পরস্পর বিসম্বাদী বলিয়া তাহারা মূলেও যে পৃথক্, তাহা কখনও স্বীকার করা যায় না। শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা যখন কলকারখানার কাজ চালাই, তখন একই শক্তির ঐ প্রকার অসম্বদ্ধ বিপরীত মূর্ত্তি অনেক সময়েই আমাদের চোখে পড়ে। তাই বলিয়া যাহা মূলে এক, তাহাকে কি পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

এই স্থলে আচার্য্য বসু বায়ুচালিত বৈদ্যুতিক কলের (Wind-motor সহিত উদ্ভিদ্‌দেহের তুলনা করিয়াছেন। এই যন্ত্র প্রবল বায়ুর আঘাতে ঘুরিয়া কাজ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রসংলগ্ন বিদ্যুৎকোষে সেই বায়ুর শক্তির কিয়দংশ বিদ্যুৎ-আকারে সঞ্চয় করিয়া রাখে। যখন প্রবল বায়ুর অভাব হয় তখন সেই কোষসঞ্চিত বিদ্যুৎ কলে আসিয়া যন্ত্রকে ঘুরাইতে থাকে। কিন্তু এবারে উহা বিপরীত দিকে ঘুরে। বায়ুর শক্তি যদি এই প্রকারে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিপরীত কার্য্য করিতে পারে বাহিরের শক্তি যে দ্বিধা-বিভক্ত হইতে পারে না, এবং তাহারই একটা অংশ অন্তর্নিহিত থাকিয়া গাছে বৃদ্ধি ও রসশোষণ করাইতে পারে না, এ কথা কোনক্রমে স্বীকার করা যায় না। ভিতরকার খবর না জানিলে বায়ুর অভাবে কলকে ঘুরিতে দেখিলে, ইহাকে অপর কোনও বিশেষ শক্তির কার্য্য বলিয়া স্থির করা যেমন স্বাভাবিক, উদ্ভিদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে "জীবনশক্তি" নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া ভুল করাও জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে সেই প্রকার স্বাভাবিক। আচার্য্য বসুর আবিষ্কারে এই ভ্রম দূরীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এবং উদ্ভিদ্-তত্ত্বের যে সকল ব্যাপার পরস্পর অসম্বন্ধ বলিয়া স্থির ছিল, তাহাদেরও মধ্যে একটা ঐকবন্ধন দেখা দিতেছে।

উদ্ভিদের আঘাত অনুভূতি

বনচাঁড়াল, লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি গাছে হাত দিলে বা তাহাদের গায়ে তাপ প্রয়োগ করিলে, ঐ সকল গাছের ছোট ছোট পাতা গুটাইয়া আসে, এবং পাতার ডাঁটাও নামিয়া পড়ে। আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি গাছের এ প্রকার স্পর্শানুভূতি নাই। ইহা দেখিয়া জীব-তত্ত্ববিদ্‌গণ এ পর্য্যন্ত সমস্ত উদ্ভিদ-জাতিকে সসাড়,' ও অসাড়,—এই দুই শাখাজাতিতে ভাগ করিয়া আসিতেছিলেন। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে লজ্জাবতী প্রভৃতি কয়েকটিমাত্র গাছ সসাড় শ্রেণীভুক্ত হয়। অবশিষ্ট সকলই অসাড়ের দলে গিয়া পড়ে।

আচার্য্যবর জগদীশচন্দ্র তাঁহার "উদ্ভিদের সাড়া" (Plant Response) নামক গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ণিত শ্রেণীবিভাগের ভুল দেখাইয়াছেন। ইনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে হিসাবে লজ্জাবতী লতা সসাড়, আম, জাম ইত্যাদি যে কোন গাছও ঠিক সেই হিসাবে সসাড়। কেবল ইহাই নয়, নানা আঘাত উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে প্রকারে সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়া যে অবিকল তদ্রূপ, আচার্য্য বসু নানা পরীক্ষায় তাহাও প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

লজ্জাবতী লতা যেমন সসাড়, আমগাছও সেই রকম সসাড়—এ কথাটা শুনিলে প্রথমে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ হইবার ত কথা। তাপ বা আলোক প্রয়োগ করা দূরের কথা, লজ্জাবতীর ডালে একটু হাত লাগিলেই, তাহার পাতাগুলি বুজিয়া আসে। কিন্তু আমগাছে সহস্রবার ঝাঁকি দিলেও তাহার পাতা একটুও নামিয়া পড়ে না।

আচার্য্য বসু তাঁহার বর্ত্তমান আবিষ্কারে দেখাইয়াছেন, আঘাত-উত্তেজনায় উদ্ভিদ্ ও প্রাণিমাত্রেরই দেহের ভিতর একই প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে।

লজ্জাবতী প্রভৃতি উদ্ভিদ্ অবস্থাবিশেষে পড়িয়া, ঐ সকল ক্রিয়ার যে ফল বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে, আম ও জামগাছ ঠিক সেইরূপে তাহা পারে না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই ক্রিয়ার ফল ধরা পড়িয়া যায়। কোন প্রাণীকে নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিতে থাকিলে সে হাত-পা ছুড়িয়া ও চীৎকার করিয়া বেদনা জ্ঞাপন করে। এখন উহার হাত-পা খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া আঘাত করিতে থাকিলে তাহার আর হাত-পা ছুড়িয়া বেদনা জানাইবার উপায় থাকে না। এক চীৎকারই তাহার বেদনাজ্ঞাপনের একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়ায়। আম, জাম ইত্যাদি গাছের হাত-পা যেন বাঁধা ; তাই এগুলি আহত হইয়া বহু চেষ্টাতেও লজ্জাবতী লতার ন্যায় হাত-পা নাড়িয়া বেদনা জানাইতে পারে না। হাত-পা বাঁধা প্রাণীর বেদনার সাড়া যেমন তাহার চীৎকারে জানা যায়, স্বভাবতঃই হাত-পা বাঁধা গাছগুলির সাড়া সেই প্রকার অন্য উপায়ে জানা গিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, প্রাণীরা যেমন চীৎকার ও অঙ্গসঙ্কোচাদি দ্বারা আঘাতে সাড়া দেয়, উদ্ভিদ্ও সেই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই দুই প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে। অপ্রত্যক্ষ সাড়া কোন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া প্রথমে বুঝা অসম্ভব, কারণ চক্ষুকর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা ধরা পড়ে না। প্রত্যক্ষ সাড়া সহজেই বুঝা গিয়া থাকে : কারণ, পাতা ও ডগার উঠা-নামা চোখেই ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু সকল সময়ই কেবল চোখের দেখার উপরে নির্ভর করিলে কাজ চলে না। কোন্ আঘাতে কতক্ষণে পাতা কতটা উঠিল নামিল, এবং কতক্ষণে ও কি প্রকারে সেটি সেই আঘাতের ধাক্কা সাম্‌লাইয়া প্রকৃতিস্থ হইল, এ সকলের লেখা-পড়া ও হিসাবপত্র করা খালি চোখের কাজ নয়। কাজেই, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয় সাড়াই ঠিক জানিবার জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যক।

আচার্য্য বসু ইহার জন্য অনেকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমরা এখানে কেবলমাত্র দুই প্রকার সাড়া অঙ্কন-পদ্ধতির উল্লেখ করিব। আচার্য্য বসুর আবিষ্কারগুলি বুঝিতে হইলে, কি প্রকারে সাড়-লিপি অঙ্কিত হয় এবং লিপি দেখিবারমাত্র কি প্রকারে সাড়ার প্রকৃতি বুঝা যায়, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক।
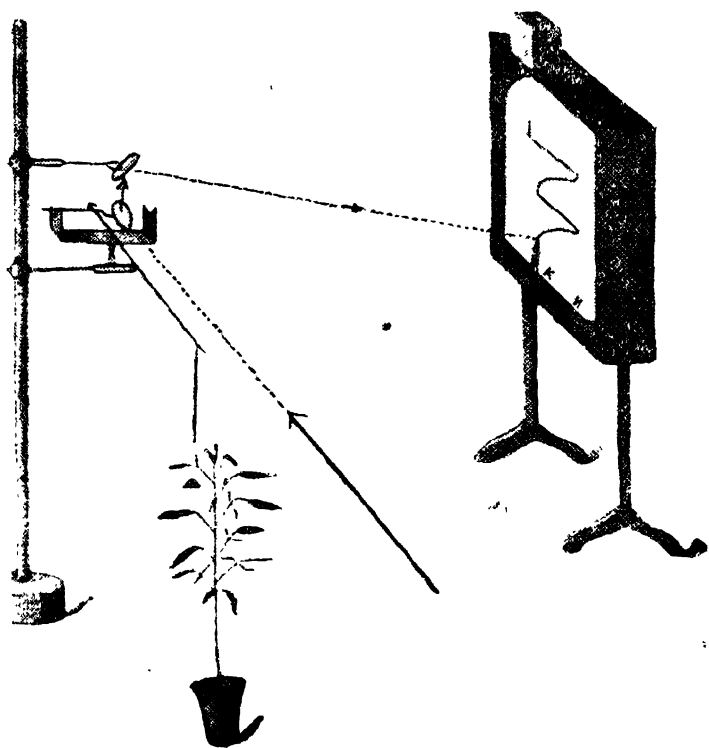
১ম চিত্র

প্রথম চিত্রটি আচার্য্য বসুর উদ্ভাবিত সাড়া অঙ্কনের একটি যন্ত্র। গাছের পাতা ও ডগা উঠা-নামা করিয়া যে সাড়া দেয়, ইহা দ্বারা সেগুলি সহজে লিপিবদ্ধ রাখা যাইতে পারে।

যন্ত্রের "B" চিহ্নিত অংশটি আলুমিনিয়ম্ বা অপর কোনও ধাতুর তার এই তারের এক প্রান্ত গাছের পাতায় অতি সূক্ষ্ম রেশমী সূতা দিয়া সংযুক্ত আছে এবং অপর প্রান্তটি আর একটি তারে লম্বভাবে দৃঢ়সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত তারে একটি গোলাকার ক্ষুদ্র দর্পণও সংলগ্ন রাখা হইয়াছে, এবং যাহাতে ঐ দর্পণসহ দুইটি তার অনায়াসে খেলিয়া বেড়াইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা যন্ত্রে আছে।

"L" চিহ্নিত রেখাটি, একটি স্থির আলোক-রশ্মির পথ। এই আলোক প্রথমে সেই তারসংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, এবং পরে তাহার উপরকার আর একখানি স্থির গোলাকার দর্পণে পুনঃপ্রতিফলিত হইয়া, সম্মুখের সাড়া-অঙ্কন যন্ত্রের কাগজে আসিয়া পড়ে। যন্ত্রস্থিত এই সুদীর্ঘ কাগজখানিকে ফিতার মত গুটাইয়া রাখা হয়, এবং "C" চিহ্নিত ঘড়িকল দ্বারা তাহাকে ইচ্ছানুরূপ দ্রুত বা ধীরভাবে খোলা হইয়া থাকে।

এখন মনে করা যাউক, চিত্রের সূত্রসংলগ্ন গাছের পাতাটি যেন লজ্জাবতী লতার ন্যায় আপনা হইতেই নীচের দিকে নামিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য ইহাতে পাতা-সংযুক্ত সূতার টানে সেই পূর্ব্ববর্ণিত দুইটি তার ও তৎসংলগ্ন দর্পণখানিকে আমরা নিশ্চয়ই চঞ্চল হইয়া পড়িতে দেখিব। কাজেই, সেই দর্পণ-প্রতিফলিত আলোক রশ্মিও দ্বিতীয় দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার পর, সাড়া-অঙ্কনের কাগজে চঞ্চল হইয়াই দেখা দিবে। পাতার উঠা-নামা না থাকিলে, "A" আলোক-রশ্মিকে উক্ত দুই প্রতিফলনের পর কাগজে এক স্থির আলোকবিন্দু আকারে দেখা যাইত; কিন্তু পাতা নামিয়া যাওয়ায় আমরা আলোকবিন্দুটিকে এক সরল পথে বাম হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে দেখিব।

এখন মনে কর, আমাদের সেই পাতাটি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ অবস্থায় সেই তারসংলগ্ন দর্পণখানি ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বের স্থানে আসিতে আরম্ভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত আলোকবিন্দুও ইহার পূর্ব্বের পথে বাম হইতে দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিবে। কাজেই, পাতার এই প্রকার উত্থান-পতনে সাড়া অঙ্কনের কাগজের উপর আলোক-বিন্দুটিকে আমরা এক সরলপথক্রমে ক্রমাগত বামে দক্ষিণে যাওয়া-আসা করিতে দেখিব।

খাতার উপরে পেন্সিলের মুখ রাখিয়া যদি খাতাকে ক্রমাগত বামে ও দক্ষিণে চালনা করা যায়, তাহা হইলে খাতায় একটা লম্বা দাগ পড়িয়া যায়। এখন মনে করা যাউক, পেন্সিলের মুখ যখন বাম হইতে দক্ষিণে চলিতেছে, তখন খাতাখানিকে কেহ ধীরে ধীরে টানিয়া লইতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার অবস্থায় খাতায় কখনই পূর্ব্বের ন্যায় এক সরল দাগ পড়িবে না। এক নির্দ্দিষ্ট সরল রেখার স্থানে, খাতার উপরে স্রোতের ন্যায় এক আঁকা-বাঁকা চিত্র অঙ্কিত হইয়া যাইবে। পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রে সাড়া-অঙ্কনের কাগজখানি যখন ঘড়িকলের দ্বারা খুলিতে আরম্ভ করিবে, বামদক্ষিণগামী আলোকবিন্দুটি তখন আর কাগজের উপর সরল রেখা অঙ্কন করিতে পারে না; তাহার স্থানে উদাহৃত খাতার চিত্রের ন্যায় এক উঁচু-নীচু বক্র রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়ে।

পেন্সিল যেমন খাতায় দাগ রাখিয়া যায়, আলোকবিন্দু সাড়া-লিপির কাগজে বক্র পথে চলিতে থাকিলেও তাহাতে কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না। কাজেই, আলোকবিন্দুর পথ যাহাতে কাগজে স্থায়িভাবে অঙ্কিত হয়, তাহার উপায় আবশ্যক। আচার্য্য বসু মহাশয় সাধারণ কাগজের পরিবর্ত্তে যন্ত্রে ফটোগ্রাফের কাগজ জড়াইয়া, আলোকের পথ স্থায়ী করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আলোকবিন্দু যে পথে চলা-ফেরা করে, ফটোগ্রাফের

কাগজে তাহার ছবি অঙ্কিত হইয় যায়। পরে ফটোগ্রাফীর সাধারণ প্রক্রিয়ায় সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিলে, কাগজে আলোকের পথ স্থায়ীরূপে অঙ্কিত হইয়া দাঁড়ায়।
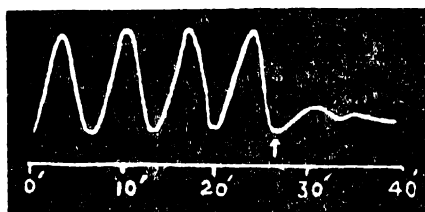
২য় চিত্র
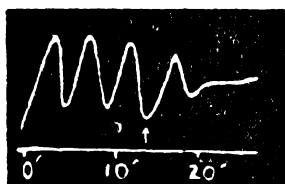
৩য় চিত্র

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্রদ্বয় পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রসাহায্যে প্রাপ্ত দুইটি সাড়া-লিপি বনচাঁড়াল গাছের পত্রবৃন্ত আহত করায়, তৎসংলগ্ন পত্রটি নামিয়া পড়িয়া দ্বিতীয় চিত্রের বাম পার্শ্বের ঊর্দ্ধ রেখাটিকে সাড়া-অঙ্কনের কাগজের উপর টানিয়াছে। তার পরে পাতাটি যখন যথাকালে প্রকৃতিস্থ হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পরবর্ত্তী নিম্নরেখাটি আপনা হইতেই অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চিত্রের এক একটি চূড়াকার বক্ররেখা পত্রের উত্থান-পতনের জ্ঞাপক ; এবং কোন্ চূড়া অপরের তুলনায়

ভূমি হইতে কত উপরে উঠিয়াছে জানিতে পারিলে, উভয় পাতার মধ্যে কোন্‌টি অধিক নীচে নামিয়াছিল, তাহা কেবল চিত্র দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়।

চূড়াগুলির ভূমিকে সময়-জ্ঞাপক রেখা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একবার নামিয়া গিয়া পাতাটি যদি উঠিতে বিলম্ব করে, তবে সেই সময়ে সাড়াঅঙ্কন-যন্ত্রের সেই জড়ানো কাগজটায় অনেকখানি খুলিয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতার উত্থান-পতন সূচক চূড়াটির ভূমিকেও খুব দীর্ঘ হইতে দেখা যাইবে।

দ্বিতীয় চিত্রে একটি পাতার চারিবার উত্থান-পতনের ছবি অঙ্কিত আছে। প্রথম একবার নামিয়া যাওয়ার পরে সম্পূর্ণ উঠিতে পাতাটি প্রায় আট মিনিট সময় ব্যয় করিয়াছিল। ছবির ভূমিরেখার সহিত প্রথম চূড়ার ভূমি তুলনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

চারি বারের নিয়মিত আঘাতে পত্রটি চারি বার নিয়মিতভাবে সাড়া দিলে পর, তাহার বৃন্তের মূলে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। বিষযুক্ত হইয়া পাতাটি আর নিয়মিত সাড়া দিতে পারে নাই। দ্বিতীয় চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ অংশটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, পাঠক পাতার বিষ-মৃত অবস্থার পরিচয় পাইবেন। সাড়ালিপি-যন্ত্রের আলোকবিন্দু স্থির থাকিলে, যেমন সাড়ার কাগজে এক সরল দাগ পড়িয়া যায়, এখানেও প্রায় তদ্রূপ সরল দাগ সাড়া-লিপিতে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় চিত্রটি বনচাঁড়াল গাছের সাড়া লিপি। তিন বারের নিয়মিত আঘাতে, পাতাটি তিন বার নিয়মিত উঠা নামা করিয়া ছিল। তৃতীয় বার উঠার শেষে আচার্য্য বসু তাহার ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই, তখন পাতা মৃতপ্রায় হইয়া গিয়া আর সাড়া দিতে পারে নাই। তৃতীয় চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ

অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উহার মৃত্যুরেখা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় প্রাণিগণ যে সকল প্রত্যক্ষ সাড়া দেয় তাহা জীবতত্ত্ববিদ্গণ পূর্ব্বের অনুরূপ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু উদ্ভিদ্ অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যে প্রাণীরই মত সাড়া দিতে পারে, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন জীবতত্ত্ববিদের মনে হয় নাই।

৪র্থ চিত্রটি ভেকের পেশীবিশেষের সাড়া লিপি। নিয়মিত আঘাতে পেশীটি আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া কি প্রকার নিয়মিত সাড়া দিয়াছিল, পাঠক চিত্রদৃষ্টে সহজে বুঝিতে পারিবেন। চিত্রের শরচিহ্নিত (Arrow
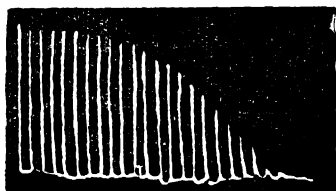
৪র্থ চিত্র

marked) অবস্থায় সাড়া দেওয়ার পরে পেশীতে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ইহাতে তাহার সসাড়তা ক্রমে কি প্রকারে কমিয়া আসিয়াছিল, চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তস্থ ক্রমনিম্ন চূড়াগুলির প্রতি করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

এই ত গেল প্রত্যক্ষ সাড়া-অঙ্কনের কথা। আচার্য্য বসু অপ্রত্যক্ষ সাড়া-অঙ্কনের কি উপায় করিয়াছেন এবং তাহার অস্তিত্বই বা কি প্রকারে বুঝিয়াছেন, এখন দেখা যাউক। দেহের আকুঞ্চন প্রসারণ ও পাতার উঠা নামা দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ যে প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, পূর্ব্ববর্ণিত যন্ত্রে

পাতিত আলোকের বিচলন দ্বারা তাহা বেশ লিপিবদ্ধ করা চলে। কিন্তু যখন আঘাত পাইয়া উদ্ভিদ্ নড়িয়া চড়িয়া অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারে না, তখন তাহা জানিবার উপায় কি?

আচার্য্য বসু এই অপ্রত্যক্ষ উত্তেজনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিদ্যুতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, জীবদেহের কোন অংশে আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে সুস্থ স্থানের দিকে আপনা হইতেই একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। আঘাত যতই গুরু হয়, প্রবাহও তত প্রবল হইয়া দাঁড়ায় এবং আহত স্থান ক্রমে সুস্থ হইতে আরম্ভ করিলে, প্রবাহের মাত্রাও ক্রমে কমিয়া আসিয়া একেবারে লোপ পাইয়া যায়। যে সকল বৃক্ষ প্রত্যক্ষ সাড়া দিতে পারে না, তাহাতেই যে কেবল এই বৈদ্যুতিক সাড়া দেখা যায়, এ কথা পাঠক মনে করিবেন না। আহত জীবমাত্রেরই অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিদ্যুৎ পরিচালিত হইয়া থাকে। কাজেই, যে সকল উদ্ভিদ্ প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, তাহাতে এই সাড়া ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত অপ্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক সাড়াও দেখা গিয়া থাকে।

ভূমি-আম্লা (Biophytum)* লজ্জাবতীর মত এক প্রকার ছোট গাছ। লজ্জাবতীরই মত এই গাছগুলি বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়। পঞ্চম চিত্রটি ঐ গাছের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সাড়ার ছবি। বাহিরের আঘাতে ডালপালা নামাইয়া উঠাইয়া গাছটি যে প্রত্যক্ষ সাড়া দিয়াছিল, চিত্রের "M" চিহ্নিত বক্র রেখাটি দ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে এবং সেই একই আঘাতে কেবল বৈদ্যুতিক প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া সেটি যে অপ্রত্যক্ষ সাড়া দিয়াছিল, তাহা "E" চিহ্নিত

* Biophytum গাছ বীরভূম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বন্য অবস্থায় দেখা যায়। এই গাছের যে বাঙ্গালা নামটি ব্যবহৃত হইল, তাহাই উহার প্রকৃত নাম কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

অংশে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পাঠক একবার চিত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উভয় সাড়ার একতা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। খুঁটিনাটি সকল বিষয়েই উভয়ের অবিকল মিল রহিয়াছে। সুতরাং, এস্থলে ঐ দুইটি সাড়াকে একই আঘাতজাত উত্তেজনার দুইটি স্বতন্ত্র বিকাশ না বলিয়া থাকা যায় না। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলে তাহার পাতা গুটাইয়া আসে, কিন্তু আমের গাছে হাত দিলে তাহার পাতা বুজিয়া আসে না, অতএব কেবল লজ্জাবতী লতারই আঘাত-অনুভূতি আছে, এখন আর এ প্রকার যুক্তি প্রয়োগ করা চলে না। লজ্জাবতী লতা কোন আঘাত পাইলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ এই উভয়বিধ সাড়াতেই তাহার উত্তেজনা ব্যক্ত করে এবং আম্রবৃক্ষ কেবল অপ্রত্যক্ষ বৈদ্যুতিক সাড়াতে অনুভূতি জানায়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু মাত্র। আঘাতানুভূতি কেবল লজ্জাবতীর নিজস্ব নয়, আম কাঁটাল প্রভৃতি বৃক্ষমাত্রেই এই ধর্ম্মটি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে।

আঘাত-উত্তেজনায় উদ্ভিদ্ সকল যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সাড়া দিয়া থাকে, আচার্য্য বসু তাহার মূল কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। এই গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, জীবদেহে আঘাত লাগিলেই তাহার আহত অংশের সুবিন্যস্ত অণুসকল বিকৃত হইয়া পড়ে, এবং সেই বিকারের গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রত্যেক অণুরই একটা চেষ্টা দেখা যায়। প্রাণী ও উদ্ভিদের সকল প্রকার সাড়াই এই আণবিক বিকারের ফল এবং এই বিকার হইতে মুক্তিলাভ করিলেই, তাহারা সাড়া রোধ করিয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া দাঁড়ায়।

উদ্ভিদ্-দেহের ভিতরকার আণবিক বিন্যাস বিকৃত হইলে বিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই গুলির মধ্যে উদ্ভিদ্-দেহস্থ কোষের ভিতরকার জলীয় অংশ বহির্গত হওয়া এবং আহত
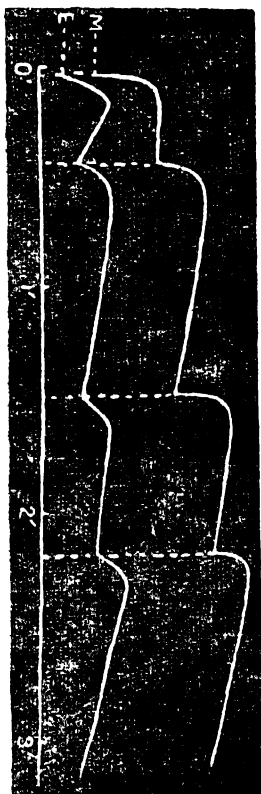
৫নং চিত্র

স্থান হইতে সুস্থ অংশের দিকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালন করাকে, আচার্য্য বসু আণবিক বিকারের প্রধান লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুস্থ অবস্থায় উদ্ভিদ্‌দেহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষগুলি জলপূর্ণ হইয়া স্ফীত থাকে। এ

অবস্থায় তাহাতে আঘাত করিলেই অণুর আকার পরিবর্ত্তনের সহিত সেই জল সজোরে বাহির হইয়া দেহের অভ্যন্তরে ছুটিতে থাকে। কাজেই, আহত অংশের কোষসকল সঙ্কুচিত হইয়া তৎসংলগ্ন ডাল পালাকে নামাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে।

চেষ্টা ব্যতীত ফললাভ হয় না সত্য, কিন্তু চেষ্টামাত্রকেই সকল সময় সফল হইতে দেখা যায় না। উদ্ভিদ্‌দেহের কোষসকল জলহীন হইয়া যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ডালপালাকেও নামাইবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এই চেষ্টার সফলতা লজ্জাবতী ইত্যাদি কয়েকটি উদ্ভিদ্ ব্যতীত অপর কোন গাছে স্পষ্ট দেখা যায় না। লজ্জাবতীর দেহের গঠন ও বিশেষ বিশেষ দুই একটি অঙ্গ ঐ চেষ্টার সহায়তা করে। কিন্তু আম ইত্যাদি গাছ ঐ প্রকার স্বাভাবিক সুব্যবস্থা না থাকায়, আণবিক চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতে সকল গাছই যে লজ্জাবতী লতার ন্যায় আণবিক বিকারগ্রস্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা সকলেরই যে আণবিক অবস্থা একই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহা আমরা বিকারের দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিয়া জানিতে পারি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সজীব ও নির্জ্জীবের সাড়ার একতা প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই তাহার কথা শুনিয়াছেন। সেই সময়ে তিনি বৈদ্যুতিক সাড়া অবলম্বন করিয়াই তাঁহার আবিষ্কারগুলিকে দাঁড় করিয়াছিলেন। উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই বিশেষ গবেষণা করেন নাই ; কাজেই, কয়েক জন ইংরাজ জীব-তত্ত্ববিদ্ কেবল বৈদ্যুতিক প্রমাণে আচার্য্য বসুর আবিষ্কারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন—এবং কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—আবিষ্কারক

মহাশয় যত দিন চিরাগত প্রত্যক্ষ সাড়া দ্বারা তাঁহার সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিতেছেন, তত দিন তাহাতে কেহই বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। এই পণ্ডিতগণের ভ্রম দূর করিবার জন্য আচার্য্য বসু তাঁহার বর্ত্তমান গবেষণাগুলিতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সাড়া দিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে সকল ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এ পর্য্যন্ত বৃথা বাগবিতণ্ডা করিয়া আসিতেছেন, আচার্য্য বসুর এই নূতন আবিষ্কারে সে গুলিকে ত্যাগ করিতে হইতেছে।

লজ্জাবতী-জাতীয় উদ্ভিদ্ ও সাধারণ উদ্ভিদের সাড়াবৈচিত্রসম্বন্ধে আচার্য্য বসু যে সকল নব তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, পর অধ্যায়ে আমরা তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব। উদ্ভিদ্‌দেহের গঠন কি প্রকার হইলে, তাহা প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার অনুকূল হয়, এবং তাহাদের কোন্ অবস্থাই বা প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার অনুকূল হয়, এবং তাহাদের কোন্ অবস্থাই বা প্রত্যক্ষ সাড়া রোধ করে, তাহাও ঐ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া উদ্ভিদ্‌মাত্রেরই একটা প্রধান ধর্ম্ম। নানা জাতীয় গাছে নানা প্রকারে আঘাত দিয়া, আচার্য্য বসু যে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সাড়ার একতা দেখাইয়াছেন, তাহাও আমরা ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এখন দেখা যাউক, লজ্জাবতী ভূমি-আমলা (Biophytum), বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছে বৈদ্যুতিক সাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পাতার উঠা-নামা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাড়া (mechanical response) কোথা হইতে আসে। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছিলাম, হাত-পা ও মুখ-বাঁধা প্রাণীকে প্রহার করিতে থাকিলে, হাত-পা নাড়িয়া ও চীৎকার করিয়া সে যেমন প্রহারের অনুভূতি জানাইতে পারে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বেদনাটা পূর্ণমাত্রাতেই ভোগ করে, আহত গাছের অবস্থা কতকটা সেই প্রকার। পাতা, বোঁটা ও ডালের গঠনবৈচিত্র্যে অন্তরের বেদনা কতকগুলি গাছ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়িয়া চাড়িয়া বেশ প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু যাহাদের অঙ্গ খেলে না, তাহাদিগকে আঘাত-উত্তেজনায় কেবল অন্তরে অন্তরেই বেদনা অনুভব করিয়া নিরস্ত থাকিতে হয়। আচার্য্য বসু তাঁহার বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় এই আন্তরিক বেদনার অস্তিত্ব সকল উদ্ভিদেই দেখাইয়াছেন। কি অবস্থায় উদ্ভিদ্ হাত-পা-বাঁধা প্রাণীর ন্যায় নীরবে আঘাত-যন্ত্রণা সহ্য করে, এখন তাহাই আলোচ্য।

এক খণ্ড ইবোনাইট্ ও তাহার সমান আকারের একটি রবার ফলককে শিরিসের আঠা দ্বারা জুড়িয়া উত্তাপ দিতে থাকিলে উহাদের আকারের একটা একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাপ পাইলেই

এই জোড়া জিনিষটা ধনুকের আকারে বাঁকিয়া পড়ে। এই বাঁকা হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়। উত্তাপে প্রসারিত হওয়া ও ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়া পদার্থমাত্রেরই একটা প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু একই রকম তাপে সকল জিনিষ সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না। যে উত্তাপে পারদ প্রসারিত হইয়া দ্বিগুণ আয়তন প্রাপ্ত হয়, অপর পদার্থে সেই তাপ দিলে প্রসারণের মাত্রা অধিক দেখা যাইবে না। মোট কথায়, একই প্রকারে শীতল বা গরম করিলে নানা পদার্থে নানা প্রকারের আকুঞ্চন ও প্রসারণ দেখা যায়। উপরোক্ত ইবোনাইট্ ও রবারের আকুঞ্চন ও প্রসারণশক্তি এক নয়। কাজেই, তাহাতে তাপ দিলে অধিক আকুঞ্চনশীল রবারের ফলকটিকে নীচের দিকে (concave) রাখিয়া জিনিসটা ধনুকাকারে বাঁকিবে।

লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছ পরীক্ষা কবিলে তাহাদের পাতার বোঁটার গোড়ায় এক বিশেষ অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে ইংরাজিতে (Pulvinus) বলে। যাহাতে পাতাগুলি সহজে উঠা-নামা করিতে পারে, তজ্জন্য এই স্থানে কব্জার মত এক অংশ আছে, এবং তাহা ছাড়া অপর অংশের তুলনায় এই স্থানের কোষগুলিরও (Cells) একটা বিশেষত্ব দেখা যায়। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কোষের যে প্রকার আকার, ঐ পত্রমূলের (Pulvinus) নিম্নার্দ্ধের কোষগুলি যেন তাহা অপেক্ষা বড়, এবং শীতাতপে সেগুলি যেন অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া পড়ে। পত্রমূলের নিম্নার্দ্ধ ও উপরার্দ্ধের কোষ সকল রসপূর্ণ হইয়া পত্রবৃন্তের উপর সমান চাপ দিতে থাকিলে পাতা ভূতলের সমান্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই লজ্জাবতীর স্বাভাবিক অবস্থা। এখন যদি কোন প্রকার আঘাতাদি দ্বারা ঐ সাম্যাবস্থায় স্থিত পত্রমূলটিকে উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পত্রমূলের

নিম্নার্দ্ধের সেই বড় বড় কোষগুলি হইতে অধিক পরিমাণে রস নির্গত হইয়া তাহা নীচে-উপরের শাখা-প্রশাখা ক্রমে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে। রসপুষ্ট বস্তু হইতে রস নির্গত হইলেই সেটি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এখানে উপরিস্থ ক্ষুদ্রতর কোষগুলি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রস নির্গত করায় নীচেকার বড় কোযগুলি অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্রমূলটিও পূর্ব্ব-উদাহৃত রবার ও ইবোনাইটের ফলকের ন্যায় ধনুকাকারে বাঁকিয়া পড়ে। পাতা ঐ পত্রমূলেই প্রোথিত থাকে, কাজেই উহার বক্রতার সঙ্গে সঙ্গে পাতাটিকেও নামিতে দেখা যায়। ইহাই লজ্জাবতীলতার পাতা গুটানোর কারণ।

লজ্জাবতী প্রভৃতির পাতা একবার নামিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার সেগুলি পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, পত্রমূলের সেই বড় বড কোষগুলিতে পুনঃ রসসঞ্চারই ইহার কারণ। বৃক্ষমূল হইতে সর্ব্বদাই এক রসপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া শাখা-প্রশাখাদিক্রমে উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। কাজেই, যখন ঐ রস সঙ্কুচিত বৃহৎ কোযগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেগুলিকে আবার ফুলাইয়া তোলে, তখন পত্রমূলের সেই অসম দুই অর্দ্ধ পুনরায় সাম্যাবস্থায় আসিয়া পাতাগুলিকে দাঁড় করিয়া দেয়।

পত্রমূলের উর্দ্ধে ও নিম্নার্দ্ধের কোষের আকারগত বৈষম্য ও তাহাদের আকুঞ্চন-শক্তির বিভিন্নতাই যে লজ্জাবতী প্রভৃতির পত্রের উঠা-নামার কারণ, আচার্য্য বসু নানা পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

• লজ্জাবতী লতার একটি সপত্র ও সরল শাখা নির্ব্বাচন করিয়া তাহার মূলে দেশলাই জ্বালাইয়া তাপ দাও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উত্তাপ-প্রাপ্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী পাতাগুলি গুটাইতে আরম্ভ করিবে, এবং পরে সেই তাপের উত্তেজনা শাখা বাহিয়া তাহার সকল পাতাগুলিকেই গুটাইয়া

শেষে প্রশাখার পাতাগুলিকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিবে। আচার্য্য বসু এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের কোষগুলি যে রস নির্গত করে, তাহা সেইখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পার্শ্বের কোষগুলিতেও তাহা সংক্রমিত হইয়া পড়ে। কাজেই, ধারাবাহিকরূপে কোষগুলি রস নির্গত করিতে করিতে একস্থানের উত্তেজনাকে শাখাপ্রশাখাক্রমে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, এবং পথের মাঝে সেই অসম কোষবিশিষ্ট কোনও পত্রমূল পাইলেই তাহাকেও সাড়া দেওয়াইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত অসম পত্রমূল (Pulvinus) সকল গাছে নাই। সুতরাং, সাধারণ গাছে আমরা এই উত্তেজনা-পরিচালনের কোন প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখিতে পাই না। এ অবস্থায় বৈদ্যুতিক প্রথায় ভিতরকার উত্তেজনায় জানা ব্যতীত আর অন্য উপায় থাকে না।

কোষ-পরম্পরায় কি প্রকার বেগে উত্তেজনা পরিচালিত হয়, আচার্য্য বসু অতি সুন্দর সুন্দর যন্ত্র দ্বারা তাহা সুকৌশলে গণনা করিয়াছেন, এবং কয়েকটি গাছের পরিচালন-বেগ কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদেহের বেদনা-পরিচালন-বেগের সহিত সমান দেখাইয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কোন স্থানে আঘাত দিলে সেখানকার কোষগুলি হইতে যে রস নির্গত হয়, এবং সেই আঘাত সংক্রমিত হইলে পরে অন্য কোষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহার কি কোন কার্য্য নাই? আচার্য্য বসু কোষনির্গত এই রসের প্রবাহ লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন, এবং ইহা দ্বারা জানা গিয়াছে, এই রসপ্রবাহের বেগ ও উত্তেজনার পরিচালন বেগ এক নয়। কাজেই, কোষ উত্তেজিত হইলে যে রস নির্গত হয়, তাহা সম্মুখের প্রকৃতিস্থ কোষগুলির ভিতর দিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইলে পর, প্রকৃত উত্তেজনা আসিয়া সে কোষগুলিকে

আক্রমণ করে। ইহার ফলে আচার্য্য বসু প্রত্যেক আঘাতে কোষে দুই প্রকার সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন। প্রথমে পূর্ব্ববর্ত্তী কোষনির্গত রসে ফাঁপিয়া উঠা, এবং পরে প্রকৃত উত্তেজনায় আক্রান্ত হইয়া সঙ্কুচিত হওয়া।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পত্রমুলের (Pulvinus) উর্দ্ধ ও নিম্ন অর্দ্ধদ্বয় রসপুষ্ট হইয়া যখন পাতার ডগাতে দুই বিপরীত দিক হইতে সমানভাবে চাপ দেয়, তখন পাতাটিকে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় দেখি। তার পর উত্তেজনা দ্বারা নীচেকার অধিক আকুঞ্চনশীল বড় বড় কোষগুলি হইতে যখন রস নির্গত হইয়া পড়ে, তখন পত্রমূল পাতাটিকে সঙ্গে লইয়া ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায়। সুতরাং, উল্লিখিত দুই প্রকার সাড়ার মধ্যে প্রথমটি দ্বারা পত্রমূলের বৃহৎ কোষগুলি যখন পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কোষনির্গত রসে ফুলিয়া উঠে, তখন তাহাতে পত্রমূলে উপর দিকে একটা চাপ পড়িবার কথা। কাজেই, প্রকৃত উত্তেজনা দ্বারা নামিয়া পড়িবার পূর্ব্বে, এখানে পাতাটিকে হঠাৎ উপরে ঝুঁকিতে দেখারই সম্ভাবনা।

পূর্ব্বোক্ত অনুমানগুলি যে অভ্রান্ত, ভূমি-আম্‌লা ও লজ্জাবতী প্রভৃতির সাড়া-লিপি দেখাইয়া আচার্য্য বসু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ষষ্ঠ চিত্রটি ভূমি-আম্‌লার একটি পাতার সাড়ালিপি। দূর হইতে পাতাটির উপর কোন প্রকার আঘাত দেওয়া হইয়াছিল। সেই আঘাতে সেটি কি প্রকারে উঠা-নামা করিয়াছিল, পাঠক চিত্র দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। চিত্রের নিম্নের শ্বেত সরল রেখা আঘাত-প্রদানের সময়জ্ঞাপক এবং উর্দ্ধরেখা পাতার পতন ও নিম্নরেখা তাহার উত্থান-নির্দ্দেশক। পাঠক চিত্রে দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেক আঘাতের পরেই পাতাটি হঠাৎ একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দীর্ঘ উঁচুনীচু সাড়ালিপির

তলদেশে যে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচুনীচু রেখাময় সাড়ালিপি রহিয়াছে, তাহাই পাতার ঐ আকস্মিক উৎপতনের নির্দ্দেশক। প্রকৃত উত্তেজনা
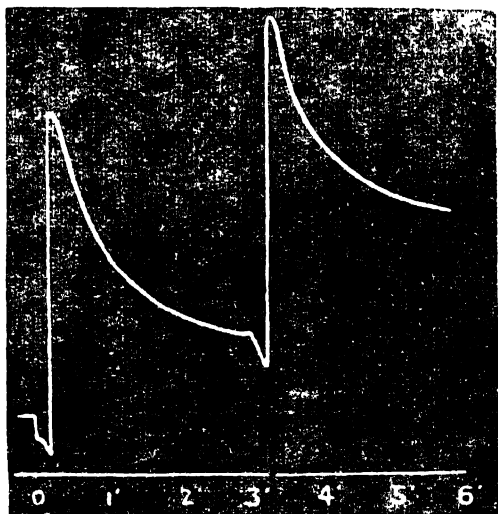
ষষ্ঠ চিত্র

পৌঁছিবার পূর্ব্বে যে এই উৎপতন হইয়াছিল, তাহাও চিত্রদৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। *

* প্রকৃত উত্তেজনা পৌঁছিবার পূর্ব্বে এই রসসঞ্চার দ্বারা পুরোবর্ত্তী কোষের পুষ্টি হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বসু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে অনেক রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা যথাস্থলে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিব। প্রকৃত উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইবার পূর্ব্বে কোষগুলি পিছনের কোষের রসে পূর্ণ হইয়া যে আকস্মিক সাড়া দেয়, তাহাকে আচার্য্য বসু Indirect effect of stimulation বলিয়াছেন। প্রকৃত উত্তেজনায় আকুঞ্চিত হইয়া সাড়া দেওয়াই তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ সাড়া (Direct effect of stimulation).

পত্রমূলস্থ কোষের বৈচিত্র্যই যে লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছের পাতার প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার কারণ, আচার্য্য বসুর পূর্ব্ববর্ণিত নানা পরীক্ষা দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে সকল গাছে কোষ-বিন্যাসের ঐ প্রকার বৈচিত্র্য নাই, আচার্য্য বসু কৃত্রিম উপায়ে কোষের বিষমতা উৎপন্ন করিয়া, তাহাতে লজ্জাবতীর ন্যায় সাড়া দেখাইয়াছেন।

পেঁয়াজ-কলি যখন খুব কচি অবস্থায় থাকে, তাহার চারি ধারের কোষগুলিকে একই আকারে ও একই ধর্ম্মবিশিষ্ট দেখা যায়। কাজেই ইহার মূলে কোন আঘাত দিলে সেটি কোন প্রকারেই সাড়া দিবে না। আচার্য্য বসু একটি পেঁয়াজ-কলির মাঝা-মাঝি চিরিয়া তাহার এক অর্দ্ধেককে কিছুক্ষণ ধরিয়া বরফজলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে বরফজল-সিক্ত অর্দ্ধভাগটার কোষগুলি অপরার্দ্ধের কোষের তুলনায় অল্প উত্তেজনশীল হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রক্রিয়ার পর, আচার্য্য বসু ঐ দুই অংশকে সূতা দিয়া বাঁধিয়া তাহাদের উপর কোন প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই উত্তেজনায় জোড়া পেঁয়াজ-কলিটি লজ্জাবতীর পত্রমূলের ন্যায় ধনুকাকারে বাঁকিয়া গিয়াছিল।

যে প্রক্রিয়ায় আচার্য্য বসু সমকোষসম্পন্ন উদ্ভিদ্‌কে বিষমকোষবিশিষ্ট করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রক্রিয়া স্বভাবতঃই নানা উদ্ভিদের কোষের উপর চলিতেছে। সূর্য্যের তাপালোক সকল জিনিষের উপর সমান ভাবে পড়ে না; সুতরাং, ইহা দ্বারা সমকোষসম্পন্ন উদ্ভিদের বিষম হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব নয়। এই অনুমান যে সত্য, আচার্য্য বসু নানা পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং অনেক উদ্ভিদেই তিনি লজ্জাবতী লতার ন্যায় অল্পাধিক প্রত্যক্ষ সাড়া দেখাইয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন, সাধারণ বৃক্ষের পত্রে কোষবিষমতাটা খুব সুস্পষ্ট নয় এবং

লজ্জাবতী লতার ন্যায় সেটা উহাদের কোন এক নির্দ্দিষ্ট অঙ্গেও সীমাবদ্ধ থাকে না। এজন্য, সাধারণ পাতার উঠা-নামা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না; কিন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে পাতামাত্রেরই অল্পাধিক উঠ-নামা দেখা অসম্ভব নয়।

প্রাণীদেহের কোন অংশে আঘাত দিলে, তৈজস-নাড়ী (Nerve) * তদুৎপন্ন বেদনা বহন করিয়া সর্ব্বদেহে ছড়াইয়া দেয়, এবং মাংসপেশী (Muscles) সেই উত্তেজনায় আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হইয়া সাড়া দেয়। আচার্য্য বসু কোষবিষমতাজাত উদ্ভিদের সাড়াকে অবিকল মাংসপেশীর কার্য্যের অনুরূপই দেখাইয়াছেন। সুতরাং, উদ্ভিদদেহের বিষমকোষযুক্ত স্থানই যে পেশী এবং যে সকল কোষপরম্পরায় উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাই যে উদ্ভিদের তৈজস-নাড়ী, এখন আর কোনক্রমে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌দেহের ঐক্য এখানেই শেষ হয় নাই; খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই আচার্য্য বসু উভয়ের একতা দেখাইয়াছেন। প্রাণীদেহে অতি মৃদু আঘাত দিলে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না; কিন্তু সেই আঘাতই ঘন ঘন পড়িতে থাকিলে আপনা হইতেই কোথা হইতে সাড়া দেখা দেয়। আচার্য্য বসু উদ্ভিদ দেহে পুনঃপুনঃ আঘাত দিয়া অবিকল ঐ প্রকারের সাড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন।

প্রাণীর পেশীতে আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকারের সাড়া দেখিতে পাই। হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অংশে যে পেশীগুলি (Cardiac muscles

* ইংরাজী "Nerve"কে বাংলায় "স্নায়ু" বলা হইয়া থাকে, কিন্তু "স্নায়ু", ইংরাজী "Muscle"-এরই পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। পূজনীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "Nerve"কে তৈজস-নাড়ী বলিয়াছেন। আমরা এখানে সেই পরিভাষাই ব্যবহার করিলাম।

থাকে, তাহারা মৃদু আঘাতে সাড়া দেয় না। আঘাতের মাত্রাকে ক্রমে বাড়াইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌছাইয়া দিলে পর তাহাদের সাড়া হঠাৎ অতি প্রবলভাবে চলিতে আরম্ভ করে। ইহাই এক শ্রেণীর মাংসপেশীর চরম সাড়া। এ অবস্থায় আঘাতের মাত্রা শতগুণ বৃদ্ধি করিলেও এ গুলিতে সাড়ার বৃদ্ধি দেখা যায় না। দ্বিতীয় প্রকারের সাড়া প্রাণীর সাধারণ মাংসপেশীতে (Skeletal muscles) দৃষ্ট হয়। ইহাদের উপরে মৃদু আঘাত দিতে আরম্ভ করিয়া, সেই আঘাতকে ক্রমে প্রবল করিতে থাকিলে, আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আচার্য্য বসু ভূমি-আম্‌লা প্রভৃতি গাছের পাতায় হৃৎপিণ্ডের পেশীর মত সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন এবং পেশীর পূর্ব্ববর্ণিত দ্বিতীয় প্রকারের সাড়াও অনেক গাছে দেখাইয়াছেন।

প্রাণীর হৃৎপিণ্ড যে প্রকার তালে তালে স্পন্দিত হয়, তাহা একমাত্র প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়া এ পর্যন্ত স্থির ছিল। বনচাঁড়াল গাছের পাতায় আচার্য্য বসু অবিকল সেই প্রকার স্পন্দন দেখাইয়াছেন, এবং প্রাণি-হৃদয়ের ন্যায় স্পন্দনশীল স্থানও উদ্ভিদ্-দেহে ধরা পড়িয়াছে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আবিষ্কার আর কি হইতে পারে ? *

মাংসপেশীতে ঘন ঘন আঘাত দিলে প্রত্যেক আঘাতজাত আকুঞ্চন পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায় না। প্রথম আঘাতের সাড়া দ্বিতীয়ের সাড়ার সহিত মিলিয়া গিয়া পেশীতে ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) উৎপন্ন করে। আচার্য্য বসু উদ্ভিদ্‌দেহে ঘন উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া তাহাতে অবিকল ধনুষ্টঙ্কার দেখাইয়াছেন।

---

* প্রাণিহৃদয়ের স্পন্দনের সহিত বনচাঁড়াল ইত্যাদি গাছের সাড়ার একতা আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইব।

৭ম চিত্রখানি পেশীর সাড়ালিপি। ঘন আঘাতে সাড়ালিপি কি প্রকারে ক্ষীণতর হইয়া একাকার ধারণ করে; এবং শেষে তাহাতে
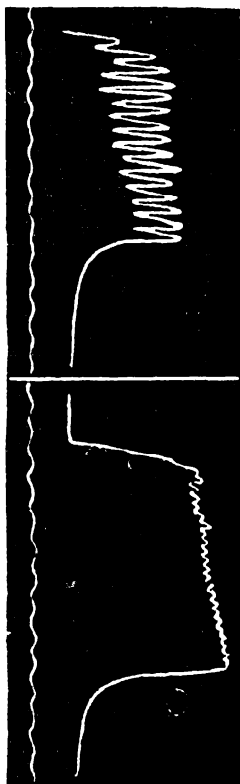
৭ম চিত্র

কি প্রকারে ধনুষ্টঙ্কার উৎপন্ন হয়, পাঠক চিত্রখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ৮ম চিত্রখানি ধুতুরা ফুলের গর্ভ-কেশরের (Pistil)

সাড়ালিপি। ইহার বামপার্শ্বস্থ অংশের সাড়াগুলি প্রায় গায়ে-গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে ; এবং তার পরে আঘাতের ক্ষিপ্রতা আরো বৃদ্ধি করায় চিত্রের দক্ষিণ-অংশে আর পৃথক্ সাড়া অঙ্কিত হয় নাই। আহত অংশ ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত মাংসপেশীর ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।
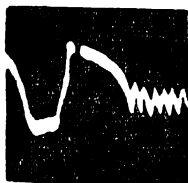
৮ম চিত্র

হৃৎপিণ্ডাদিস্থ স্পন্দনশীল পেশীর (Cardiac Muscles) ধনুষ্টঙ্কার হয় না। বনচাঁড়াল গাছের বিশেষ বিশেষ অংশেও আচার্য্য বসু ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ দেখিতে পান নাই।

প্রাণিদেহে মদ্যপ্রয়োগ করিলে, তাহাতে প্রথমে উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায়, তার পরে অবসাদ আসিয়া পেশীকে আক্রমণ করে। বিষপ্রয়োগে মাংশপেশী প্রথম হইতেই অসাড়তার দিকে অগ্রসর হয় এবং পরে বিষঘ্ন কোন পদার্থ প্রয়োগ করিলে, সেটি ক্রমে বলসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। আচার্য্য বসু উদ্ভিদে ঐ প্রকারে নানা উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া একই ফল পাইয়াছেন।

আমাদের শ্বাসনির্গত বিষাক্ত বায়ু কার্বনিক-এসিডের (Carbonic Acid Gas) প্রভাব ৯ম চিত্রটিতে অঙ্কিত রহিয়াছে। সুস্থ উদ্ভিদ্-দেহের উপরে নিয়মিত উত্তেজনা দেওয়ায়, সেটি কি প্রকারে নিয়মিত-ভাবে সাড়া দেয়, "a" চিহ্নিত অংশে তাহা পাঠক স্পষ্ট দেখিতে

পাইবেন। "B" চিহ্নিত অংশটি কার্বনিক-এসিডে উন্মুক্ত রাখার পরের সাড়া। এই অবস্থায় সাড়া কি প্রকারে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, একবার চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। কার্বনিক এসিডে উন্মুক্ত থাকার পর বিশুদ্ধ বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে থাকিলে প্রাণিমাত্রই আবার সুস্থ হইয়া পড়ে। চিত্রের "c" চিহ্নিত
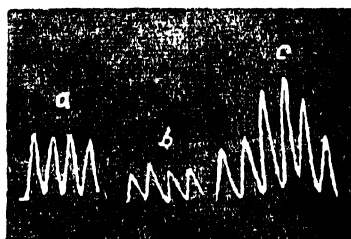
৯ম চিত্র

অংশটি তদবস্থ উদ্ভিদের সাড়ালিপি। বিশুদ্ধ বায়ু বায়ুস্পর্শে উদ্ভিদ্ কি প্রকারে বলসঞ্চয় করিয়া ক্রমে নূতন তেজে সাড়া দিতে আরম্ভ করে, তাহা চিত্রের এই অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

দশম চিত্রটিতে উদ্ভিদের উপরে মদ্য (Alcohol) প্রয়োগের ফল অঙ্কিত আছে। "a" চিহ্নিত অংশটি সুস্থ উদ্ভিদের সাড়ালিপি। তার পরে মদ্যপ্রয়োগে উহার যে উত্তেজনা ও অবসাদ হয়, তাহা চিত্রের "b" ও "c" চিহ্নিত অংশদ্বয় দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন।

একই অবস্থায় প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার এই অবিকল একতা দেখিলে মনে হয়, যে প্রক্রিয়ায় ও যে প্রাকৃতিক কারণে প্রাণী সাড়া দেয়, উদ্ভিদের সাড়াও অবিকল তাহার ফল। প্রাচীন ও আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণি-রাজ্যকে বিধাতার একটা পৃথক্ সৃষ্টি মনে করিয়া, ইহাকে উদ্ভিদ্

হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতেন। কাজেই, এই প্রকার গবেষণায় অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইত। শরীরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রচলিত নানা সিদ্ধান্তে আজও সেই সকল ভ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য্য বসু উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে একই গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনিয়া উভয়ের জীবন-মৃত্যু, ক্ষয়বৃদ্ধি ও চলাফেরার মূলে একমাত্র মহাসত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। প্রচলিত সিদ্ধান্তে যে সকল শারীরিক ব্যাপারের সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যায় না, আচার্য্য বসু তাঁহার নূতন সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটিরও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
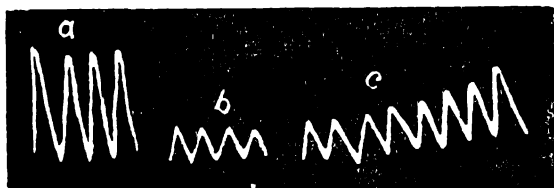
১০ম চিত্র

আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিদেহে যে সাড়া দেখা যায়, তাহার উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন,—প্রাণিশরীরে সর্ব্বদাই এক প্রকার রাসায়নিক ভাঙা-গড়ার (Assimilation and Dissimilation) কাজ চলিতেছে। আঘাত দিলেই সেই উত্তেজনায় জীবদেহের আহত অংশের বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়া যায় এবং পরে এক সংগঠনশক্তি আসিয়া ঐ ক্ষয় পূরণ করিতে থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণের মতে-এই ভাঙা-গড়াই প্রাণীদিগের সাড়া। প্রাণি-দেহের কোন অংশে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকিলে আহত অংশ ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা প্রয়োগ করিলেও

তাহাদের সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু কালের জন্য বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিলে, তাহারা সুস্থ হইয়া আবার ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই সাড়া দিতে আরম্ভ করে। আচার্য্য বসু উদ্ভিদ্-দেহেও-অবিকল এই প্রকার অবসাদ-লক্ষণ দেখাইয়াছেন।

প্রাণীর অবসাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—প্রত্যেক আঘাতে প্রাণিদেহের যে ক্ষয় হয়, তাহা সম্পূর্ণ সংগঠিত হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় আঘাত আসিয়া নূতন ক্ষয় আরম্ভ করাইয়া দেয়। কাজেই, স্বাভাবিক সংগঠনশক্তি ক্ষয়ের পূরণ করিতে পারে না। শরীরতত্ত্ববিদ-গণের মত এই ক্ষয়াধিক্যই অবসাদের কারণ। এই প্রসঙ্গে ইঁহারা আরও বলেন,—ঘন উত্তেজনায় প্রাণিশরীরে নাকি এক প্রকার অবসাদক-পদার্থ (Fatigue Stuffs) উৎপন্ন হয়। এই জিনিসটা স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানিকর।। প্রাণীকে বিশ্রামের অবকাশ দিলে, রক্ত-প্রবাহ দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন প্রাণী আবার নূতনভাবে সাড়া দিতে আরম্ভ করে।।

অবসাদ-উৎপত্তির উপরোক্ত রাসায়নিক ব্যাখ্যানগুলি যে কত অকিঞ্চিৎকর, আচার্য্য বসু দুইটি পরীক্ষাসিদ্ধ ঘটনায় উল্লেখ করিয়া তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। রক্তলেশশূন্য মাংশপেশী লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সেটি রক্তময় পেশীর ন্যায়ই সাড়া দেয় ও ঘন আঘাতে অবশ হইয়া পড়ে; এবং তার পরে বিশ্রামের অবকাশ দিলে, নূতন সাড়া আরম্ভ করে। সুতরাং, রক্তই যে অবসাদক পদার্থকে নষ্ট করিয়া জীবদেহে নূতন বলের সঞ্চার করে, এ কথা এখন আর বিশ্বাস করা চলে না।

মাংশপেশীবিশেষে (Cardiac Muscles) নিয়মিত আঘাত দিলে সোপানাবলীর (Staircase Effects) মত এক প্রকার সাড়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রত্যেক আঘাতের সাড়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আঘাত জাত সাড়া অপেক্ষা ক্রমেই প্রবলতর হইতে আরম্ভ করে।

১১শ ও ১২শ চিত্রদ্বয় ঐ প্রকার সাড়ার ছবি। মাংসপেশীতে নিয়মিত আঘাত দেওয়ায় সাড়ার মাত্রা ক্রমে কি প্রকারে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ১১শ চিত্রটিকে দেখিলেই বুঝা যাইবে। ১২শ চিত্রটি তদবস্থ উদ্ভিদের সাড়া। পূর্ব্ববর্ণিত রাসায়নিক সিদ্ধান্ত দ্বারা এই সাড়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, ব্যাপারটিতে কোনই সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যায়

১১শ চিত্র

না, বরং তাহার অনেক গলদ্ই বাহির হইয়া পড়ে! কারণ, ঐ সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে, যে সকল উত্তেজনা প্রথমে প্রাণিদেহকে ভাঙিয়া দেয়, তাহাই পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়ায় ক্ষয়ের পূরণ করে। এই প্রত্যক্ষ বিসদৃশ ব্যাপারের উপরে কখনই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

এখন এ সম্বন্ধে আচার্য্য বসু কি বলেন, দেখা যাউক। তাঁহার মতে আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া একটা সম্পূর্ণ আণবিক ব্যাপার।

আঘাত দ্বারা পদার্থস্থ অণুর বিকৃতি ও আঘাত রহিত করার পরে তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তি, সাড়ামাত্রেরই মূল কারণ। যে-কোন আকারে যে-কোন পদার্থের উপর আঘাত দিলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আণবিক বিকৃতি উপস্থিত হয়; কাজেই, আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়েই এক প্রকারের সাড়া দেখিতে পাই।

১২শ চিত্র

আচার্য্য বসু নির্জীব বস্তুকেও ছাড়েন নাই। আঘাত-উত্তেজনা দিয়া তিনি ইহাদের নিকট হইতেও প্রাণী ও উদ্ভিদের ন্যায় সাড়া পাইয়াছেন; এবং ঘন উত্তেজনায় নির্জীব পদার্থও যে অবসাদগ্রস্ত হয় ও বিশ্রামে বলসঞ্চয় করে, তাহাও তিনি নানা পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন।

অবসাদের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে আচার্য্য বসু বলেন,—আঘাত দিলেই তাহার মাত্রানুসারে পদার্থের আহত অংশের অনুগুলি অল্পাধিক ওলট্ পালট্ হইয়া যায়। কিন্তু অণুসকল এই বিকৃতি-অবস্থায় থাকিতে চায় না; পূর্ব্বের স্বাভাবিক" অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা হয়। কাজেই, ঐ চেষ্টা দ্বারা অণুসকল আবার পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত হইয়া আহত অংশকে সুস্থ করিয়া তোলে। কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সময় না দিয়া, পদার্থের কোন অংশে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকিলে ঐ চেষ্টা বিফল হইয়া পড়ে। তখন বিকৃতির মাত্রা এত উপরে উঠে যে, প্রবলতর আঘাত প্রয়োগ করিলেও অণুগুলি আর নূতনভাবে বিকৃত হইবার পথ

পায় না ; কাজেই, তখন আমরা পদার্থটিতে সাড়া দেখিতে পাই না। আচার্য্য বসুর মতে ইহাই সজীব-নির্জীবের অবসাদ।

আচার্য্য বসু এক আণবিক বিকৃতির উপরই নির্ভর করিয়া সজীব নির্জীব সকল পদার্থের সকল প্রকার সাড়ারই সদ্ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছেন। জড়ের উপর কোন শক্তি প্রয়োগ করিলে সেটি যে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা প্রাচীন-আধুনিক ছোট বড় কোন বৈজ্ঞানিকের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আচার্য্য বসু জড় ও শক্তিসম্বন্ধীয় এই সুপরিচিত সত্যটির সাহায্যে, সজীব-নির্জীব প্রাণি-উদ্ভিদ্ প্রভৃতির মূলগত রহস্য আবিষ্কার করিয়া আধুনিক জড়বিদ্যাকে প্রকৃতই এক নূতন মূর্ত্তি দিয়াছেন।

পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলন

স্বতঃসঞ্চলন (Autonomous Movements) প্রাণী ও উদ্ভিদের একটা প্রধান বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটি দেখিয়াই অনেক সময় সজীবকে নির্জীব হইতে বাছিয়া লওয়া হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রাণীদিগের স্বতঃসঞ্চলনের একটা প্রকৃত উদাহরণ। কোন্ মূল শক্তিতে প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তালে তালে কাঁপিতে থাকে, তাহার সন্ধান না পাইয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে স্বতঃসঞ্চলন বলিয়াই নিস্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের ন্যায় উদ্ভিদেরও স্বতঃসঞ্চলন আছে। বনচাঁড়াল, ভূঁই-আমলা (Biophytum) প্রভৃতি গাছের পাতা আপনা হইতেই যে উঠা-নামা করিয়া থাকে, তাহা ইহারই উদাহরণ। সরল অবস্থায় উদ্ভিদ সকল যখন প্রচুর তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় সেই সময়েই তাহাদের স্বতঃসঞ্চলন দেখা যায়। এই ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভিদের রসপুষ্ট অবস্থা (Tonic Condition) ও তাপালোক-প্রাপ্তিকেই উদ্ভিদ্‌বেত্তাগণ স্বতঃসঞ্চলনের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু রসপুষ্টি ও শীতাতপের সহিত উহার প্রকৃত সম্বন্ধটা যে কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কোনই সদুত্তর পাওয়া যাইত না।

ভাষার 'মারপেঁচ' ও শব্দাড়ম্বর অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখিবার একটা প্রধান উপায়। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের প্রকৃত রহস্য এ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পান নাই; কাজেই, ব্যাখ্যান দিবার ছলে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণকে "রসপুষ্ট অবস্থা" "জীবনীশক্তি" প্রভৃতি কতকগুলি নিরর্থক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছিল, এবং এই সকল শব্দের আড়ম্বরে ইঁহারা কোন

গতিকে শিক্ষার্থীদিগের চোখে ধূলি দিয়া নিজেদের অজ্ঞতাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র সাধারণ বৈজ্ঞানিকের ন্যায় ঐ সকল শব্দে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। পাতার উঠা-নামা বা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ব্যাখ্যানের জন্য যে, জীবনীশক্তি বা অপর কোনও অদ্ভুত শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না, আচার্য্য বসু তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র প্রকৃতিটাকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখা কখনই বিধাতার ইচ্ছা নয়। যাহা অতি সহজ ও সুস্পষ্ট, তাহার সহিতই প্রকৃতির কারবার। সুতরাং সরল পথে সহজ বুদ্ধিতে অনুসন্ধান করিলেই প্রাকৃতিক রহস্যমাত্রেরই সমাধান সম্ভবপর। আচার্য্য বসু তাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় ধীরে ধীরে স্বতঃসঞ্চলনের মূল কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের বড় বড় জটিল সিদ্ধান্ত তাঁহাকে বিপথগামী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই আচার্য্য বসু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই ; অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

আচার্য্য বসু উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলন-প্রসঙ্গে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে পৌনঃপুনিক সাড়া (Multiple Response) বিষয়টা জানিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধগুলিতে প্রত্যেক আঘাতে এক একটি করিয়া যে সাড়া পাওয়া যায়, তাহারই বিষয় আলোচনা করিয়াছি। ইহা ব্যতীত যে আর এক শ্রেণীর সাড়া আছে, এখনও তাহার কথা বলা হয় নাই। ইহাকেই আচার্য্য বসু পৌনঃপুনিক সাড়া বা Multiple Response নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই শ্রেণীর সাড়ার বিশেষত্ব এই যে, একবার আঘাত দিলে তাহাতে কেবলি একটিমাত্র সাড়া উৎপন্ন না হইয়া, অনেক গুলি সাড়া তালে তালে পরে পরে দেখা দিতে আরম্ভ করে।

ত্রয়োদশ চিত্রখানি ভূমি-আম্‌লা গাছের পাতার পৌনঃপুনিক সাড়ার ছবি। দোলনাকে দুলাইবার জন্য একটা টান দিলে সেটি যেমন অনেক ক্ষণ ধরিয়া তালে তালে এদিক্ ওদিক্ দুলিতে থাকে, এখানে ভূমি-আম্‌লা গাছের পাতায় একটি প্রবল আঘাত দেওয়াতে পাতাটিও সেই প্রকারে তালে তালে বুজিতে ও খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিত্রে দন্তুর বক্ররেখাটির এক একটি দাঁত পাতার খোলা-বোজা প্রকাশ করিতেছে।

ভূমি-আম্‌লা গাছ সংগ্রহ করিতে পারিলে পাঠক নিজের হাতে এই পৌনঃপুনিক সাড়ার পরীক্ষা করিতে পারিবেন। ঐ গাছের ডাঁটার আগায় বা গোড়ায় দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া অল্পক্ষণ তাপ দিলে পরীক্ষক দেখিবেন, সেই তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে পাতাগুলি ক্রমে গুটাইতে আরম্ভ করিতেছে ; এবং একপ্রকার গুটান শেষ হইলে, সেই তাপপ্রাপ্ত অংশ হইতে নূতন করিয়া আর এক গুটানোর পালা আরম্ভ হইতেছে। গাছ ও পাতা সতেজ হইলে একবার তাপ প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষক পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পাঁচ ছয় বার প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিতে পাইবেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, একটিমাত্র আঘাতে উদ্ভিদে যে পৌনঃপুনিক সাড়া দেখা যায়, তাহা কি কেবল ভূমি-আম্‌লা প্রভৃতি গাছেরই বিশেষত্ব, না উদ্ভিদ্-সাধারণেরই একটি বিশেষ ধর্ম্ম ?

আচার্য্য বসু এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়াছেন ; এবং সহজ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, সুস্থ ও সবল উদ্ভিদ্‌মাত্রেরই দেহে আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে পৌনঃপুনিক সাড়া আপনা হইতেই তালে তালে চলিতে

আরম্ভ করে। বনচাঁড়াল, ভূমি-আম্‌লা প্রভৃতি গাছের পত্রমূলস্থ স্ফ (Pulvinus) ঐ সকল সাড়াকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারে। অপর গাছের পাতায় উঠা-নামার ঐ সুব্যবস্থা নাই; কাজেই, সেগুলিতে
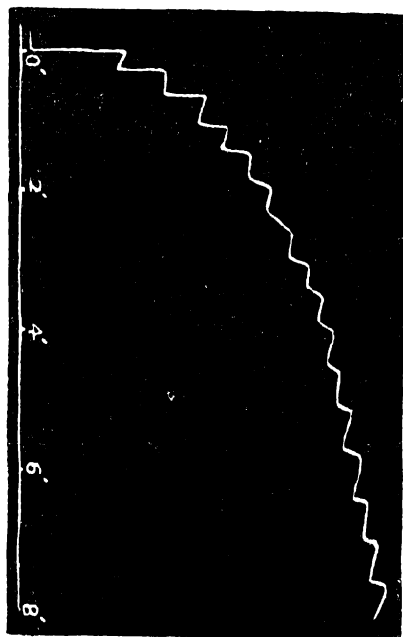
১৩শ চিত্র

আমরা প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিতে পাই না। এই সকল স্থলে বৈদ্যুতিক প্রথায় সাড়ালিপি অঙ্কন করিলে, পৌনঃপুনিক সাড়ার অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়। Pulvinus-হীন নানা গাছে আঘাত দিয়া আচার্য্য বসু তাহাদের প্রত্যেকটিতেই পৌনঃপুনিক বৈদ্যুতিক সাড়া দেখিতে পাইয়াছেন।

ভূমি-আম্‌লার পাতায় বা ডালে সাধারণতঃ স্বতঃসঞ্চালনের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু কোন একটি সুস্থ ও সবল ভূমি-আম্‌লা গাছ বাছিয়া লইয়া, তাহার কোন অংশে আঘাত দিলে, সেটি যখন পুনঃ পুনঃ পাতা উঠাইয়া নামাইয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে বনচাঁড়ালের ন্যায় স্বতঃসঞ্চলনক্ষম উদ্ভিদ্‌ বলিয়াই মনে হয়। কোন প্রকার আঘাতে পৌনঃপুনিক সাড়া আরম্ভ হইলে, সেগুলি বৃক্ষের স্বতঃসঞ্চলন কি পৌনঃপুনিক সাড়া, তাহা বাস্তবিকই ঠিক করা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক সাড়ার মধ্যে একটা কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আচার্য্য বসু কল্পনা করিয়াছিলেন।

কল্পনা জিনিসটা কেবল কবিজনসুলভ গুণ নয়। যে কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণাকে সফলতা দিবার পক্ষে ইহা একটি মহা অস্ত্র। কল্পনা-সম্পদহীন কোন ব্যক্তিই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না। আচার্য্য বসু পূর্ব্বোক্ত কল্পনায় চালিত হইয়া, নানা প্রকার বৃক্ষে নানা পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শেষে পৌনঃপুনিক-সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলনের অভেদ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভূমি-আম্‌লা গাছে আমরা কেবল পৌনঃপুনিক সাড়াই দেখিতে পাই। আচার্য বসু সেই ভূমি-আম্‌লাকেই সুকৌশলে স্বতঃসঞ্চলন-ক্ষম উদ্ভিদে পরিণত করিয়া সকলকে চমৎকিত করিয়াছিলেন এবং বনচাঁড়ালের স্বতঃসঞ্চলন লোপ করাইয়া তাহাতে পৌনঃপুনিক সাড়ার অস্তিত্ব দেখাইয়াছিলেন। এই পরীক্ষাগুলির প্রত্যেকটিই এত সুন্দর যে, স্বতঃসঞ্চলন ও পৌনঃপুনিক সাড়ার অভেদ এখন আর কোনক্রমেই অবিশ্বাস করা চলে না।

পৌনঃপুনিক সাড়া বা স্বতঃসঞ্চলনের উৎপত্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আচার্য্য বসু কি বলেন, এখন দেখা যাউক। এই সাড়া লইয়া পরীক্ষা

করিলে দেখা যায়, গাছ যখন বেশ সবল ও সুস্থ অবস্থায় প্রচুর তাপালোকে উন্মুক্ত থাকে, প্রায় তখনই তাহার পৌনঃপুনিক সাড়ার উৎপত্তি হয়। ক্ষীণ ও নিস্তেজ গাছ লইয়া পরীক্ষা কর, তাহাতে কেবল সাধারণ সাড়াই দেখা যাইবে; পৌনঃপুনিক সাড়া দেখিতে পাইবে না।

প্রাচীন জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা জানিতেন, এবং সেই জন্যই গাছের "Tonic Condition" বা সতেজ সরস অবস্থাই স্বতঃসঞ্চলন উৎপন্ন করায় বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু "Tonic Condition" ও স্বতঃসঞ্চলনের মধ্যে সম্বন্ধটা যে কি, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

কোন প্রকার গাঢ় তৈলে ইস্পাতের স্প্রিং ডুবাইয়া রাখিয়া তাহাতে মৃদু আঘাত দিলে, সেটি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া প্রত্যেক আঘাতেই এক একবার সাড়া দিতে আরম্ভ করে। আঘাতের মাত্রা খুব বাড়াইয়া দাও, দেখিবে, প্রবল আঘাতে স্প্রিং একাধিক বার আন্দোলিত হইয়া সাড়া দিতেছে। আচার্য্য বসু স্বতঃসঞ্চলনকে এই আন্দোলনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক প্রবল আঘাতে প্রযুক্ত শক্তি, যেমন স্প্রিংএ সঞ্চিত থাকিয়া বারে বারে সেটিকে কাঁপাইতে থাকে, বাহিরের তাপালোক ইত্যাদি হইতে আগত শক্তি উদ্ভিদের দেহের ভিতরে সঞ্চিত হইয়া, তাহাকে অবিকল সেই প্রকারে কাঁপায়। স্প্রিং যেমন প্রবল আঘাতে প্রাপ্ত শক্তিটাকে একবার সাড়া দিয়া নিঃশেষে ছাড়িতে পারে না, উদ্ভিদ্‌ও সেই প্রকার বাহিরের তাপালোকের শক্তি পাইলেই, তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাইতে পারে না। বাহিরের শক্তি উদ্ভিদ্‌দেহে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং সেই সঞ্চয় একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিলে, উদ্ভিদ্ তাহা বা

কাজ করাইতে পারে। আচার্য্য বসুর মতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সঞ্চিত শক্তির কার্য্যই স্বতঃসঞ্চলন বা পৌনঃপুনিক সাড়া।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ শক্তিই যখন পৌনঃপুনিক সাড়া ও স্বতঃসঞ্চলনের মূল কারণ, তখন পৌনঃ-পুনিক সাড়া সুরু করাইবার জন্য প্রবল আঘাতের আবশ্যকতা কি? আচার্য্য বসু ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, গাছের অন্তর্নিহিত শক্তি যখন স্বতঃসঞ্চলন আরম্ভ করিবার সীমার নিম্নে থাকে, তখন তাহার পাতার কোন প্রকার নড়া-চড়া দেখা যায় না। এই অবস্থায় উহাতে কোন প্রকার প্রবল আঘাত দিলে, সেই আঘাতের উত্তেজনাটা গাছের আহত অংশে সঞ্চিত হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্ণতা প্রদান করে। কাজেই, তখন সেই আহত অংশ হইতে একাধিক সাড়া উৎপন্ন হইতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত এই নবাগত শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয়িত না হয়, পাতার উঠা-নামা অবিরাম চলিতে থাকে।

বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছের পাতা যখন আপনা-আপনি উঠা নামা করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে তখন কোন প্রকার আঘাত দেওয়ার আবশ্যক হয় না। আচার্য্য বসু নানা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ দেখাইয়া এই ব্যাপারের সুন্দর ব্যাখ্যান দিয়াছেন। তাঁহার মতে বাহিরের তাপ, আলোক ইত্যাদি হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া গাছ যখন সতেজ অবস্থায় থাকে, এবং এই সময়ে যখন তাহার উপর আবার নূতন শক্তি আসিয়া সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে, তখন গাছটি এই সমবেত প্রচুর শক্তি ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া, ডাল পাতা ইত্যাদি নাড়িয়া-চাড়িয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করে।

আচার্য্য বসু একটা উদাহরণ দিয়া এই শক্তি-সঞ্চয় ও তাহার ক্রমিক ব্যয়ের বিষয়টা বুঝাইয়াছেন। মনে করা যাউক, একটা বড় টবে একটি ছোট নল দিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় জল সঞ্চিত হইতেছে। জল বাহির হইবার জন্য টবের নীচে আর একটি রবারের নল সংলগ্ন আছে এবং ইহার মুখ একটি স্প্রিং দিয়া অবরুদ্ধ আছে। টবে জল জমিতে আরম্ভ করিলে, তাহার নীচেকার সেই রবারের নলের স্প্রিং চাপ পাইতে আরম্ভ করিবে এবং এই চাপের মাত্রা প্রচুর হইলে স্প্রিং খুলিয়া যাইবে ও নলের মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে জল বাহির হইতে থাকিবে। টবের উপরে জল অবিচ্ছিন্ন ধারায় সমভাবে পড়া সত্ত্বেও তাহার নীচেকার নল দিয়া ঝলকে ঝলকে জল বাহির হওয়াকে, আচার্য্য বসু উদ্ভিদের তালে তালে সঞ্চলনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাহিরের তাপালোকাদি হইতে বৃক্ষ সকল যে শক্তি আহরণ করে, তাহা অবিচ্ছিন্ন ধারাতেই আসে; কিন্তু তাহার কাজ পূর্ব্ব-উদাহৃত টবস্থিত জলের বহির্গমনের ন্যায় তালে তালে চলিতে থাকে।

কোন উচ্চস্থানের চারিধারে বাঁধ দিয়া জল ধরিয়া রাখিলে, জল বাঁধা থাকিয়া যায়। কারণ, চারিধারের বাঁধের প্রাচীর জলকে পলাইতে দেয় না। এক ধারের বাঁধ কাটিয়া দাও, জল বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিবে এবং সেই বাঁধবেষ্টিত স্থান জলশূন্য হইয়া পড়িবে। যে কোন শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার কার্য্য ঠিক জলেরই মত দেখা যায়। বন্ধনমুক্ত হইলে, তাহা নিঃশেষে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই কথাটা মনে করিলে প্রশ্ন হইতে পারে, বাহিরের তাপ, আলোক প্রভৃতির যে শক্তি বৃক্ষের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে, তাহা স্বতঃসঞ্চালনাদিতে ব্যয়িত হয় সত্য, কিন্তু সেই

সঞ্চলনে যে তাল ও শৃঙ্খলা আছে তাহা কোথা হইতে আসে? আবদ্ধ শক্তি যুক্ত হইলে বিশৃঙ্খলভাবে ডাল-পাতা নাড়াইয়া চাড়াইয়া তাহার ব্যয় হওয়ারই তো সম্ভাবনা।
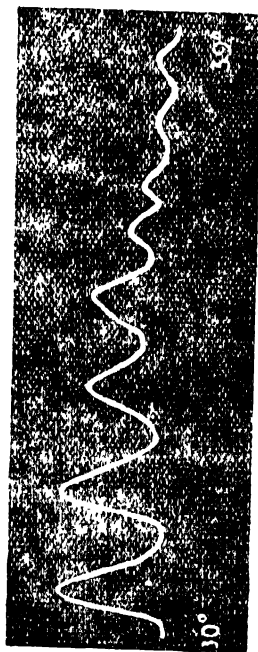
১৪শ চিত্র

আচার্য্য বসু ইহার উত্তরে বলেন, গাছের অভ্যন্তরীণ শক্তি যখন প্রচুর হইয়া পাতাকে নামাইয়া দেয়, তখন এই উত্তেজনায় বৃক্ষের অণু সকল বিকৃত ও অসাড় হইয়া পড়ে। এ জন্য চারিদিকের অণুর ভিতর দিয়া নূতন শক্তি পাতার দিকে আসিবার পথ পায় না।

কাজেই, পাতাটি একবার নড়িয়াই স্থির হইয়া পড়ে। তারপর কালক্রমে বিকৃত অঙ্গুলি প্রকৃতিস্থ হইলে, সেই আবদ্ধ শক্তি চলিবার জন্য আবার

১৫শ চিত্র

১৬শ চিত্র

পথ পায়, এবং আর একবার পাতাটিকে নাড়াইয়া দিয়া, অণুগুলিকে আবার নূতন করিয়া বিকৃত করে। কাজেই, দেখা যাইতেছে, গাছের ভিতরকার শক্তি যতই অধিক হউক না কেন, তাহা কেবল গাছের সুস্থ অবস্থাতেই কাজ করিতে সুযোগ পায়। কিন্তু গাছের এই আণবিক স্বাস্থ্য সকল সময় অক্ষুন্ন থাকে না,—প্রত্যেক সাড়ার পরই আণবিক বিকৃতি উপস্থিত হয়; এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রবাহ রোধ পাইয়া যায়। কাজেই, ইহাতে পাতার উঠা-নামা প্রভৃতি স্বতঃসঞ্চলন বিচ্ছিন্নরূপে তালে তালে চলিতে থাকে।

আচার্য্য বসু স্বতঃসঞ্চলন-সম্বন্ধীয় আবিষ্কার এখানেই শেষ হয় নাই। প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি এত মিল দেখাইয়াছেন যে, তাহা শুনিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। চতুর্দ্দশ চিত্রখানি, বনচাঁড়াল গাছের স্বতঃসঞ্চলনের চিত্র। তাপের মাত্রা ৩০ ডিগ্রি হইতে বাড়াইয়া ক্রমে ৩৯ ডিগ্রিতে আনায়, উক্ত গাছের পাতার আন্দোলনের মাত্রা কেমন করিয়া আসে, চিত্র দেখিলে তাহা বুঝা যায়। ১৫শ চিত্রখানি ভেকের হৃৎস্পন্দনের ছবি। ৩ ডিগ্রি হইতে ক্রমে ৩৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ বৃদ্ধি করায়, হৃদয়ের স্পন্দনমাত্রা কেমন কমিয়া আসিতেছে, পাঠক চিত্রখানির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রাণীর হৃৎস্পন্দনের সহিত উদ্ভিদের স্বতঃ-সঞ্চলনের এই অত্যাশ্চর্য্য ঐক্য প্রকৃতই বিস্ময়কর।

প্রাণীতত্ত্ববিদগণ হৃৎপিণ্ডের তালে তালে স্পন্দনের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে সেগুলির আলোচনা করিলে, প্রত্যেকেরই অনেক গলদ্ বাহির হইয়া পড়ে। আচার্য্য বসু উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর স্বতঃস্পন্দনের ভিতরকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একতা দেখাইয়া, উভয়ের স্পন্দন একই প্রকারের হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন প্রাণীর

হৃদস্পন্দনের সদ্ব্যাখ্যান, উদ্ভিদের হৃৎপিণ্ডের অর্থাৎ তাহার বৃন্তমূলের (Pulvinu·) কার্য্য দেখিয়াই জানা যাইবে বলিয়া আশা দিয়াছেন।

এসিড্ প্রয়োগ করিলে হৃৎপিণ্ড অতিরিক্ত শিথিল হইয়া পড়ে এবং ক্ষারপদার্থের সংস্পর্শে তাহা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহার ফলে এই দুই পদার্থের দ্বারাই হৃৎস্পন্দন রোধ প্রাপ্ত হয়। ষোড়শ চিত্রটি ক্ষারপ্রয়োগ-জাত হৃৎস্পন্দনের ক্রমিক অবরোধের (Stytolic arrest
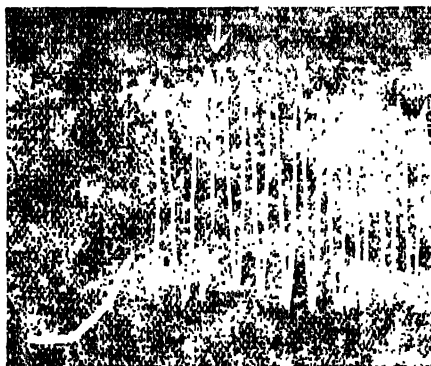
১৭শ চিত্র

of heart-beats) চিত্র। সুস্থ হৃৎপিণ্ড-কেমন পূর্ণমাত্রায় স্পন্দিত হইতেছে, তাহা চিত্রের উর্দ্ধস্থ অংশে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। তার পর শর-চিহ্নিত অবস্থায় ক্ষারপ্রয়োগ করায় স্পন্দন কি প্রকারে মৃদুতর হইয়া প্রায় লোপ পাইতে চলিয়াছে, তাহা পাঠক নিম্নের অংশে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বনচাঁড়ালের হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ তাহার পত্রমূলে এসিড্ ও ক্ষার প্রয়োগ করিয়াও স্পন্দনের ঐ প্রকার ক্রমিক লোপ দেখা গিয়াছে।

১৭শ চিত্রটি বনচাঁড়াল গাছের স্পন্দন-চিত্র। পাতাটি সুস্থ অবস্থায় কি প্রকার নিয়মিত উঠা নামা করিতেছিল, চিত্রের বাম প্রান্তে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে। তারপর শর-চিহ্নিত অবস্থায় ক্ষার প্রয়োগের পর, সেটির স্পন্দন যে কি প্রকারে লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, চিত্রের পরবর্ত্তী অংশে পাঠক তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

হৃৎস্পন্দনের সহিত উদ্ভিদের স্বতঃসঞ্চলনের একতা দেখাইয়াই আচার্য্য বসু ক্ষান্ত হন নাই। ইহা ছাড়া প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কত কাজের ভিতরে যে, তিনি একতা দেখাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা চলে না। সজীব, নির্জ্জীব এবং প্রাণী উদ্ভিদ্ সকলেই যে, একই অখণ্ড নিয়মের শাসনে, যন্ত্রবৎ চলিতেছে আচার্য্য বসুর এই সকল আবিষ্কার দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

রসশোষণ

উদ্ভিদ্ মাটি হইতে কি প্রকারে রসশোষণ করিয়া তাহার শাখাপত্র ও পুষ্পফলাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই রসের সঞ্চার করে, তাহা জানিবার জন্য গত শতাব্দীতে অনেক পরীক্ষাদি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিষয়টার গোল সেই চেষ্টাতে মিটে নাই; বরং ঐ সকল গবেষণার ফলে বহু মতভেদের সৃষ্টি হওয়ায় উহার জটিলতা, আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সত্যসংগ্রহের জন্য গ্রন্থ খুঁজিলে পদে পদে নানা উল্টা-পাল্টা কথায় অনুসন্ধিৎসু বেচারার মাথা ঘুরিয়া যায়। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের রসশোষণ-ব্যাপারের উপর যে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

ষ্ট্রাস্‌বর্গার (Strasburger) ও পেফের (Pfeffer) দু'জনেই খুব নামজাদা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কোন বিষয় জানিতে হইলে, আজকাল তাঁহাদের গ্রন্থ নাড়া-চাড়া করা হইয়া থাকে। ইঁহাদের রচিত পুস্তকে রসশোষণের অনেকগুলি ব্যাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমেই ইঁহারা বায়ুর চাপের (Atmospheric Pressure) কথা উত্থাপন করিয়াছেন। পাঠক অবশ্যই জানেন, আমাদের পৃথিবীর উপর যে পঞ্চাশ যাট্ মাইল গভীর বায়ুমণ্ডল আছে, তাহা সর্ব্বদাই ভূপৃষ্ঠের উপর কাজ করিতেছে। মাছ যেমন তাহার দেহের উপরকার জলের ভার অনুভব না করিয়া জলের ভিতর অনায়াসে চলাফেরা করে, আমরাও সেই প্রকার সহসা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি না। কারণ, কোন জিনিষে, বায়ুর মধ্যে চলাফেরা করিলে উপরকার বায়ু যে চাপ দেয়, নীচেকার বায়ু অবিকল সেই প্রকার চাপ দিয়া জিনিসটাকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া

দেয়। যখন আমরা বায়ুশূন্য স্থান লইয়া পরীক্ষা করি, তখনই আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি। কোন পাত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া পাত্রটির মুখ জলে ডুবাইয়া রাখ; দেখিবে, পাত্রের ভিতর আপনা হইতেই জল প্রবেশ করিতেছে। এখানে পাত্রের বাহিরে জলেব উপর যে প্রকাণ্ড বায়ুর চাপ পড়িতেছে, তাহাই জলকে শূন্য পাত্রের ভিতর ঠেলিয়া তুলে। উদ্ভিদের জলশোষণ-প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক বলেন সূর্য্যতাপে যখন গাছের রস পাতার উপর দিয়া বাষ্পীভূত হইতে আরম্ভ হয়, তখন গাছের ভিতরটা শূন্য হইয়া পড়ে। কাজেই, তখন বায়ুর চাপে মাটির রস মূল দিয়া সেই শূন্য স্থান অধিকার করিবার জন্য উপরে উঠিতে থাকে, এবং তাহাই গাছকে সরস রাখে।

আচার্য্য বসু রসশোষণের এই ব্যাখ্যানটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বায়ুর চাপ খুব প্রকাণ্ড হইলেও তাহার একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ তাহা ত্রিশ ইঞ্চি গভীর পারদ বা ৩৪ ফুট উচ্চ জলকে উপরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে। আচার্য্য বসু বলিতেছেন, বায়ুর চাপ গাছের রসশোষণের কারণ হইলে, আমরা কেবল ৩৪ ফুট পর্য্যন্ত গাছকে সরস দেখিতাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ গাছ আমরা তো প্রতিদিনই দেখিতে পাই; সুতরাং, বায়ুর চাপ দ্বারা যে শিকড় দিয়া জল উপরে উঠে, তাহা বলা যায় না; অন্ততঃ এটা কোনক্রমেই জলশোষণের মূল কারণ নয়।

বসশোষণের দ্বিতীয় ব্যাখ্যান,—কৈশিকাকর্ষণ (Capallirity)। পাঠক বোধ হয় জানেন, খুব সরু নল জলে ডুবাইলে নলের ভিতর দিয়া জল অনেকটা উপরে উঠিয়া দাঁড়ায়। কাপড়ের এক অংশ জলে ডুবাইলে পাত্রের জল আপনা হইতেই উঠিয়া উপরকার শু অংশকে ভিজাইয়া দেয়। এই ব্যাপারটাও কৈশিকাকর্ষণের ফল।

এখানে কাপড়ের সূতার সরু আঁশগুলি পরস্পরের গায়ে লাগালাগি থাকিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলের ন্যায় কার্য্য করে। কাজেই সেই সকল নলাকার সূতার ভিতর দিয়া জল উঠিয়া কাপড়-খানিকে ভিজাইয়া দিতে পারে।

গাছের রসশোষণ-ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্যাখ্যান দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন, শিকড় মাটির সরস স্থানে ডুবান থাকে, এবং গাছের ভিতরে ছিদ্রেরও অভাব নাই; কাজেই কাপড়ের এক অংশ জলে ডুবাইলে যেমন পাত্রের জল সূতা বাহিয়া তাহার অনেকটাকে ভিজাইয়া ফেলে, এখানেও সেই প্রকার মাটির রস শিকড় দ্বারা গাছের আঁশ বাহিয়া উঠিয়া গাছকে সরস রাখে।

আচার্য্য বসু ঐ ব্যাখ্যানেও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—কৈশিকাকর্ষণে রস ঊর্দ্ধগামী হয় সত্য, কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা পঞ্চাশ ষাট হাত উচ্চ স্থানে জল উঠিতেছে, এ প্রকার ব্যাপার কখনই দেখা যায় নাই; সুতরাং, কৈশিকাকর্ষণ দ্বারা যে গাছের সরসতা রক্ষা হয়, এ কথা স্বীকার করা যায় না।

অন্তর্প্রবাহ (Osmotic Action) রসশোষণের আর একটি ব্যাখ্যান। চর্ম্মের থলিতে চিনির রস বা অপর কোনও গাঢ় জিনিষ আবদ্ধ রাখিয়া, থলিটিকে জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, থলিতে বাহিরের জল প্রবেশ করিয়া সেটাকে ফুলাইয়া তুলিয়াছে। কেবল চিনির রস বলিয়া নহে, কোন দুই তরল পদার্থের ঘনতার পার্থক্য থাকিলে সকল সময়েই তাহার মধ্যের সচ্ছিদ্র ব্যবধান ভেদ করিয়া মেশামিশি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্গণ তরল পদার্থের এই ধর্ম্মটিকে অবলম্বন করিয়া বলেন,—গাছের ভিতরকার রস

মাটির রস অপেক্ষা গাঢ় ; কাজেই, শিকড়ের সচ্ছিদ্র ব্যবধান ভেদ করিয়া ঐ অন্তর্প্রবাহ দ্বারাই গাছের দেহে রস প্রবেশ করিয়া থাকে।

আচার্য্য বসু উল্লিখিত ব্যাখ্যানটিতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—অন্তর্প্রবাহে পাতলা ও গাঢ় তরল পদার্থ পরস্পর মিশিবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এই মেশামিশি সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে চলিয়া থাকে যে, তাহাকে কোন ক্রমে গাছের রসশোষণের মূল কারণ বলা যায় না।

এই সকল ব্যাখ্যান ব্যতীত মূলের চাপ (Roo Pressure) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ গঠন করিয়া উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্গণ রসশোষণের ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মূলের চাপ ইত্যাদি কথাগুলির যে প্রকৃত অর্থ কি, তাহা কোন উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারেন না। সুতরাং, ঐ সকল কাল্পনিক বিষয় লইয়া আলোচনা বৃথা।

জলি ও ডিক্সন্ (Jolly, Dixon) উভয়েই বিখ্যাত উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্। রসশোষণ সম্বন্ধে সম্প্রতি ইঁহাদের এক মত প্রচারিত হইয়াছে। এই মতে সূর্য্যতাপে পাতার বিশেষ বিশেষ কোষের (Mesophyll Cells) জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হওয়াকেই রসশোষণের মূল কারণ বলা হইয়াছে। কারণ, এ স্থলে কোষস্থ জল বাষ্পীভূত হইলে, তাহার ভিতরকার রস গাঢ়তর হইয়া পড়ে এবং অন্তর্প্রবাহের নিয়ম অনুসারে বৃক্ষ-দেহস্থ স্বল্প গাঢ় রস কোষে প্রবেশ করিতে আরম্ভ হয়। কাজেই, ইহাতে একটা রসপ্রবাহ মূল হইতে উপরের দিকে চলিতে থাকে।

আচার্য্য বসু এই মতবাদটির বিরুদ্ধেও দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য হইলে, গাছের পাতা হইতে রসের উদ্গমন বন্ধ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে রসশোষণও বন্ধ থাকা উচিত। কিন্তু

পরীক্ষায় তাহার বিপরীত কার্য্যই দেখা যায়, সুতরাং, অন্তর্প্রবাহের মৃদু কার্য্যকে কখনই রসপ্রবাহের সূচক বলা যায় না। তাহা ছাড়া অবস্থা-বিশেষে বসু মহাশয় অন্তর্প্রবাহের ঠিক বিপরীত কার্য্য (অর্থাৎ গাঢ়তর জিনিষ হইতে পাতলার দিকে প্রবাহ) সকল গাছেই দেখিয়াছেন। কাজেই, ডিক্‌সনের মতবাদটিকে কখনই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

রসশোষণের প্রচলিত মতবাদগুলি যে কত ভ্রমপূর্ণ, পাঠক পূর্ব্ব-বিবৃত বাদ-প্রতিবাদ হইতে কতকটা জানিতে পারিবেন। পেফের প্রভৃতি উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণও ইদানিং তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থের (Physiology of Plants) একস্থলে স্পষ্টই বলিতেছেন,—"উদ্ভিদের রসশোষণব্যাপারের যিনি যতই মতবাদ প্রচার করুন না কেন, অদ্যাপি ইহাকে জীববিজ্ঞানের একটী অমীমাংসিত তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। নানা মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াও বিষয়টির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান আজও পাই নাই। কাজেই, আপাততঃ এই ব্যাপারটিকে গাছের জীবনীশক্তিরই কোন প্রকার কার্য্য বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।"

পেফের সাহেবের উল্লিখিত মতটি প্রচারিত হওয়ার পর, রস-শোষণ ও বৃক্ষের কোষের কার্য্য লইয়া ষ্ট্রাস্‌বর্গার সাহেব গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন; এবং ইহার ফলে, কোষের সক্রিয়তার সহিত রসশোষণের কোন সম্বন্ধই দেখা যায় নাই। ইনি একটি পরীক্ষায় গাছের গুঁড়ির তলার কোষগুলিকে পোড়াইয়া নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি মূল হইতে শাখা-প্রশাখাদিক্রমে মাটির রস গাছের সর্ব্বাঙ্গে কয়েক দিন ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তার পর তিনি গাছের কোন অংশ কাটিয়া তাহাতে তুঁতের জল

ইত্যাদি বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেও জলশোষণের কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই,—বিষমৃত কোষগুলির ভিতর দিয়া রস আপনা হইতেই উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদ্‌কোষের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়া পেফের সাহেব জলশোষণের যে ব্যাখ্যানের আভাস দিয়াছেন, এই সকল পরীক্ষায় বিশ্বাস করিলে, তাহা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়। ষ্ট্রাস্‌বর্গার সাহেব তাঁহার গ্রন্থের (Text-book of Botany) একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—গাছের জীবন্ত কোষগুলিরই যে কোন অজ্ঞাত কার্য্যকে রসশোষণের কারণ বলিয়া অনুমান করা হইতেছে, তাহাতে আর এখন বিশ্বাস করা চলে না।

আচার্য্য বসু রসশোষণের কি ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, গাছের কোন অঙ্গে কোন প্রকার প্রবল আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে বার বার উত্তেজন চালিত হইয়া গাছটিকে সাড়া দেওয়াইতে থাকে। ভূমি-আম্‌লা (Biophytum) ও বনচাঁড়াল (Desmodium) প্রভৃতি গাছে এই সাড়া পাতার পুনঃপুনঃ উত্থান-পতনে দেখা যায়, এবং অপর গাছে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে হয়। তাহা ছাড়া ঐ প্রবন্ধে আরো বলা হইয়াছে যে, যাহাকে আমরা গাছের স্বতঃসঞ্চলন (Autonomous movements) বলি, তাহা ঐ পৌনঃ-পুনিক সাড়ারই রূপান্তর মাত্র। স্বতঃসঞ্চলনের জন্য সকল সময় বাহির হইতে আঘাত দিবার আবশ্যক হয় না; গাছপালার উপর স্বভাবতঃই তাপালোকের যে আঘাত পড়িতেছে, তাহাই অনেক সময়ে কোষ হইতে কোষান্তরে রসচালনা করিয়া স্বতঃসঞ্চলন সুরু করাইয়া দেয়।

এখন মনে করা যাউক, গাছের মূলদেশের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে যেন পৌনঃপুনিক সাড়া (Multiple Response) সুরু হইয়াছে। সাড়া চলিতে আরম্ভ করিলেই প্রথমতঃ কোষ হইতে কোষান্তরে রসের চলাচল আরম্ভ হয়, এবং তৎপরে তাহাদের আণবিক বিকৃতি আসিয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং, এস্থলে গাছের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া কোষপরম্পরায় রস চালিতে আরম্ভ করিলে পিছনের কোষগুলির যে রসাভাব হইবে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। পৌনঃপুনিক উত্তেজনার চলাচল হইতে উৎপন্ন কোষের এই শূন্যতার সাহায্যে বসু মহাশয় রসশোষনের ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন,—কোষ রসশূন্য হইলেই নিকটস্থ সরস পদার্থ হইতে রসশোষণ করিয়া পুষ্ট হইবার জন্য তাহাতে এক শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মূলের চারিপার্শ্বের মাটিতে রসের অভাব নাই; সুতরাং, যখন প্রত্যেক উত্তেজনার স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে মূলের নিকট-বর্ত্তী কোষগুলি শূন্য হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি যে মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিয়া পুষ্ট হইবে, এবং পরে উপরকার শূন্য কোষ-পরম্পরায় সেই রসকেই চালাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিতে গাছের পৌনঃপুনিক সাড়া তাহার মূলদেশ হইতেই আরম্ভ হয় কেন? আচার্য্য বসু এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন,—মূল যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কঠিন মাটির ঘর্ষণে সেগুলি উত্তেজিত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া মাটিতে মিশ্রিত নানা রাসায়নিক পদার্থ মূলকে উত্তেজিত করে। কাজেই, উত্তেজনার কেন্দ্রটা গাছের অপর অংশে

না থাকিয়া মূলেই আসিয়া দাঁড়ায়, এবং তাহাতেই রস নীচের দিক হইতে তালে তালে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে।

কোন গাছের ডাল কাটিয়া তাহার কাটা প্রান্তটা জলে ডুবাইয়া রাখিলে, কাটা দিক্ হইতে উপরে জল উঠিতে দেখা যায়। আচার্য্য বসু ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—এস্থলে কাটার আঘাতই উত্তেজনা সুরু করে, এবং সেই অংশ হইতে উত্তেজনাটা তালে তালে পুনঃ পুনঃ উপর দিকে চলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জলকেও উপরে টানিতে আরম্ভ করে। আচার্য্য বসু গাছের ডগায় আঘাত দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় আহত স্থানের রস উপর হইতে নীচের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

গাছের রসশোষণ-শক্তি সকল সময় সমান থাকে না। আঘাত-উত্তেজনার মাত্রা অনুসারে এবং গাছের ভিতরকার সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ মতো তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। তাহা ছাড়া ঠাণ্ডা বা গরমের আধিক্য এবং গাছের প্রযুক্ত পদার্থের গুণেও শোষণের মাত্রার পরিবর্ত্তন হয়। রস শোষণের এই প্রকার অত্যল্প হ্রাস-বৃদ্ধি বাহির হইতে বুঝা অসম্ভব, অথচ না বুঝিলেও তাহাদের গোড়ার খবর পাওয়া কঠিন। এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক রসশোষণের মাত্রা নির্ণয় করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। আচার্য্য বসু অতি অল্পদিনের চেষ্টায় "শোষণ-গ্রাফ" নামক একটি সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া রসশোষণ-পরিমাপ অতি সহজ করিয়া তুলিয়াছেন, এবং এই যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিয়া তিনি যে সকল ফললাভ করিয়াছেন, তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক। ইহা দ্বারা রসশোষণের

পরিমাণ আপনা হইতেই কাগজে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং, ভুলভ্রান্তি হইবার আশঙ্কা মোটেই থাকে না।
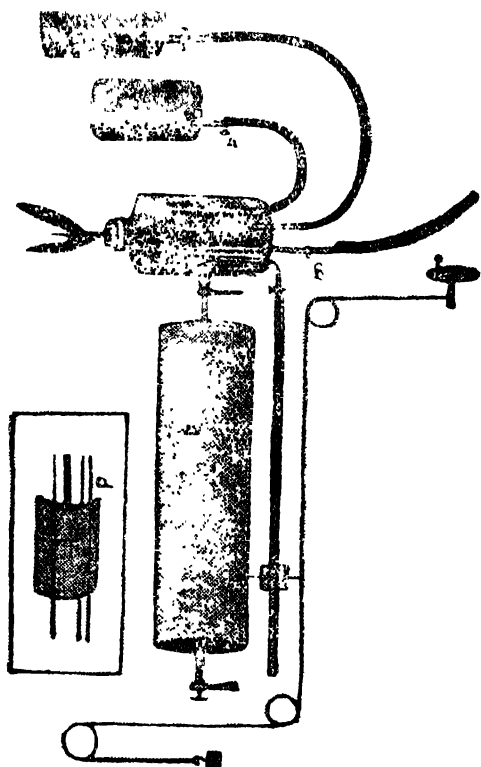
১৮শ চিত্র

পরবর্ত্তী ১৮শ চিত্রটিতে শোষণ-গ্রাফ্ যন্ত্রের প্রধান প্রধান অংশের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, এবং ১৯শ চিত্রখানি যন্ত্রের সম্পূর্ণ ছবি। ১৮শ চিত্রের "V" চিহ্নিত অংশ একটি জলপূর্ণ কাচের পাত্র। উহার মুখের
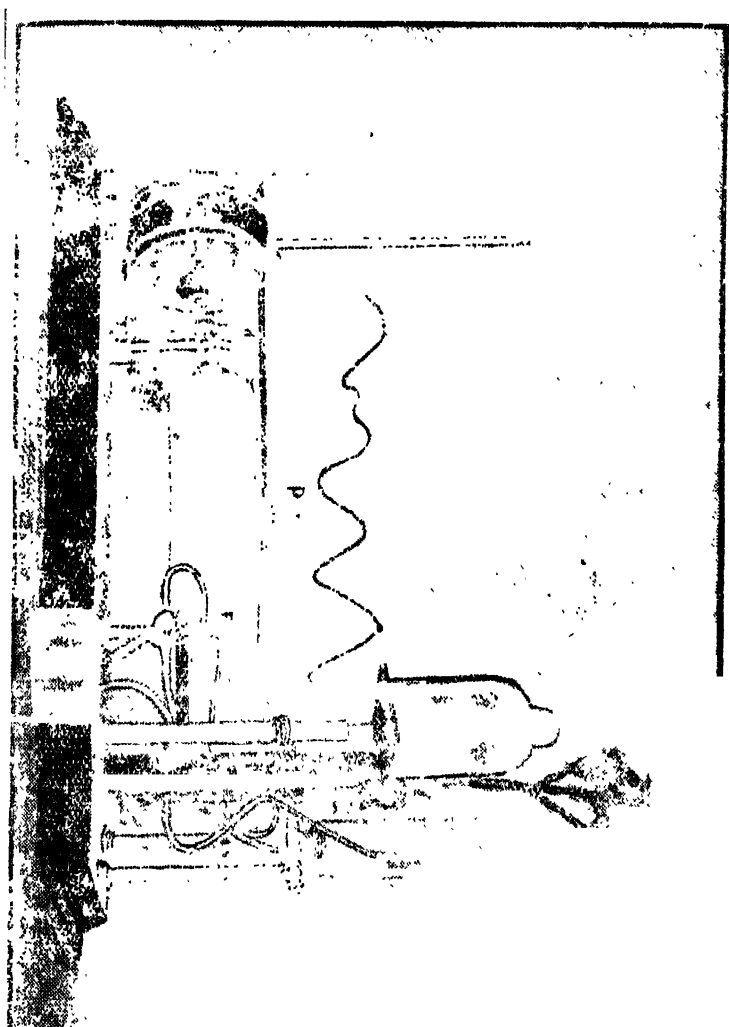
১৯শ চিত্র

ভিতর দিয়া গাছ বা ডাল প্রবেশ করাইয়া, সেটি কি পরিমাণ জল শোষণ করে, তাহা দেখা হইয়া থাকে। পাত্রের নিম্নে "A" "B" এবং "A′" "B′" এই চারিটি নল সংযুক্ত আছে। "A" নলের পেঁচ ঘুরাইলে পাত্রে ইচ্ছামত জল প্রবেশ করান যাইতে পারে, এবং " " পাত্রে রাসায়নিক দ্রব্যমিশ্রিত জল রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ঐ জল "\" পাত্রে প্রবেশ করাইয়া গাছের জল-শোষণের উপর রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব নির্ণয় করা হইয়া থাকে। "A" অংশটি একটি কাচের নল ব্যতীত আর কিছুই নয়। "V" পাত্র হইতে গাছ জল শোষণ করিলে ঐ কাচের নলের ভিতরকার জল দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করে। কত সময়ে উহা কতটা চলিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া গাছের জলশোষণের মাত্রা স্থির করা হয়।

চোখের দেখায় অনেক সময় নানা ভুল হইয়া পড়ে, এই জন্য কাচের নলের জলটা কত সময়ে কত সরিয়া যায়, তাহা নির্ভুলরূপে স্থির করিবার জন্য, আচার্য্য বসু যন্ত্রটির এক অংশে একটা সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিত্রের "P" চিহ্নিত অংশটি একটা পিত্তলনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়াকার জিনিস। নলের উপর দিয়া এটিকে বেশ সহজে টানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই অঙ্গুরীয়তে একটি পেন্‌সিল্ সংযুক্ত থাকে এবং যাহাতে পরীক্ষক সর্ব্বদাই পেন্‌সিল্‌টিকে "A" নলস্থিত জলের চলাফেরার সহিত চালাইতে পারেন, তজ্জন্য "W" চিহ্নিত চাকা ও দড়ির ব্যবস্থা আছে। "D" একটি কাগজ-মোড়া চোঙ। এটি সর্ব্বদাই নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে এবং সেই পেন্‌সিল্‌টি উহার গায়ে লাগিয়া থাকিয়া কাগজে দাগ কাটে।

মনে করা যাউক, জলপূর্ণ "V" পাত্রটিতে যেন কোন গাছ নাই, এবং A, B ও B এই তিনটি নলের পেঁচ্ বন্ধ আছে; কেবল "D"

চিহ্নিত চোঙ্‌টি তাহার গায়ে জড়ান কাগজ পেন্‌সিলের মুখে রাখিয়া ক্রমাগত ঘুরিতেছে। "V" পাত্রে গাছ নাই; কাজেই, উহার জলের শোষণও নাই। সুতরাং "P" চিহ্নিত নলের জল ও তৎসংলগ্ন পেন্‌সিল্‌টি একস্থানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে; এবং তাহার ফলে, চোঙের কাগজে একটা লম্বা রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িবে।

এখন মনে করা যাউক, পাত্রে গাছ প্রবেশ করান হইয়াছে, এবং জলশোষণও চলিতেছে। এস্থলে "A" চিহ্নিত নলের জল আর স্থির থাকিতে পারিবে না। জলশোষণের সহিত জলের গভীরতা কমিয়া যাওয়াতে নলের জল দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেন্‌সিল্‌টিও, সেই দিকে চলিবে। কাজে কাজেই, তখন "D" চোঙ্গে জড়ান কাগজে আর সরল রেখা অঙ্কিত না হইয়া স্পষ্টই একটি বক্র রেখা অঙ্কিত হইতে থাকিবে। এখন ঐ রেখা পরীক্ষা করিয়া জলশোষণের মাত্রা নির্ণয় করা কঠিন হইবে না। কারণ, জলশোষণ সমভাবে চলিলে রেখার বক্রতাও সমভাবে চলিবে, এবং কোন কারণে জলশোষণ হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে, রেখার বক্রতায় আর সে শৃঙ্খলা দেখা যাইবে না। তখন রেখাটিকে হঠাৎ যেন দাঁড়াইতে দেখা যাইবে।

আচার্য্য বসু শোষণ-গ্রাফ যন্ত্র সাহায্যে উল্লিখিত প্রথায় ও আরও দু'টি পৃথক পদ্ধতিতে গাছের নানা অবস্থার শোষণশক্তি পরিমাপ করিয়াছেন। মূলের চাপ (Root Pressure) ও বায়ুর চাপ ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত রসশোষণের যে সকল ব্যাখ্যান দিয়া আসিতেছিলেন, সেগুলি যে কত ভ্রমপূর্ণ, শোষণ-গ্রাফের দু'একটি পরীক্ষার ফল বিবৃত করিলে পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন।

আচার্য্য বসু পাতা-বাহার গাছের (Croton) একটি পত্রশূন্য ডাল কাটিয়া শোষণ-গ্রাফে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। ডালে পাতা ছিল না

এবং তাহার শিকড়ও ছিল না। সুতরাং প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এ স্থলে ডাল আর জলশোষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু আচার্য্য বসু তাহার ঠিক বিপরীত কার্য্য দেখাইয়াছিলেন,—ডালের কর্ত্তিত প্রান্ত দিয়া প্রচুর জল উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাজেই, পাতা হইতে জলীয় বাষ্প উদ্গত হইলেই যে নীচেকার রস উপর দিকে চলিতে আরম্ভ করে, এ কথা আর বলা যায় না; এবং "মূলের চাপ" কথাটা যে, নিতান্ত কাল্পনিক, তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। গাছের ভিতরকার কোষ ও অণুর উত্তেজনাই যে রসশোষণের মূল কারণ, এই পরীক্ষা দেখিয়া তাহা আর অস্বীকার করা যায় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্তর্প্রবাহকে (Osmotic Action) রসশোষণের একটি প্রধান কারণ বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মানিয়া আসিতেছেন। এই বিশ্বাসও যে কত ভ্রমপূর্ণ, তাহা আচার্য্য বসুর একটি সহজ পরীক্ষা বিবৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। অন্তর্প্রবাহের নিয়মে যে দিকে রসচালনা হওয়া উচিত, আচার্য্য বসু কেবল উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া এই পরীক্ষায় বিপরীত দিকে রসচালনা দেখাইয়াছেন। লবণমিশ্রিত জল, এসিড্‌ ও ক্ষারপদার্থের ন্যায় গাছকে উত্তেজিত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়তার আধিক্য-প্রযুক্ত গাছের ভিতরকার রসের সহিত ইহার অন্তর্প্রবাহ চলে। আচার্য্য বসু লবণমিশ্রিত জল দ্বারা শোষণ-গ্রাফের পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে একটি গাছের ডালের কাটা প্রান্ত ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অন্তর্প্রবাহ জলশোষণের মূল কারণ হইলে, এ স্থলে ডালের তরল রস বাহির হইয়া গাঢ় লবণের জলের সহিত মিশিবারই কথা। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহার বিপরীত ফল দেখা গিয়াছিল,—লবণ-জলে ডুবান ডালে রসশোষণ অতি প্রবলভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

২০শ চিত্রখানি লবণের জলে ডুবান ডালের শোষণলিপি। লবণ-প্রয়োগের পূর্ব্বে কি প্রকার শোষণ চলিতেছিল, চিত্রের নিম্নাংশের হেলান রেখা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন; এবং তার পর লবণ দিবামাত্র শোষণ কি প্রকার প্রবলভাবে চলিয়াছিল, তাহা ঐ চিত্রেরই উপরকার প্রায় দাঁড়ান রেখাটি দেখিলে বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য, লবণমিশ্রিত
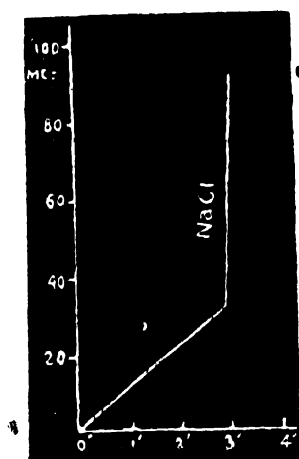
২০শ চিত্র

জলের গাঢ়তার জন্য যে পরিমাণ রস অন্তঃপ্রবাহ দ্বারা বাহিরে আসা সম্ভব, লবণ দ্বারা কোষ সকল উত্তেজিত হওয়ায় এখানে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জল উপরে উঠিয়াছিল। কাজেই, এই পরীক্ষায় আচার্য্য বসু রসনির্গমন না দেখিয়া রসশোষণই দেখিতে পাইয়াছিলেন। কোষের উত্তেজনাই যে রসশোষণের মূল কারণ, ইহা অপেক্ষা তাহার আর কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে?

নানা জাতীয় বিষ ও মাদক পদার্থ প্রয়োগে শোষণক্রিয়া কি প্রকার চলে, আচার্য্য বসু তাঁহার শোষণ-গ্রাফ্-যন্ত্র দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।। মাদক পদার্থ দ্বারা প্রাণিদেহের কার্য্য প্রায়ই হঠাৎ বৃদ্ধি পায়; এবং তার পরই তাহা কমিয়া আসে। আচার্য্য বসু রসশোষণেও সেই প্রকার কার্য্য দেখাইয়াছেন। ২১শ চিত্রটি পরীক্ষা করিলে, শীতাতপে রসশোষণের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন।
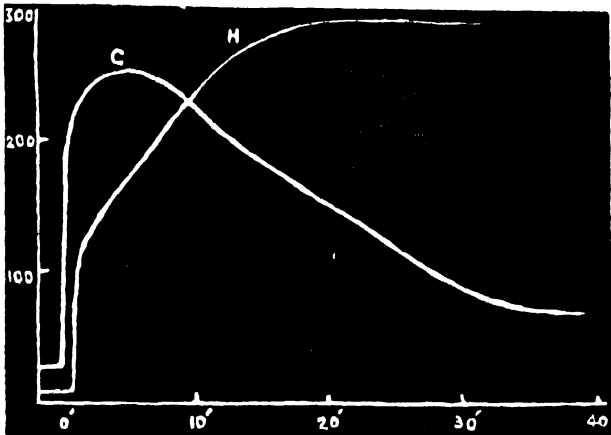
২১শ চিত্র

"C" ও "H" চিহ্নিত রেখাদ্বয় যথাক্রমে শীতল ও গরম জলে নিমজ্জিত গাছের শোষণলিপি। শীতল ও গরম উভয় প্রকারের জলই প্রয়োগ করিবামাত্র, গাছের শোষণক্রিয়া হঠাৎ কি প্রকার প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং কিয়ৎকাল পরে সে প্রবলতা যে কি প্রকারে কমিয়া আসিয়াছিল, পাঠক চিত্রস্থ রেখাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি

প্রাণী বা উদ্ভিদ-শরীরের কোনও অংশ সুস্থ আছে কি না জানিতে হইলে, সেই অংশ রীতিমত পরিপুষ্ট হইতেছে কি না দেখার রীতি আছে। পরিপুষ্ট হওয়া জীবনের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু এই পরিপুষ্টি বা বৃদ্ধির কাজ উদ্ভিদ্-শরীরে কি-প্রকারে চলে, তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক জানা যায় নাই। উদ্ভিদ্-শরীরে আঘাত-উত্তেজনা দিয়া দেখা গিয়াছে, যে উত্তেজনা এখন গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, পর মুহূর্ত্তে তাহা দ্বারাই আবার বৃদ্ধির রোধ হইয়া পড়িতেছে। বহু অনুসন্ধানেও উত্তেজনার এই উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যের মধ্যে কোনও নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় নাই। বাহিরের উত্তেজনার ঐ বিসদৃশ কার্য্য দেখিয়া উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণ গাছের ভিতরকার একটি স্বাভাবিক উত্তেজনার (Inner Stimulus) অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া আজকাল গাছের বৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় নানা ব্যাপারের ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ঐ আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা জিনিষটা যে কি, এবং তাহার উৎপত্তিই বা কোথায়, আধুনিক উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার একখানি গ্রন্থে (Plant Response) ঐ কাল্পনিক উত্তেজনার উৎপত্তি-রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং উহার সহিত বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহাও সুস্পষ্ট দেখাইয়া তিনি উদ্ভিদের বৃদ্ধি-সম্বন্ধে সকল সমস্যারই সুমীমাংসা করিয়াছেন।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় নূতন সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে, পৌনঃপুনিক সাড়া (Multiple Response) সম্বন্ধে আচার্য্য বসুর আবিষ্কারের যে সকল কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্যক। আমরা সেখানে আলোচনা করিয়াছিলাম, সাধারণ সুস্থ গাছে আঘাত দিলে প্রতি আঘাতেই এক একটি সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু উহার ভিতরকার শক্তির পরিমাণ যদি প্রচুর হয়, একই উত্তেজনায় পর পর অনেকগুলি সাড়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। অপরিপুষ্ট দুর্ব্বল বনচাঁড়াল (Desmodium) গাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, প্রতি আঘাতে পাতা এক একবার মাত্র উঠিয়া-নামিয়া সাড়া দিতে থাকিবে। পরিপুষ্ট সবল গাছে আঘাত দাও, একই আঘাতে সেটির পাতা বহু বার উঠা-নামা করিয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করিবে। এই পৌনঃপুনিক সাড়া কেবল বনচাঁড়াল গাছেরই বিশেষত্ব নয়। আঘাত-উত্তেজনায় গাছ-মাত্রেরই শরীরে পৌনঃপুনিক সাড়া চলাফেরা করে ; বনচাঁড়াল গাছের পাতার গঠন ও অবস্থান উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার অনুকূল বলিয়া আমরা কেবল ঐ রকম দু' একটা গাছে পাতায় উঠা-নামা দেখি। এ সকল স্থলে উত্তেজনাস্রোত বৃক্ষ-শরীরের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পাতা গুলাকে নাড়া দিয়া যেন আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। অপর বৃক্ষে উত্তেজনার অস্তিত্ব এই উপায়ে ধরা যায় না, বৈদ্যুতিক উপায়ে বুঝিতে হয়।

পৌনঃপুনিক সাড়া শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি, উদ্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত বা উত্তেজনা দিলে, প্রথমেই আঘাতপ্রাপ্ত অংশ হইতে জলীয় ভাগ কোষপরম্পরায় সর্ব্বাঙ্গে চলিতে আরম্ভ করে, এবং পরে আণবিক বিকারজাত প্রকৃত

উত্তেজনা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গাছে সাড়ার প্রকাশ করিতে থাকে। লজ্জাবতী লতার একটা লম্বা ডালের গোড়ায় কোন প্রকার আঘাত দাও, প্রথমেই আহত অংশের কোষগুলির জলীয় ভাগ কোষপরম্পরায় চলিয়া পত্রবৃন্তগুলিকে রসপুষ্ট ও খাড়া করিয়া দিবে, এবং পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনা পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া পাতাগুলিকে নামাইয়া ফেলিবে। রসপুষ্টি-জনিত পাতার আকস্মিক উত্থান, এবং পরক্ষণে প্রকৃত উত্তেজনা-জনিত তাহাদিগের পতন, লজ্জাবতী গাছে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অপর গাছে এই প্রকার প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিবার উপায় নাই; কিন্তু বৃক্ষমাত্রেই যে ঐ উত্তেজনাদ্বয় বিচিত্র গতিতে চলাফেরা করে, আচার্য্য বসু নানা পরীক্ষায় তাহা স্পষ্ট দেখিয়াছেন।

আচার্য্য বসু পূর্ব্বোক্ত রসসঞ্চলনকেই বৃক্ষের বৃদ্ধির মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উত্তেজনাপ্রাপ্ত অংশ হইতে যখন তালে তালে রস সঞ্চালিত হইতে থাকে, গাছের বর্দ্ধনশীল অংশ তাহা দ্বারা ধাক্কা পাইয়া সেই প্রকার তালে তালে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। একটা রবারের নল টানিয়া ছাড়িয়া দিলে, সেটি যেমন পূর্ব্বের আকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়, ঐ আকুঞ্চন-প্রসারণও কতকটা সেই প্রকারের। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গাছের বর্দ্ধনশীল অংশ রসের ধাক্কা পাইয়া যে টুকু প্রসারিত হয়, ধাক্কা বন্ধ হইলে রবারের নলের মতো সেটি ঠিক্ পূর্ব্বের আকার ফেরৎ পায় না। প্রসারিত হইবামাত্র ফাঁকা স্থানে বৃক্ষের বৃদ্ধিকর সামগ্রী সঞ্চিত হইয়া প্রসারণকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থায়ী করিয়া দেয়। কাজেই, পৌনঃপুনিক ধাক্কায় সেই এক একটু স্থায়ী প্রসারণ জমা হইয়া গাছটিকে বাড়াইয়া তুলে।

গাছের বৃদ্ধির পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে, আহত স্থান হইতে উত্তেজনাগুলি যেমন তালে তালে আসিয়া বর্দ্ধনশীল কোমল অংশে ধাক্কা দেয়, গাছও ঠিক সেই প্রকার তালে তালে বাড়ে। উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে গাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হয় নাই। আচার্য্য বসু তাঁহার "ক্রেস্কোগ্রাফ্" নামক যন্ত্র দ্বারা গাছমাত্রেরই ঐ প্রকার তালে তালে বাড়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

সুতরাং দেখা গেল, গাছের কোন অংশে আঘাত দিলে সেই স্থান হইতে উত্তেজনাটা পুনঃ পুনঃ যাওয়া-আসা করিতে আরম্ভ করে, এবং তদ্দ্বারা গাছের বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সাধারণ অবস্থায় গাছ ঐ প্রকার আঘাত-উত্তেজনা কোথা হইতে পায়? কোন গাছের পৌনঃপুনিক সাড়া দেখিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা সেই গাছটির কোন অংশে তাপ প্রয়োগ করিয়া বা অপর কোন প্রকার আঘাত দিয়া উত্তেজিত করি এবং উত্তেজনা পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করে। গাছ যখন আপনা হইতেই বাড়িতেছে, তখন এই প্রকার আঘাত কোথা হইতে আসে?

আচার্য্য বসু এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়াছেন। তিনি নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, বাহিরের তাপ, আলোক ও রস সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ্ সকল যখন শক্তিপূর্ণ থাকে, তখন বাহির হইতে কোন প্রকার আঘাত-উত্তেজনা না দিলেও তাহাদের পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে থাকে। এই প্রকার অবস্থায় বায়ু দ্বারা গাছের পাতা-গুলির মৃদু আন্দোলন বা পত্রগুলির পরস্পর সংঘর্ষণ প্রভৃতি সামান্য আঘাতও অনেক সময় পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করাইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়; এবং যে পর্য্যন্ত সেই পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তির ভাণ্ডার ক্ষয়-প্রাপ্ত না হয়, ঐ সাড়ার আর বিরাম হয় না। আচার্য্য বসু নানা পরীক্ষা

দ্বারা পৌনঃপুনিক সাড়ার এই প্রকার স্বতঃপ্রবর্ত্তন অনেক গাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছেন, গাছগুলি যখন তাপালোকের শক্তি ও রস সংগ্রহ করিয়া বেশ স্ফুর্ত্তিসম্পন্ন থাকে, তখন তাহাতে যেমন আপনা হইতেই পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে রসপ্রবাহের ধাক্কা পাইয়া গাছও সেই প্রকারে বাড়িতে থাকে।

বৃক্ষের পৌনঃপুনিক সাড়া ও তাহাদের বৃদ্ধির সাড়া তুলনা করিবার জন্য আচার্য্য বসু অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং এই সকল পরীক্ষালব্ধ অনেকগুলি চিত্র তাঁহার একখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয়বিধ সাড়ালিপি তুলনা করিলে খুঁটিনাটি সকল ব্যাপারেই তাহাদের একতা দেখা যায়। সুতরাং, পৌনঃপুনিক সাড়ার প্রবাহ যে গাছপালাকে বাড়াইয়া তুলে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদগণ পৌনঃপুনিক সাড়ার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার জানিতেন না। কাজেই, উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা গাছের কোন এক অন্তর্নিহিত শক্তিকে (Inner Stimuli) তাহাদের বৃদ্ধির কারণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই শক্তির প্রকৃত পরিচয় তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইত না। আচার্য্য বসু এই আবিষ্কার দ্বারা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার ছিল, তাহা স্পষ্ট ভাষায় সকলকে জানাইয়াছেন। উদ্ভিদ শরীরের তালে তালে কম্পন (Rhythmic Activity) যে তাহাদের বৃদ্ধির একমাত্র কারণ, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এবং বৃক্ষের উত্তেজনাশীলতাই যে, ঐ কম্পনের

মূল কারণ, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং, এখানেই সেই রহস্যময় "Inner Stimuli" কথাটির সদ্‌ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া বাহিরের তাপালোক হইতে গাছপালা যে সকল শক্তি নিজের দেহে সঞ্চিত রাখে, স্থূল কথায় বলিতে গেলে তাহাই উদ্ভিদের Inner Stimuli-র মূল উৎপাদক।

শক্তির সঞ্চয় না থাকিলে সজীব-নির্জীব কোন বস্তুই কাজ করিতে পারে না। বাহিরের তাপালোক উদ্ভিদ্-দেহে শক্তির সঞ্চার করে; কাজেই গাছপালাকে তাপালোকে হইতে বঞ্চিত করিলে সেগুলি নির্জীব হইয়া পড়ার সম্ভাবনা। আচার্য্য বসু শত শত পরীক্ষায় নানা জাতীয় উদ্ভিদ্‌কে ঐ প্রকারে নির্জীব করিয়া, পরে তাহাদের দেহে কৃত্রিম উপায়ে তাপালোক প্রভৃতির উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন; বাহিরের উত্তেজনা দেহস্থ করিয়া মৃতপ্রায় উদ্ভিদ্ সকল সুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদের বৃদ্ধি ও রসশোষণও দেখা গিয়াছিল।

শক্তি সঞ্চিত হইলেই তাহা দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না; আমাদের নিজের শরীরের কথা ভাবিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। যখন কোনও কারণে শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শক্তির সঞ্চয় আরম্ভ হইলে তখনই আমাদের কার্য্য করিবার সামর্থ্য ফিরিয়া আসে না। সে সময়ে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়; সুতরাং শরীরকে খাড়া রাখিবার জন্য যে একটু শক্তির আবশ্যক, সেটুকু সর্ব্বাগ্রে আমরা আত্মসাৎ করিয়া লই এবং ইহার প্রতিদানে আমরা কোন কার্য্যই দেখাইতে পারি না। এই প্রকারে খাড়া হওয়ার পর যে শক্তি পাওয়া যায়, আমরা কেবল তাহা দ্বারাই কাজ দেখাইতে পারি। আচার্য্য বসু উদ্ভিদেও অবিকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রাণিলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। দুর্ব্বল

গাছ পরীক্ষা করিয়া দেখ,—তাহাতে বৃদ্ধি, রসশোষণ প্রভৃতি কার্য্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইবে না। তার পর তাহাতে উত্তেজনা প্রয়োগ কর,—স্পষ্টই বুঝা যাইবে, উহার কতক অংশ গাছটিকে সবল করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া পড়িতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তাহার বৃদ্ধি ও রসশোষণের কার্য্য আরম্ভ হইতেছে।

শীতাতপের আধিক্য প্রাণীর স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল নয়। অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গরমে সাধারণ প্রাণীর জীবনরক্ষা করা দায় হইয়া পড়ে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, শীতাতপের মাত্রা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিলে প্রাণী বেশ স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ে। নানা জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন্‌টি কি প্রকার উষ্ণতায় সুস্থ থাকে, তাহা আজও স্থির হয় নাই; তবে শারীরিক গঠন ও অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক প্রাণীরই যে এক একটা স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণতা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আচার্য্য বসু নানা উদ্ভিদ্ পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেক জাতির এক একটা স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণতা (Optimum Temperature) আবিষ্কার করিয়াছেন। উষ্ণতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিলে যে গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে আরম্ভ করে, আচার্য্য বসু তাঁহার স্বাবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য

আমরা সাধারণ উদ্ভিদের যে আকার-প্রকার দেখিতে পাই, তাহার অনেকটা ভূমধ্যাকর্ষণের (Gravity) ফল বলিয়া ডারুইন্ প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়া গিয়াছেন। কোন গাছের ডালকে মাটির সহিত শোয়াইয়া রাখ, দেখিবে, ডালটা বাঁকিয়া মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিতেছে। যে কোন গাছের মূল পরীক্ষা কর, সেটিকে ক্রমেই মাটির ভিতর নামিয়া যাইতে দেখিবে। এই সকল ব্যাপার ভূমধ্যাকর্ষণের ফলে হয় বলিয়া বহুকাল সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠিক কি প্রকারে সেই একই আকর্ষণ দ্বারা গাছের একটা অংশ উপরের দিকে এবং অপরটি তাহার বিপরীত দিকে বাড়ে, তাহা প্রাচীন বা আধুনিক কোন পণ্ডিতই ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ ডারুইন্ সাহেব ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের এক বিশেষ অধিবেশনে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—পৃথিবীর টানে যে গাছের শিকড় নীচের দিকে ও গুঁড়ি উপরে উঠে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু কোন কৌশলে যে একই উত্তেজনায় ঐ বিপরীত কার্য্যদ্বয় হয়, তাহা আজও আমাদের অজ্ঞাত।

ভূমধ্যাকর্ষণের সহিত গাছের বৃদ্ধির পূর্ব্বোক্ত বৈচিত্র্যগুলির সম্বন্ধ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর আকর্ষণ উদ্ভিদ-দেহকে কি প্রকারে উত্তেজিত করে, দেখা আবশ্যক; এবং তাহার পর উত্তেজনা দ্বারা কি প্রকার কার্য্য পাওয়ার সম্ভাবনা, তাহা বিবেচ্য।

পাঠক অবশ্যই জানেন যে, জিনিসের সামগ্রী-পরিমাণ (Mass) যত অধিক হয়, তাহার ভারও তত অধিক হয়। বহুসামগ্রী-সম্পন্ন জিনিসকে ভারি বলিয়া অনুভব করানই ভূমধ্যাকর্ষণের একমাত্র কার্য্য। সুতরাং গাছের বৃদ্ধির উপর পৃথিবীর আকর্ষণের কথা আলোচনা করিতে হইলে, গাছের কোষগুলির (Cells) গুরুত্বের কার্য্য অনুসন্ধান আবশ্যক।

ভূমধ্যাকর্ষণের ফলে উদ্ভিদ-দেহ কি প্রকার উত্তেজনা-প্রাপ্ত হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য গত শতাব্দীতে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রথায় গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ফলে এই প্রসঙ্গে দুইটি পৃথক্ মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে।
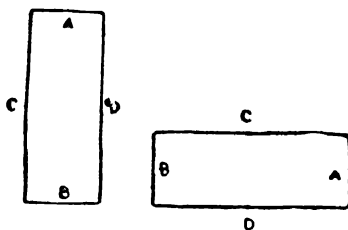
২২শ চিত্র

একদল পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন, উদ্ভিদ-কোষে যে রস, শ্বেতসার (Starch) প্রভৃতি পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহার ভার উদ্ভিদ্-দেহের উপরে ও নীচের অংশে বিভিন্ন পরিমাণে চাপ দেয়। কাজেই, ইহাতে কতকগুলি কোষ অবশিষ্টগুলি অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে।

২২শ চিত্রটি দুইটি কোষের ছবি। যখন কোনও গাছের ডালকে জোর করিয়া শুয়াইয়া রাখা হয়, চিত্রের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ অংশের ন্যায় তাহার কোষগুলিও শুইয়া পড়ে। ডাল স্বাভাবিক অবস্থায় খাড়া

থাকিলে, কোষগুলিও বামপার্শ্বের ছবিটির ন্যায় খাড়া হইয়া থাকে। জিনিসের ভার, তাহার ভূসংলগ্ন অংশেই কার্য্যকারী হয়, কাজেই শায়িত কোষের "D" চিহ্নিত অংশের উপরকার চাপ, "C" চিহ্নিত অংশ অপেক্ষা অধিক হইবারই কথা। বামের কোষটিতেও "A" স্থান অপেক্ষা "B" স্থানে অধিক চাপ পড়িবার সম্ভাবনা। একই কোষের ঊর্দ্ধ ও অধঃ-প্রাচীরের উপরকার এই প্রকার চাপের বৈচিত্র্য দেখিয়া, উক্ত পণ্ডিতগণ ইহাকেই ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তটি (The theory of hydrostatic or radial pressure) জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ ফেফার্ (Pfeffer) সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন; জ্যাপেক্ (Czapek) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক। নোল্ ও হাবারলা (Noll, Haberlandt) প্রমুখ বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয় মতবাদের (Theory of Statoliths) প্রবর্ত্তক। ইঁহারা কোষস্থ জলীয় ভাগের ভার গণনার মধ্যে আনেন নাই। কেবলমাত্র কোষস্থ শ্বেতসার-কণা প্রভৃতি গুরুপদার্থের (Statoliths) ভার লইয়া হিসাব করিয়াছিলেন।

পরপৃষ্ঠায় ২৩শ চিত্র একটি ভূ-শায়িত ডালের ছবি। ভিতরকার ঘরগুলি এক একটি কোষ, এবং তাহাদের ভিতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি রহিয়াছে, সেগুলি শ্বেতসার প্রভৃতির কণা। পৃথিবী কোন জিনিসকে পাশাপাশিভাবে টানে না, সুতরাং কোষ-সামগ্রীর ভার চিত্রস্থ উদ্ভিদ্-দেহের "E ..." এবং "F ..." এই দুই অংশের উপরেই পড়িবার কথা। "..." রেখাক্রমে যে চারিটি কোষ সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাতে কোষ-সামগ্রীর চাপ উহাদের অন্তঃপ্রাচীরের উপর পড়িতেছে এবং "...." রেখার কোষগুলিতে তাহাদের চাপ ঐ গুলির বহিঃপ্রাচীরের উপরে লাগিতেছে। উদ্ভিদ্-কোষের ভিতর ও বাহিরের প্রাচীরের

উত্তেজনশীলতা সমান নয়। কাজেই, ঐ প্রকারের চাপ পাইয়া উদ্ভিদ্-দেহের এক পার্শ্ব অপর পার্শ্ব অপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে, ভূমধ্যাকর্ষণ-জনিত চাপের যে এই বৈষম্য হয়, তাহাই ভূ-শায়িত ডালের মাথা উচু হওয়া ইত্যাদির কারণ। তাহা ছাড়া গাছের গুঁড়ি ও শিকড়ের পরস্পর বিপরীত দিকে
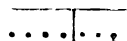
২৩শ চিত্র

বৃদ্ধি হওয়ার কারণ উল্লেখ করিতে গিয়াও, তাঁহারা ভূমধ্যাকর্ষণের ঐ কার্য্যটির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি যে বেশ সুযুক্তিপূর্ণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; এবং পৃথিবীর টান যে উদ্ভিদ্-দেহের উপর উত্তেজনা প্রয়োগ করে, এবং উদ্ভিদ্‌মাত্রেরই যে সেই টানের দিগবোধ (Graviperception) আছে, তাহারও আভাস আমরা ঐ সিদ্ধান্তদ্বয়ে দেখিতে পাই। কিন্তু কি প্রকারে সেই টান নানা অঙ্গে নানা প্রকার উত্তেজনায় পরিণত হয়, এবং কি কৌশলেই বা তাহারই দ্বারা গাছের বৃদ্ধিতে নানা প্রকার বৈচিত্র্য আসে, তাহার কোন ব্যাখ্যানই ঐ সিদ্ধান্তদ্বয় হইতে পাওয়া যায় না।

ভূ-শায়িত ডাল কেন মাথা উঁচু করিয়া বাড়ে,—এই প্রশ্নটি লইয়া উক্ত সিদ্ধান্তিগণের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থির হইয়াছে, শাখার ঠিক ভূসংলগ্ন দিকটা পৃথিবীর টানে অধিক চাপ পাইয়া উপরের দিক অপেক্ষা দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ করে, তাই শাখার অগ্রভাগ ধনুকাকারে বাঁকিয়া উর্দ্ধগামী হইয়া পড়ে।

এই ব্যাখ্যানটি কতদূর সত্য, তাহার বিচার আবশ্যক। আমরা "উদ্ভিদের বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন উত্তেজনা দ্বারা যদি গাছে প্রকৃত-সাড়ার (আণবিক-বিকৃতি) প্রবাহ চলিতে থাকে, তবে তাহা গাছকে বাড়ায় না, বরং তাহার দ্বারা গাছের বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া আসে। উত্তেজনা দ্বারা যে এক রস-প্রবাহ কোষ পরম্পরায় চলিয়া অপ্রত্যক্ষ বা অবান্তর সাড়াই উৎপত্তি করে, তাহাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির মূল কারণ। সুতরাং, কোষ-সামগ্রীর চাপকেই যদি ভূ-শায়িত ডালের সোজা হওয়ার কারণ বলা যায়, তবে বলিতে হয়, ঐ চাপের উত্তেজনা দ্বারা চাপপ্রাপ্ত অংশের যে বৃদ্ধি-স্তম্ভন হয়, তাহাই ঐ ব্যাপারের মূল কারণ। কিন্তু নীচেকার অর্দ্ধেকটার বৃদ্ধি অপ্রতিহত থাকিলে, গাছ কখনই উপরের দিকে বাঁচিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহার মাথা নিশ্চয়ই আরো অধিক নীচু হইয়া পড়িত। কাজেই দেখা যাইতেছে, গাছের মাথা উঁচু হওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে কখনই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার প্রকৃত কারণ স্থির করিবার জন্য বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নূতন আবিষ্কারগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

ভূ-শায়িত ডাল যখন ধনুকাকারে বাঁকিয়া মাথা উঁচু করে, তখন এই বক্রতার দুইটি কারণ আমাদের মনে আসিয়া পড়ে। (১) —হয় ত ডালের ভূসংলগ্ন অংশটা উপরের অংশ অপেক্ষা অধিক

বাড়িতেছে, অথবা (২) নিম্নার্দ্ধের বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া, কেবল উপরার্দ্ধের বৃদ্ধিই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত কারণ তাহা স্থির করিবার জন্য অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং শেষে দ্বিতীয় কারণটিকেই যথার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

গাছের গুঁড়ি ও শিকড়ের পরস্পর বিপরীত দিকে বাড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন,—ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনা পাইলেই শিকড় ও গুঁড়ি নিজেদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী ঐ প্রকার বিপরীত কার্য্য দেখায়, অর্থাৎ পৃথিবীর টান পাইলে নীচের দিকে বর্দ্ধিত হওয়া একা শিকড়েরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম, এবং সেই প্রকার উপর দিকে বাড়া গুড়িরও একটি ধর্ম্ম। আচার্য্য বসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ব্যাখ্যান গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল, আমরা সুপরিচিত প্রাকৃতিক কার্য্যগুলিতে জড় ও শক্তির যেমন বিচিত্র লীলা দেখিতে পাই, এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই তাহারই একটি। গাছের ডালে ও শিকড়ে এক একটা অদ্ভুত রকমের বিশেষ ধর্ম্ম আরোপ করিয়া কারণ দেখাইতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। সুপথ পাইলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো সহজ হইয়া পড়ে। উদ্ভিদ্-তত্ত্বসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত জটিল সমস্যাগুলির সমাধান কোথায় আচার্য্য বসু দিব্যচক্ষে তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং কিছু কালের গবেষণায় সকলগুলিরই ভিতরকার গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আচার্য্য বসুর ঐ সিদ্ধান্তগুলি বুঝিতে হইলে প্রথমেই তাঁহারই আবিষ্কৃত দুই একটি নূতন তথ্যের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

আমরা সকলেই দেখিয়াছি, লজ্জাবতী লতার ডালে কোন প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে তাহার পাতা কিছুক্ষণের জন্য নামিয়া গিয়া ক্রমে পূর্ব্ববৎ খাড়া হইয়া দাঁড়ায়। আঘাত দিলে আহত স্থান হইতে যে আণবিক বিকারের প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে, আচার্য্য বসু তাহাকেই পাতার পতনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, গাছের কোনও অঙ্গকে অতিরিক্ত শীতল করিলে যখন তাহার অণু সকল অসাড় হইয়া পড়ে, তখন সহস্র আঘাতেও সে স্থানের আণবিক বিকৃতি হয় না। লজ্জাবতী লতার পত্রবৃন্তে খুব ঠাণ্ডা দিয়া তাহাতে আঘাত-উত্তেজনা প্রয়োগ কর, পাতা কোনক্রমেই নামিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদের যে অঙ্গ দিয়া উত্তেজনার সাড়া প্রবাহিত হয়, সেখানে ঠাণ্ডা দিলে উত্তেজনার কার্য্য রোধ হইয়া যায়। ভূ-শায়িত ডালের কোন্ অংশে সাড়ার প্রবাহ চলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য বসু শাখার উপরে ও নীচে ক্রমে শীতল জল সেচন করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, ডালের তলার অংশে শীতল জল দ্বারা কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, কিন্তু উপরে জল-সেচন মাত্রেই তাহার উপর দিক ধনুকাকারে বাঁকা হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভূ-শায়িত ডালের উপরার্দ্ধই যে ভূমধ্যাকর্ষণে উত্তেজিত হইয়া ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাছের শিকড় কেন নীচের দিকে বাঁকিয়া যায়, এবং তাহার গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা কেন উপরে উঠিতে থাকে, এই প্রশ্ন দুইটি প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদ্-তত্ত্ব-বিদ্‌গণের নিকট প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিতগণ গাছের উপর ও নীচের অংশে

দু'টা পৃথক্ ধর্ম্ম আরোপ করিয়া যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহার আমরা কোন অর্থ ই খুজিয়া পাই না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাঁহারা ঐ বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলির মূল যতদিন পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে না পারিতেছেন, ততদিন কেহই তাঁহাদের ঐ ব্যাখ্যানে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। ডারুইন্ সাহেব তাপ দ্বারা শিকড়ের অগ্রভাগের একটা পাশ (Unilateral) উত্তেজিত করিয়া দেখিয়াছেন, শিকড়ের ডগা বাঁকিয়া সেই উত্তেজনা হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু সেই প্রকার উত্তেজনাই গাছের বর্দ্ধনশীল অপর কোন অংশে প্রয়োগ করিলে তাহার ঠিক বিপরীত কার্য্য দেখা যায়। অর্থাৎ এস্থলে মূলের অগ্রভাগ বাঁকিয়া উত্তেজনার কেন্দ্রের দিকেই চলিতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, একই উত্তেজনার এই দুই বিপরীত ফলে ডারুইন্ অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং বহু চিন্তায় ইহার অন্য কোনও ব্যাখ্যান না পাইয়া, এগুলিও উদ্ভিদের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া শেষে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই সকল বিশেষ গুণ উদ্ভিদ্ মাত্রেরই জাতি ও বংশরক্ষার অনুকূল বলিয়া, অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে সেগুলি ক্রমশঃ উদ্ভিদের নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক, গাছের উর্দ্ধাধঃ অংশের বৃদ্ধিবৈচিত্র্য ও তাহাদের আঘাত-অনুভূতির পার্থক্যসম্বন্ধে আচার্য্য বসু কি বলেন, এখন আলোচনা করা যাউক।

উদ্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত-উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, আহত স্থান হইতেই উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া স্বতঃই দুই প্রকারের সাড়ার উৎপত্তি করে। (১ম) আহত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া রসপ্রবাহের সাড়া, (২য়) আণবিক বিকৃতিজাত সাড়া এই দুইটি সাড়ার মধ্যে প্রথম-টিরই বেগ দ্রুততর, এবং ইহাই গাছকে বাড়ায়। দ্বিতীয় অর্থাৎ

আণবিক বিকৃতিজাত প্রকৃত সাড়া কিছু মন্থরগতিতে চলে, এবং তদ্দ্বারা গাছের বৃদ্ধি রোধ প্রাপ্ত হয়। এই দুই বিচিত্র প্রবাহের কথা অনুমান-মূলক নহে। জীবিত উদ্ভিদের অঙ্গে আঘাত দিলেই যে, ঐ দুই সাড়া বিভিন্ন গতিতে সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে, আচার্য্য বসু শত শত পরীক্ষায় তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উহাদের অস্তিত্ব জানিতে হইলে বৈদ্যুতিক উপায় অবলম্বন করাই সহজ।

২৪শ চিত্র

২৪শ চিত্রের "a" অংশের "A" চিহ্নিত স্থানটি কোনও শাখার একটি বর্দ্ধনশীল অংশ। ঐ স্থানে একখণ্ড তারের একপ্রান্ত সংলগ্ন করিয়া তাহার অপর প্রান্তটিকে এক নিকটবর্ত্তী পত্রে সংযুক্ত রাখা হইয়াছে, এবং সেই তারের ভিতর একটি তড়িৎ-মাপক যন্ত্র (Galvanometer) সন্নিবিষ্ট আছে। কোন আঘাত-উত্তেজনায় বৃক্ষ-অঙ্গে যে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহার দিক ও পরিমাণ ঐ যন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করা যায়। আচার্য্য বসু দেখিয়াছেন, কোনও আঘাতে প্রকৃত অর্থাৎ আণবিক উত্তেজনার সাড়া চলিতে আরম্ভ করিলে, তড়িৎ-মাপক যন্ত্রের শলাকা যে দিকে বিচলিত হয়, রসপ্রবাহের সাড়া চলিলে সেটি বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসে। "a" চিত্রটির "T" চিহ্নিত স্থানে আঘাত দাও, দেখিবে, "G" চিহ্নিত

যন্ত্রের শলাকা বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা ঐ আঘাতের রসপ্রবাহ-জনিত সাড়ার কাজ,—কারণ, আমরা বলিয়াছি, রস-প্রবাহের সাড়ার গতিই দ্রুততর। এই সাড়া থামিয়া গেলে, শলাকাটিকে বিপরীত দিকে চলিতে দেখা যাইবে; ইহাই সেই নাতিদ্রুত প্রকৃত সাড়ার কাজ।

আচার্য্য বসু কোন বৃক্ষশাখায় ২৪শ চিত্রের অনুরূপ তার সংযুক্ত করিয়া তড়িৎ-মাপক যন্ত্রের শলাকার বিচলন পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদ্-তত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই চিত্রের "a" চিহ্নিত অংশস্থ "T" স্থানটিকে তাপ প্রয়োগ করিয়া বা চিম্‌টি কাটিয়া উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তড়িৎ-মাপক যন্ত্রে কেবল রসপ্রবাহের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। তার পর তিনি সেই স্থানেই আবার বহুক্ষণ ধরিয়া প্রবল উত্তেজনা প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, প্রথমে রসপ্রবাহের সাড়া এবং পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনার সাড়া যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য বসু "b" চিত্রের "A" চিহ্নিত স্থানেও উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল আণবিক সাড়ার লক্ষণ যন্ত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, রসপ্রবাহের উত্তেজনা-লক্ষণ এ স্থলে মোটেই দেখা যায় নাই।

পূর্ব্ববর্ণিত পরীক্ষাগুলির ফলে বেশ বুঝা যায়, বর্দ্ধনশীল অংশ হইতে কিছু দূরে, অর্থাৎ "T" এর মত স্থানে এক দিক ঘেঁষিয়া (Unilateral) উত্তেজনা দিলে শাখার সেই দিক দিয়া কেবল রসপ্রবাহের দ্রুত সাড়া চলিতে আরম্ভ করে। আণবিক বিকৃতিজাত প্রকৃত সাড়া ঐ মৃদু উত্তেজনায় সেখানে মোটেই পৌঁছায় না, এবং এই প্রকার এক দিকে ঘেঁষা উত্তেজনায়, শাখার অপর

পার্শ্বের কোন প্রকার বিকার হয় না। বর্দ্ধনশীল অংশে যদি প্রকৃত উত্তেজনা উৎপাদন করা আবশ্যক হয়, তবে সেইস্থানে বা "T"এর মত দূরবর্ত্তী অংশে অত্যন্ত প্রবল উত্তেজনা প্রয়োগ করার আবশ্যক হয়।

আঘাত-উত্তেজনাজাত ঐ রসপ্রবাহে ও আণবিক সাড়ায় উদ্ভিদ-দেহের আকারগত কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না, এখন আলোচনা করা যাউক। এই অঙ্গবিকৃতির ব্যাপার বুঝিতে হইলে রসপ্রবাহ দ্বারা গাছের বৃদ্ধি ও আণবিক বিকৃতির প্রবাহ দ্বারা যে সেই বৃদ্ধিরই রোধ হয়, এই দুটী স্থূল কথা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্ব পরীক্ষায় দেখিয়াছি, দূরবর্ত্তী স্থানে আঘাত দিলে, শাখার আহত পার্শ্ব ধরিয়া কেবল রসপ্রবাহের সাড়াই বর্দ্ধনশীল অংশে পৌঁছায়। কাজেই, এ স্থলে অনুত্তেজিত পার্শ্ব অপেক্ষা উত্তেজিত পার্শ্বটিই বাড়িতে আরম্ভ করে, এবং ইহার ফলে শাখাটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায়। * বলা বাহুল্য, এস্থলে শাখার উত্তেজিত অংশটী ধনুর কুব্জ (Convex) পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া শাখা-প্রান্তকে উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইতে দেখিয়া, ডারুইন্ সাহেব অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আচার্য্য বসুর পূর্ব্ববর্ণিত প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাখ্যানে সেই প্রাচীন সমস্যাটির মীমাংসা হইয়া যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্বের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বর্দ্ধনশীল অংশ হইতে দূরে প্রবল উত্তেজনা দিলে প্রথমে ক্ষণিক রসপ্রবাহ চলিয়া শেষে কেবল মাত্র আণবিক সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আণবিক সাড়া গাছের বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই, এখানে শাখার উত্তেজনাপ্রাপ্ত দিকটার

---

* কোন জিনিষের এক পার্শ্ব অপর পার্শ্ব অপেক্ষা প্রসারিত হইলে ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়াই যে সম্ভাবনা, পাঠক একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া অপর পার্শ্বের বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায় বলিয়া সেটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া পড়ে। এস্থলে ধনুর ন্যুব্জ (Concave) পৃষ্ঠে উত্তেজনার কেন্দ্র থাকে। বৃক্ষ-অঙ্গে প্রবল তাপ প্রয়োগ করিয়া ডারুইন্ সাহেব তাহার অগ্রভাগটিকে যে উত্তেজনার দিকেই যাইতে দেখিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যান আমরা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারি।

দূরে উত্তেজনা প্রয়োগ না করিয়া, ঠিক বর্দ্ধনশীল অংশেই মৃদু আঘাত দিলে শাখার কি প্রকার বিকৃতি হয়, আচার্য্য বসু তাহাও আবিষ্কার করিয়াছেন। ২৪শ চিত্রের "d" অংশটির "A" চিহ্নিত স্থান কোনও শাখার বর্দ্ধনশীল অংশ। মনে করা যাউক, ঐ স্থানে যেন মৃদু উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইল। এখানে উত্তেজনাপ্রাপ্ত স্থানে কেবল প্রকৃত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, এবং তাহারই ঠিক বিপরীত অর্থাৎ "B" চিহ্নিত অংশে কেবল রসপ্রবাহের চিহ্ন দেখা যাইবে। * কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, রসপ্রবাহ গাছের বৃদ্ধি করায় এবং প্রকৃত সাড়ায় বৃদ্ধি রোধ হইয়া যায়। কাজেই, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের উত্তেজনায় এখানে "A" অংশের বৃদ্ধিরোধ "B" ও "B′" এর বৃদ্ধিদ্রুততা সংঘটনই সম্ভাবনা। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় অবিকল এই ফলই পাওয়া গিয়াছিল,— শাখাটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া পড়িয়াছিল, এবং উত্তেজনার কেন্দ্রটি ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

---

* গাছের আঁশ (Fiber) যে দিকে থাকে, উত্তেজনামাত্রই যে তাহা অনুসরণ করিয়া সহজে চলাফেরা করে, আচার্য্য বসু অনেক পরীক্ষায় তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। আঁশ ভেদ করিয়া অর্থাৎ আড়াআড়ি ভাবে উত্তেজনা সহজে চলিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে "A" চিহ্নিত স্থানে প্রবল উত্তেজনা দিলে, পূর্ব্বের ঠিক বিপরীত ফল পাওয়া যায়; অর্থাৎ শাখাটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায় বটে, কিন্তু উহার উত্তেজিত অংশটা তখন ধনুর কুব্জ পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। কারণ, এস্থলে প্রবল উত্তেজনায় "A" অংশটি অসাড় হইয়া যায়, এবং তাহারই বিপরীত দিক অর্থাৎ "B" স্থানে প্রকৃত উত্তেজনা আসিয়া সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করে। কাজেই, মোটের উপর "B" স্থানের তুলনায় "A" স্থানের বৃদ্ধি অধিক হইয়া পড়ায়, শাখাটি বাঁকিয়া যায়।

উল্লিখিত পরীক্ষাগুলিতে সাড়ার প্রবাহ কোন দিকে যাওয়া সম্ভাবনা, তাহা অনুমান করিয়াই যে আচার্য্য বসু এই কথাগুলি বলিয়াছেন, একথা যেন কেহ মনে না করেন। উদ্ভিদ্‌দেহে সত্যসত্যই উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া ও তাহার কাজ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলির সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এখন আচার্য্য বসুর পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আঘাত-উত্তেজনায় ডাল ও শিকড়ের নানা বিকৃতি দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের অঙ্গবিশেষে যে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অমূলক। আঘাত উত্তেজনার মাত্রা ও প্রয়োগ স্থানভেদে কখনো রসপ্রবাহ এবং কখনো প্রকৃত উত্তেজনার প্রবাহ প্রাধান্য লাভ করিয়া, উদ্ভিদের শাখা-মূলকে যে কত বিচিত্রভাবে বাঁকাইয়া বাড়াইতে পারে, তাহা আচার্য্য বসু মহাশয় শত শত পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের ধর্ম্ম পৃথক্ নয়, উভয়েই আঘাত-উত্তেজনায় একই প্রকারে সাড়া দিতে পারে।

এখন ভূমধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় গুঁড়ির উপর দিকে যাওয়া ও শিকড়ের নীচে নামার কারণপ্রসঙ্গে আচার্য্য বসু কি বলেন, দেখা

যাউক। বলা বাহুল্য, এসম্বন্ধে আধুনিক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ গুঁড়ি ও শিকড়ে এক একটা বিশেষ ধর্ম্মের আরোপ করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন, আচার্য্য বসু তাহাতে মোটেই আস্থা স্থাপন করেন নাই। ইনি বলিয়াছেন, শাখা ও মূলের ধর্ম্ম একই—মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় উহাদের একটায় রসপ্রবাহের সাড়া, এবং অপরটিতে আণবিক উত্তেজনার সাড়া কাজ করে বলিয়া, আমরা উদ্ভিদের ঐ দুই অংশে ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেখিতে পাই। মনে করা যাউক, কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কোষ-সামগ্রীর (Statoliths) ভারজনিত মৃদু উত্তেজনা একপার্শ্ব বহিয়া শিকড়ে আসিয়া পৌঁছিল। এস্থলে প্রকৃত সাড়ার প্রবাহ আসা অসম্ভব; কারণ, মৃদু উত্তেজনায় কেবল দ্রুততর রসপ্রবাহের সাড়া চালিত হয়। কাজেই, এখানে দূরবর্ত্তী মৃদু উত্তেজনা দ্বারা শিকড় যে বাঁকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আবার মনে করা যাউক, বৃক্ষের গুঁড়ির সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত কোষ-সামগ্রীর চাপে, যেন সেটি প্রত্যক্ষ ভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়িল। এস্থলে রসপ্রবাহের সাড়া কাজ করিতে পারিবে না, * কেবল প্রকৃত সাড়াই প্রাধান্য লাভ করিয়া গুঁড়িকে বাঁকাইয়া দিবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রকৃত সাড়া ও রস-প্রবাহের সাড়া উদ্ভিদ্-দেহকে ঠিক বিপরীত দিকে বাঁকাইয়া দেয়। সুতরাং, সেই পূর্ব্বের উদাহরণে রসপ্রবাহের সাড়ায় শিকড়টা যেদিকে বাঁকিয়াছিল, এখানে প্রকৃত সাড়ায় গুঁড়িটা যে তাহার ঠিক বিপরীত দিকেই বাঁকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

---

* কারণ, আহত স্থানের কোষ হইতেই জল বহির্গত হইয়া দূরবর্ত্তী স্থানে রস-প্রবাহের সাড়ার উৎপত্তি করায়। এজন্য ঠিক আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কেবল প্রকৃত সাড়াই দেখা যায়।

শিকড়ের নীচের দিকে নামা ও গুড়ির উপর দিকে উঠাকে বৃক্ষ-দেহের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া, পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ Geotropism, এবং Apro-geotropism প্রভৃতি যে সকল শব্দ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি যে কত নিরর্থক, আচার্য্য বসুর পূর্ব্ববর্ণিত আবিষ্কারগুলি হইতে আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। নীচের দিকে নামা ও উপরের দিকে উঠা, শিকড় ও শাখার বিশেষ ধর্ম্ম নয়। জড়দেহে আঘাত-উত্তেজনা দিলে তাহার যে আণবিক বিকৃতি হয়, তাহাই একমাত্র জড়ের মূল ধর্ম্ম। উদ্ভিদের অঙ্গবিকৃতি, উঠানামা, বাঁকাচোরা - সকলই জড় ও শক্তির সেই এক মহাধর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বদাই নিয়মিত হইতেছে।

উদ্ভিদ্ ও আলোক

নানা প্রকার আঘাত-উত্তেজনায় উদ্ভিদ্‌দেহের যে সকল পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তন্মধ্যে আলোকজাত পরিবর্ত্তনগুলিই বোধ হয় খুব সুস্পষ্ট। আলোকস্পর্শে বৃক্ষসকল পাতা ডাল উঠাইয়া নামাইয়া যে কত রকমে সাড়া দেয়, তাহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। ডাল বাঁকিয়া কখনো আলোকের দিকে অগ্রসর হয় এবং অবস্থাবিশেষে সেই ডালই আবার কখনো কখনো আলোক হইতে দূরে যাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতে আরম্ভ করে। রাত্রির অন্ধকারে বা মেঘ্‌লা দিনে কতকগুলি গাছের পাতা জোড় বাঁধিয়া গুটাইয়া আসে, এবং পরে সেগুলি আবার খুলিয়া যায়। প্রখর সূর্য্যালোকে শিরিষ, তেঁতুল প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষের পাতাকেও রাত্রির ন্যায় সুপ্তাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়।

একমাত্র আলোকের উত্তেজনায় নানা বৃক্ষের শাখাপত্রকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সঞ্চালিত হইতে দেখিয়া প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-বিদ্‌গণ এ-সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। আলোকপাতে উদ্ভিদ্‌দেহের ভিতরে কি কাজ হয়, তাহা ইঁহারা ধরিতে পারেন নাই। কাজেই, কতকগুলি নিরর্থক ও অবান্তর কথায় উক্ত তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের গবেষণার বিবরণী পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের স্বদেশবাসী এবং অধুনা জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিদেশীয় বড় বড় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া উদ্ভিদের

উপরে আলোকের প্রকৃত কার্য্য আবিষ্কার করিবার জন্য কিছুদিন গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। আচার্য্য বসু সরল ব্যাখ্যানগুলির তুলনায়, এ সম্বন্ধে বিদেশের মহাপণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তগুলি যে কত নিরর্থক ও অসার, বর্ত্তমান অধ্যায়ে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আলোকের উত্তেজনাকে একদা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার স্থির করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলিকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। আলোকপাতে উদ্ভিদ্ দেহে যে সকল বিচিত্র পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহারা সেগুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; এবং শেষে আলোকে নানা অদ্ভুত গুণের আরোপ করিয়া তাঁহারা নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন। তাপ, বিদ্যুৎ ও নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের উত্তেজনা-প্রয়োগে, উদ্ভিদ দেহে কি প্রকার সাড়া প্রকাশ পায়, আমরা আচার্য্য বসুর আবিষ্কার সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব অধ্যায়গুলিতে তাহার আভাস দিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে, উদ্ভিদ দেহে উত্তেজনা মাত্রেরই প্রভাব এক। বসু মহাশয় আলোকের প্রভাব স্থির করিবার জন্য নানা পরীক্ষাদি করিয়া দেখিয়াছেন,—ইহাও প্রায় তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদকে সাড়া দেওয়ায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি তাপালোক ও বিদ্যুতাদির প্রভাবের মধ্যে একতা আবিষ্কার করিতে পারে নাই; তাই তাঁহারা প্রত্যেক উত্তেজনাকেই এক একটা পৃথক্ ব্যাপার মনে করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, এই ভ্রান্ত ধারণাই ইঁহাদের সমস্ত শ্রম ও চেষ্টাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়াছিল; নচেৎ আজ আমরা উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের আর এক নূতন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম।

লতানে গাছের ডাঁটায় ভূসংলগ্ন অংশে আলোকপাত করিলে সেটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যায় এবং ধনুর ন্যুব্জ (Concave) পৃষ্ঠ সেই ভূসংলগ্ন অংশের দিকে থাকে। এখন ডাঁটার উপরের অর্দ্ধে (অর্থাৎ যে অংশ দিবসে সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকে) পূর্ব্বের মত আলোকপাত কর, এখানেও তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় ভূমির দিকে ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া বাঁকিতে দেখিবে। এই ব্যাপারটি সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডি ভ্রায়েসের (De Vries) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। উদ্ভিদ্‌বিদ্ স্যাক্‌স (Sacas) সাহেবও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, আলোকের উত্তেজনা উপর নীচে যেখানেই দেওয়া যাউক না কেন, ছায়াবৃত নীচের অংশটাকে ন্যুব্জ পৃষ্ঠে রাখিয়া লতামাত্রেই বাঁকিয়া যায়।

ডি-ভ্রায়েস সাহেব পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলিয়াছিলেন, —লতানে গাছের উপরের পৃষ্ঠ অনেক সময় সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকে, এবং নীচের অংশ ভূসংলগ্ন থাকায় তাহাতে কখনো আলোক পড়ে না। এজন্য লতার নীচের ও উপর পিঠের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। এখন পৃথক্‌ভাবে উপর নীচে আলোক-পাত করিলে উপরার্দ্ধ যে আলোক হইতে দূরে, এবং নিম্নার্দ্ধ যে আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া সমগ্র লতাটিকে একই দিকে বাঁকাইয়া দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

লতার উপরের অংশ অনেক সময় তাপালোকে উন্মুক্ত থাকায়, ছায়াবৃত পৃষ্ঠের তুলনায় তাহার কতকগুলি বিশেষত্ব থাকার সম্ভাবনা ঘটে। কিন্তু সেই বিশেষত্ব যে কি, এবং আলোকের উত্তেজনা কি প্রকারে কাজ করিয়া লতার ডাঁটাকে একবার আলোক হইতে দূরে এবং আর একবার আলোকের দিকে টানিয়া লয়, ডি ভ্রায়েস্ সাহেবের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানে তাহার কোনই

সন্ধান পাওয়া যায় না। সাধারণ লোকে সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝে, তিনি তাহাই বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করিয়া নিষ্কৃতি-লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র।

আলোকপাতে যে কেবল লতার ছায়াবৃত অংশটাই ন্যুব্জপৃষ্ঠ (Concave) হয়, তাহা নয়। আচার্য্য বসু নানা জাতীয় গাছের পত্রমূলের * (Pulvinus) উপর ও নীচে আলোকপাত করিয়া দেখিয়াছেন, এখানেও পাতাগুলির বোঁটা ঠিক লতারই মত নীচের দিকে ন্যুব্জ হইয়া পড়ে। সুতরাং, লতা পাতা উভয়েরই ন্যুব্জতার কারণ যে এক, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আচার্য্য বসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ন্যায় বৃক্ষের প্রত্যেক অঙ্গকেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে না করিয়া, পূর্ব্বোক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে আলোকের সহিত ডাল-পাতার বক্রতার প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়াছিলেন।

উদ্ভিদের দিবানিদ্রা (Diurnal sleep, or Paraheliotropism পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় কতকগুলি গাছের পাতা যেমন বুঁজিয়া আসে, দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রেও ঐ রকম পাতা বোজা দেখা যায়। ইহাকেই উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ উদ্ভিদের দিবানিদ্রা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া আধুনিক উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কোন ফলই পাওয়া যায় না।

* লজ্জাবতী, শিরীষ প্রভৃতি অধিকাংশ সুঁটিওয়ালা গাছের পাতা যেখানে শাখার সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই স্থানে Pulvinus নামক এক বিশেষ অঙ্গ দেখা যায়। ইহার উর্দ্ধ ও নিম্নার্দ্ধ সমান উত্তেজনাশীল নয়। পূর্ব্বোক্ত গাছগুলির পাতার উঠানামা ইত্যাদি ব্যাপার ঐ Pulvinus দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। আমরা পত্রের ঐ বিশেষ অঙ্গটিকে "পত্রমূল" নামে অভিহিত করিতেছি।

স্পষ্টভাষায় বলিতে গেলে, স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ পর্য্যন্ত কেহই এই ব্যাপারের কারণ দেখাইতে পারেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারুইন্ বলিয়াছিলেন,—তীব্র আলোক গাছের পক্ষে অপকারী, তাই তাহারা পাতা গুটাইয়া দ্বিপ্রহরের তীব্র আলোকের অপকারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। ডারুইনের এই ব্যাখ্যান কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা পাঠক বিবেচনা করুন; এবং ঐ উক্তিটি ব্যাখ্যান পদবাচ্য হইতে পারে কি না, তাহাও দেখুন।

এখন আচার্য্য বসু ডাল-পাতার উল্লিখিত নানা প্রকার বাঁকাচোরার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন, দেখা যাউক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, লাউ বা কুমড়া প্রভৃতি লতানে গাছের চারাকে সূর্য্যরশ্মির অন্তরালে রাখিলে, প্রথম দিন কতক সেটি সাধারণ গাছের ন্যায় খাড়া হইয়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু ইহার পর ভারাধিক্য প্রযুক্ত বা বায়ুর আঘাতে গাছটি একবার ধরাশায়ী হইলে, তখন লতারই মত তাহাকে শায়িত অবস্থায় বাড়িতে দেখা যায়। আচার্য্য বসু বলেন, গাছ যখন শুইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রত্যেক ডাঁটার উপরকার অংশটা সূর্য্যালোকে উন্মুক্ত থাকায়, এই অংশের উত্তেজনশীলতা অনেক কমিয়া আসে। কাজেই, উপরার্দ্ধের তুলনায় নিম্নার্দ্ধ সাধারণতঃ অধিক উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে।

মনে করা যাউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকার একটি ডাঁটার উপরার্দ্ধে আলোকপাত করা গেল। এখানে উপরটা অল্প উত্তেজনশীল বলিয়া আলোকের উত্তেজনা তাহার বৃদ্ধির কোনও পরিবর্ত্তন করিল না, এবং প্রকৃত উত্তেজনাটি আড়াআড়ি ভাবে অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধে পৌঁছিয়া সেখানকার বৃদ্ধি রোধ করিয়া দিল। কোন জিনিসের এক অংশ যদি অপর অংশের তুলনায় অধিক প্রসারণশীল হয়, তবে এই অসম

প্রসারণের দ্বারা সেটিকে ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইতে দেখা যায়। ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠ তখন (concave) অল্পপ্রসরণশীল অংশের দিকে থাকে। এখানে ডাঁটাটির অবস্থা এই প্রকারই হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, উহার উপরার্দ্ধের বৃদ্ধি প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখানে কেবল নিম্নার্দ্ধেরই বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে; কাজেই, লতাটির ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই।

এখন মনে করা যাউক, লতার অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধের উপরে যেন নীচে হইতে আলোকপাত করা গেল। বলা বাহুল্য, আলোকের উত্তেজনাপ্রাপ্তি মাত্র ঐ অংশের বৃদ্ধি রোধ প্রাপ্ত হইবে, এবং প্রকৃত উত্তেজনা নীচে হইতে উপর দিকেও আড়াআড়ি ভাবে চলিয়াও অসাড় উপরার্দ্ধকে উত্তেজিত করিতে পারিবেনা; কাজেই, এখানেও নিম্নার্দ্ধের বৃদ্ধি রোধ হওয়ায়, লতাটি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইবে।

কুমড়া লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের শায়িত শাখার উপরে ও নীচে সুকৌশলে আলোকপাত করিয়া শাখার বক্রতার পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান যে অভ্রান্ত, তাহা আচার্য্য বসু নানা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া, ক্ষেত্রজ লতাগাছের ডাঁটা প্রভাত-সূর্য্যের আলোক পাইয়া, পরে আলোকের প্রখরতা অনুসারে কি ভাবে বাঁকিয়া আসে, তাহাও তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন; এবং এই সকল পর্যবেক্ষণের ফল তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছে।

উদ্ভিদের দিবানিদ্রার কারণ প্রসঙ্গে আচার্য্য বসু কি বলেন, দেখা যাউক। এই ব্যাপারটি বুঝিবার পূর্ব্বেই দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক।

১ম। যদি উদ্ভিদের কোন অঙ্গের এক অংশ অপর অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল হয়, এবং উহাদের উত্তেজনা পরিবাহন-শক্তি খুব

প্রখর থাকে, তবে যে কোন অংশে আলোক-পাত করা যাউক না কেন, সেটি ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাইবে ও ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠে অধিক উত্তেজনশীল অংশটা থাকিবে।

২য়। উদ্ভিদ্-দেহের পরিবাহন-শক্তি অল্প হইলে, যে অংশটিতে উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, কেবল সেটিকেই ধনুর ন্যুব্জ পৃষ্ঠে দেখা যাইবে।

আচার্য্য বসু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে সকল উদ্ভিদ দ্বিপ্রহরে পাতা গুটাইয়া নিদ্রিত হয়, তাহারা সকলেই পত্রমূলযুক্ত (Pulvinated) বৃক্ষ। ইহাদের প্রত্যেক পত্রমূলেরই নিম্নার্দ্ধ উপরার্দ্ধ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনশীল। বসু মহাশয় প্রথমে পালিতা মাদার (Erythrina Indica) গাছের ছোট ছোট পাতার নিমীলন লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, ইহার পত্রমূলের উত্তেজনা পরিবাহন-শক্তি তত অধিক নয়। সুতরাং, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোক যখন উহার উপরের অংশে আসিয়া পড়ে, তখন তাহা আড়াআড়ি ভাবে চলিয়া অধিক উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধে পৌঁছিতে পারে না; কাজেই, উপরার্দ্ধই বক্র হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে পাতাগুলি মাথা উঁচু করিয়া জোড় বাঁধিতে আরম্ভ করে। পালিতা মাদার গাছ ছাড়া আরও যে সকল গাছের পাতা উর্দ্ধ মুখে জোড় বাঁধিয়া ঘুমায়, তাহা লইয়াও আচার্য্য বসু পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এই শ্রেণীর গাছ মাত্রেরই পত্রমূলের পরিবাহন-শক্তির মাত্রা অতি অল্প দেখা গিয়াছিল। অপরাজিতা লতা (Elitoria Fernatea) এই শ্রেণীভুক্ত। দিবালোকের উত্তেজনায় ইহার পত্রমূল বাঁকিয়া গিয়া পাতাগুলিকে কি প্রকার উঁচু করিয়া তোলে, পাঠক যে কোন দিন একটি গাছের পাতা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। আকাশের যে স্থানে সূর্য্য অবস্থান করে, অনেক সময় অপরাজিতা পাতাগুলি সেই দিকে মুখ রাখিয়া জোড় বাঁধিবার চেষ্টা করে।

প্রখর সূর্য্যালোকে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া জোড় বাঁধা কেবল কতকগুলি গাছেরই দেখা যায়, ইহা ছাড়া অধিকাংশ পত্রমূলযুক্ত গাছের পাতাই নীচে নামিয়া জোড় বাঁধিবার চেষ্টা করে। এখন এই শেষোক্ত ব্যাপারের কারণ কি, দেখা যাউক। আচার্য্য বসু বলেন, এই সকল গাছের পত্রমূলের পরিবাহন-শক্তি অত্যন্ত অধিক। এজন্য পত্রমূলের উপরে যে সূর্য্যালোক পড়ে, তাহা আড়াআড়ি ভাবে বাহির হইয়া উহার নিম্নার্দ্ধে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু পত্রমূল মাত্রেরই নিম্নার্দ্ধের উত্তেজনশীলতা উপরের তুলনায় অত্যন্ত অধিক ; কাজেই, এস্থলে পাতাগুলিকে সঙ্গে লইয়া পত্রমূলগুলি নীচের দিকেই নামিতে আরম্ভ করে। আলোকরশ্মি কেবল প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া পড়িলেই যে গাছের পাতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নামিয়া পড়ে, তাহা নয়, দূরের আলোক বিক্ষিপ্তভাবে আসিয়া ওই অঙ্গে লাগিলেও পাতা গুটাইতে আরম্ভ করে। কারণ, বিক্ষিপ্ত আলোক পত্রমূলের উপর নীচে সমভাবে পড়িয়া উত্তেজনশীল নিম্নার্দ্ধের উপরেই অধিক কার্য্যকারী হয়, এবং তাহাতে ঐ অংশেরই বৃদ্ধি রোধ করিয়া সেটিকে নিচের দিকে বাঁকাইয়া দেয়। আমরুল (Oxalis), লজ্জাবতী, শিরিষ প্রভৃতি গাছের পাতা খুব রৌদ্রের সময় পরীক্ষা করিলে পাঠক ইহাদের পূর্ব্ববর্ণিত দিবানিদ্রা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। প্রাতে রৌদ্র উঠিবামাত্র এ সকল গাছের পাতা গোটান দেখা যায় না ; কারণ, পত্রমূল পরিবাহন-ক্ষম হইলেও আলোকপাত মাত্র তাহার উত্তেজনা নীচে পৌঁছিতে পারে না। বহুক্ষণ আলোকপাতের পর সেই উত্তেজনা যখন ধীরে ধীরে নীচে গিয়া পৌঁছায়, এবং তখনই গাছের পাতা নীচে নামিয়া জোড় বাঁধিতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্ববর্ণিত তথ্যগুলি ছাড়া উদ্ভিদের স্বাভাবিক নিদ্রা (Nyctitropism) ও আলোকপাতে পাতার নানাপ্রকার আকার-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি

ব্যাপারের অতি সুন্দর ব্যাখ্যান আচার্য্য বসুর প্রসাদে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিষয়ের সদ্ব্যাখ্যান এপর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে পারেন নাই এবং অনেকে এগুলিকে প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য বলিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। আচার্য্য বসু উদ্ভিদ-তত্ত্বের ঐ সকল বৃহৎ সমস্যার কি প্রকার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা পর অধ্যায়ে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

উদ্ভিদের নিদ্রা

অনেক গাছের পাতা সন্ধ্যার সময় বুজিয়া আসে এবং প্রাতঃকালে দেখা যায়, সেগুলি আবার আপনা হইতেই খুলিয়া গিয়াছে। ঝড়-বৃষ্টি, শীত-রৌদ্র কিছুই না মানিয়া ইহারা চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর এক-একবার নিশ্চই বুজিবে। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদগণ এই ব্যাপারটিকে উদ্ভিদের নিদ্রা (**Nyctitropic movement**) বলিয়াছেন।

উদ্ভিদ্ জীবনের এই সুপরিচিত বিষয়টির বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলে, আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন,—আলোকপাত করিলে আমরা পাতার যে সকল নড়াচড়া দেখিতে পাই, এটা সে রকমের ব্যাপার নয়। যেদিক হইতে আলোক ফেলা যায়, সাধারণতঃ সেই দিক অনুসারে পাতার নড়-চড় হয়। কিন্তু উদ্ভিদের নিদ্রার জন্য পাতার যে সঞ্চলন, তাহা আলোকপাতের দিকের (Direction) উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ, আজ সন্ধ্যার সময় যে পাতাটিকে নীচে নামিয়া বা উপরে উঠিয়া বুজিতে দেখিলে, আলোক যে দিক হইতে পড়ুক না কেন, প্রতিদিনই তাহাকে অন্যকার মতই বুজিতে দেখিবে। সুতরাং, পাতার সাধারণ সঞ্চলন হইতে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পৃথক্।

উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্গণ উভয়ের মধ্যে এই প্রকার এক স্বাতন্ত্র্য আনিয়া, নিদ্রাকে উদ্ভিদ্ দেহের এক বিশেষ কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বহু প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের নানা ভ্রম দেখাইয়াছেন।

যে সকল পাঠক আচার্য্য বসুর আবিষ্কার-সম্বন্ধীয় পূর্ব্বের অধ্যায়গুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, গাছের ডাল-পালার আঁকা-বাঁকার তিনি একটি মাত্র কারণ দেখাইয়াছেন। গাছের ডগা বা পাতার মূলের (Pulviuus) উপর ও নীচের পিঠ যখন বিভিন্ন-মাত্রায় উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে, তখনই কেবল আলোক বা তাপ ইত্যাদির উত্তেজনায় আমরা ডালপালার নড়াচড়া দেখি। কারণ, এ অবস্থায় অধিক উত্তেজনশীল পিঠ কোন প্রকার উত্তেজনা পাইলেই অপর পৃষ্ঠের তুলনায় অধিক সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কাজেই, তখন ডাল বা পাতাগুলি না বাঁকিয়া থাকিতে পারে না। আচার্য্য বসু এই ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়াই গাছের নানা অংশের নানাপ্রকার সঞ্চলনের ব্যাখ্যান দিয়াছেন, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া গাছের নিদ্রারও ব্যাখ্যান দিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলোকপাতে গাছের পাতার নড়াচড়া এবং নিদ্রাকালে সেগুলির বুজিয়া যাওয়াকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আচার্য্য বসু ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি সত্যই নিদ্রা ব্যাপারটা উদ্ভিদ্-দেহের এক বিশেষ কার্য্য হইত, এবং আলোকের প্রাখর্য্যের পরিবর্ত্তনই যদি তাহার কারণ হইত, তবে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবামাত্র আমরা খোলাপাতাগুলিকে চোখের সামনে সদ্য সদ্য বুজিতে দেখিতাম। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃক্ষপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আচার্য্য বসু দেখিয়াছেন, যতই বেলা বাড়িতে আরম্ভ করে, পাতাগুলিও ততই একটু করিয়া বুজিয়া আসে; এবং শেষে সন্ধ্যার সময় তাহারা একেবারে বুজিয়া যায়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া

বোজার কাজটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদেই চলে, এবং দিনের শেষে সেই কাজটা চরমে পৌঁছিয়া যখন পাতাগুলিকে একেবারে মুদিত করিল, তখন তাহা আমাদের নজরে পড়ে। ইহা হইতেই স্পষ্টই বুঝা যায়, আলোকের প্রাখর্য্যের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সহিত বৈজ্ঞানিকগণ পাতার নিমীলনের যে সম্বন্ধ অনুমান করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা সত্যই ভুল।

প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, সূর্য্যাস্তকাল হইতে পরদিনের উদয়কাল পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ সময় চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, সে সময় পাতাগুলিও জোট বাঁধিয়া সুষুপ্ত থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় না। রাত্রি যতই অগ্রসর হইতে থাকে, পাতাগুলিও ততই খুলিতে আরম্ভ করে. এবং শেষে প্রভাত হইলে তাহারা সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ উন্মীলনের জন্য অনেক গাছের পাতা প্রভাত পর্য্যন্তও অপেক্ষা করে না। দু'একটি গাছের পাতাকে মধ্য রাত্রিতেই বিকশিত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং, রাত্রির অন্ধকারকে কখনই উদ্ভিদের নিদ্রা অর্থাৎ পাতা-বোজার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আচার্য্য বসু এই প্রকারে পদে পদে প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইয়াছেন, এবং এখানে অন্ধকারকেই পাতার উন্মীলনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে "স্বতঃসঞ্চলন" ও "পৌনঃপুনিক সাড়া" (Autonomous Movements and Multiple Response) প্রভৃতি ব্যাপারে বন-চাড়াল (Desmodium Gyran) ইত্যাদি কতকগুলি গাছের পাতা কি প্রকারে আপনা হইতেই উঠা নামা করে, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি এবং ঐ প্রসঙ্গে পাতার উঠা নামার কারণও দেখানো

গিয়াছে। আচার্য্য বসু উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণকে ঐ "স্বতঃ-সঞ্চালনেরই" একটা উদাহরণ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বনচাঁড়ালের পাতা যেমন খুব ঘন ঘন উঠা-নামা করে, অপর বৃক্ষের পাতাগুলি সে প্রকার না করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর উঠিয়া নামিয়া জাগরণ ও নিদ্রার ভাণ করে। বাহিরের উষ্ণতাদির মাত্রা অনুসারে বন-চাড়াল গাছের পাতার উঠা নামা ইত্যাদি নানা পরিবর্ত্তন সুরু হয়, কিন্তু ঐ সকল কারণে উদ্ভিদের নিদ্রাকালের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। ঝড়, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি নানা উপদ্রবের ভিতরেও গাছের পাতা অতি ধীরে নামিতে নামিতে সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ নামিয়া ও জোড় বাঁধিয়া সুষুপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, আলোকের উত্তেজনা দ্বারাই যদি উদ্ভিদের নিদ্রা উৎপন্ন হয়, তবে মেঘাচ্ছন্ন দিনে অর্থাৎ যখন আলোকের উত্তেজনা থাকে না, তখনও পাতাগুলি কেন যথাসময়ে বুজিয়া আসে? আচার্য্য বসু এই প্রশ্নটির অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আলোকের উত্তেজনায় গাছের পাতা চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর কি প্রকারে উঠা-নামা করে তাহা জানা আবশ্যক। লাউ বা কুমড়া গাছের লতানো ডগার উপরের পিঠ ক্রমাগত রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদিতে উন্মুক্ত থাকে বলিয়া নীচের পৃষ্ঠের তুলনায় এদিকটা অল্প উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে। এ লাউ-ডগা লইয়া আলোচনা সুরু করা যাউক।

মনে করা যাউক, ঐ লতাটির উপর যেন সোজাসুজি ভাবে সূর্য্যের আলোক আসিয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য, সূর্য্যের আলোকে উত্তেজিত করিবার ক্ষমতা আছে। কাজেই, বহুক্ষণ ধরিয়া উপরে

পিঠে সূর্য্যের আলোক পড়িতে থাকিলে, আলোকের উত্তেজনাটা ডগার ভিতর দিয়া নীচের পিঠে পৌছিবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুম্‌ড়ার ডগার উপরের পিঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক উত্তেজনশীল। এজন্য প্রত্যক্ষ সূর্য্যালোক পাইয়া উপরকার পিঠ যতটা উত্তেজিত হয়, নীচেকার পিঠ পরিবাহিক উত্তেজনায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। বৃক্ষের কোন অঙ্গ উত্তেজিত হইলে, উহার সঙ্কোচ দ্বারা উত্তেজনার অস্তিত্ব বুঝা যায়। কাজেই সূর্য্যালোকে যখন ডগার উপরের পিঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তখন নীচের পিঠের সঙ্কোচের মাত্রাও উপরের তুলনায় খুব বাড়িয়া যায়।

কোন লম্বা জিনিসের নীচেকার পিঠ উপরের পিঠ অপেক্ষা সঙ্কুচিত হইলে, তাহার আকারটা যে কি প্রকার হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এ অবস্থায় তাহার ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। আমাদের উদাহৃত কুম্‌ড়ার ডগাতেও অবিকল তাহাই দেখা যায়, যত বেলা অধিক হইতে আরম্ভ করে, ডগাটিও ততই ধনুকাকারে বাঁকিয়া মাটিতে মাথা গুঁজিতে আরম্ভ করে।

বৃক্ষপত্রের নামিয়া পড়া ব্যাপারটাও ঐ প্রকারে হইয়া থাকে। যে সকল গাছের পাতা সন্ধ্যাকালে বুজিয়া আসে, তাহাদের প্রত্যেক ক্ষুদ্র পাতার মূলের উপরকার ও নীচেকার পিঠ উদাহৃত লাউ গাছের ডগার ন্যায় অসম উত্তেজনশীল থাকে। এজন্য যখন সূর্য্যালোক পত্রমূলের উপরকার পিঠে পড়ে, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না; কিন্তু সেই আলোকের উত্তেজনাই যখন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নীচের পিঠে পৌঁছায়, তখন তাহাতেই নীচের পিঠ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন জিনিষের

কেবল এক পিঠ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে, সেটির ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা। এখানেও অবিকল তাহাই হয়। পত্রমূল ধনুকাকারে বাঁকিয়া পাতা-সমেত নীচে নামিয়া পড়ে।

আমরা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বেলা-বৃদ্ধির সহিত পাতার নিমীলনও বৃদ্ধি পায়। আচার্য্য বসু ইহারও প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—আলোক প্রথমে পত্রমূলের উপরকার পিঠেই পড়ে, কিন্তু এ পিঠটা তত উত্তেজনাশীল নয়, কাজেই, আলোক পড়িবামাত্র উত্তেজনার কার্য্য দেখা যায় না। কালক্রমে আলোকের উত্তেজনা উপর হইতে নীচের পিঠে পরিবাহিত হইয়া আসিলে পর তাহারি সঙ্কোচ দ্বারা উত্তেজনার কার্য্য প্রকাশ পায়। আলোক পড়িবামাত্র পরিবাহিত হইয়া নীচে আসে না। বৃক্ষবিশেষে এবং বৃক্ষের অঙ্গের অবস্থাবিশেষে পরিবাহন কালের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। সুতরাং, আমরা যে গাছের পাতাগুলিকে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতে দেখিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আচার্য্য বসুর পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে বেশ বুঝা যায়, সন্ধ্যায় আলোকের তেজ কমিয়া আসায় বৃক্ষপত্র সুষুপ্ত হয় না। সমস্ত দিনের আলোকের উত্তেজনা পত্রমূলের (Pulvinus) উপর পিঠ হইতে নীচের পিঠে আসিয়া সন্ধ্যাকালেই ঐ পিঠের সঙ্কোচের মাত্রা খুব বাড়াইয়া তুলে বলিয়া আমরা ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাতাগুলিকে সুপ্ত হইতে দেখি। রাত্রিতে আর আলোকের উত্তেজনা থাকে না। সঙ্কুচিত পত্রমূলের বিকৃত অণুসকল প্রকৃতিস্থ হইবার বেশ সুযোগ পাইয়া যায়। আণবিক বিকার কাটিয়া গেলেই পত্রমূলও সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পায়। এজন্য সূর্য্যালোক-বিরহিত রাত্রিই বৃক্ষপত্রের জাগরণ আনিয়া দেয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রভাত-সূর্য্যের আলোকই বৃক্ষের পাতা খুলিয়া দেয় বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা ভুল। পরীক্ষা করিলে কতক গাছের পাতাকে মধ্যরাত্রেই উন্মীলিত হইতে দেখা যায়, আবার কতকগুলিকে রাত্রিশেষে বা প্রভাতেও খুলিতে দেখা গিয়া থাকে। আচার্য্য বসু এই উন্মীলনকাল লইয়াও গবেষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে জানা গিয়াছে, সমস্ত দিন ব্যাপিয়া আলোকের যে উত্তেজনাটা বৃক্ষদেহে পতিত হয়, তাহার সকল পাতাগুলিকে নামাইতে ব্যয়িত হয় না। উহার কতক অংশ উদ্ভিদ্-দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং ইহাই শেষে নীচু ও বিকৃত পাতা-গুলিকে শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ করিয়া উঁচু করাইবার জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং, বাহিরের আলোকের উত্তেজনাকে অন্তর্নিহিত করিবার শক্তি যে-সকল গাছের প্রবল, তাহারাই যে সেই সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে নিম্নমুখী পাতাগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র সোজা করিয়া তুলিবে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। শক্তি সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা সকল গাছের সমান নয়; কাজেই, সুষুপ্তির কালও সকল গাছে সমান দেখা যায় না। যে গাছ যত অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে, আলোকের উত্তেজনাকে সে তত শীঘ্র পরাভব করিয়া জাগরিত হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলে পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, আচার্য্য বসু লজ্জাবতীর পাতার উঠা-নামা, বনচাঁড়াল গাছের পাতার নৃত্য, উদ্ভিদের নিদ্রা প্রভৃতিকে যে একই ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার পত্রমূলের উত্তেজনায় পাতাগুলি যেমন বুজিয়া যায়, এবং উত্তেজনার ধাকা সামলাইয়া লইলে সেগুলি যেমন

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, উদ্ভিদের নিদ্রা-ব্যাপারটাও অবিকল তাই। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, লজ্জাবতী, বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছের পাতার উঠা-নামা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়, কিন্তু নিদ্রাজাগরণ ব্যাপার শেষ হইতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মেঘাচ্ছন্ন দিনে যখন আলোকের উত্তেজনার লেশমাত্র নাই, তখন গাছের পাতা ঠিক সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ মুদিত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ সম্বন্ধে আচার্য্য বসু কি বলিয়াছেন, এখন আলোচনা করা যাউক। আচার্য্য বসু সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে লজ্জাবতী লতা আবদ্ধ রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঘরে অণুমাত্র আলোকের অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি লতাটি যেন অভ্যাসের বশে ঠিক সন্ধ্যার সময় পাতা গুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এবং তার পর যথাসময়ে পাতা খুলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য্য বসু সত্যই অভ্যাসের বশে ঐ ব্যাপারটি সংঘটিত হয় বলিয়া ব্যাখ্যান দিয়াছেন। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা।

মনে করা যাউক, একখণ্ড তারের দুই প্রান্ত খুব দৃঢ়ভাবে ধরিয়া তাহাকে বামে ও দক্ষিণে কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘন ঘন মোচড় দেওয়া যাইতেছে। প্রথমকার দু'চার মোচড়ে একটু বলপ্রয়োগের আবশ্যক হইবে। কারণ, প্রথম অবস্থাতেই তারের অসাড় অণুগুলি এ প্রকার মোচড়ে অভ্যস্ত হইতে পারে না; কাজেই, ঐ নাড়া-চাড়া সড়গড় করিয়া লইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। অণুগুলি বেশ সচল হইয়া দাঁড়াইলে, যদি মোচড় দেওয়া বন্ধ করিয়া তারটিকে

ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে সেটি তখনও আপনা আপনিই বামে দক্ষিণে মোচড় খাইতেছে।

এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, বলপ্রয়োগে তার করিয়া অণুগুলিতে আন্দোলন সুরু করিলে তাহার কিয়দংশ সমবেত অণুতে মুদ্রিত হইয়া গুপ্তাবস্থায় থাকে ; এবং তার পর বলের প্রয়োগ রহিত করিবা মাত্র, সেই গুপ্ত শক্তিই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া অণুগুলিকে অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় নাড়া দিতে আরম্ভ করে।

আলোকের উত্তেজনা সম্পূর্ণ রহিত হইলেও যে গাছের পাতার নিদ্রা ও জাগরণ দেখা যায়, জড়ের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মটি অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বসু তাহার ব্যাখান দিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন গাছের পাতাগুলি প্রায় প্রতিদিনই উঠা-নামা করিয়া পত্রমূলের অণুগুলিব অবস্থা ঠিক্ উদাহৃত তারের অণুর মত করিয়া তুলে। কাজেই, মেঘাচ্ছন্ন দিনে বা অন্ধকার ঘরে যখন, আলোকের উত্তেজনা মোটেই থাকে না, তখনও পূর্ব্বের সেই অভ্যাসবশতঃ অণুগুলি আন্দোলিত হইয়া গাছের পাতাগুলিকে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় উঠাইতে ও নামাইতে আরম্ভ করে।

আচার্য বসুর একখানি পুস্তক

বঙ্গভাষায় ভাল পুস্তক নাই, একথা এখন আর বলা চলে না। বাংলা গ্রন্থের তালিকা খুঁজিলে ধর্ম্মতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ও দর্শনের উৎকৃষ্ট পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য, উপন্যাসের ত কথাই নাই। আজকালকার ইংরাজি সাহিত্যের যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, ইংরাজি মাসিক পত্রাদিতে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি নামে যে সকল ছাইভস্ম প্রকাশিত হয়, তাহার তুলনায় আমাদের মাসিকপত্রগুলিতে প্রকাশিত কবিতা ও উপন্যাস অনেক ভাল। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অনেক উপন্যাস ও কবিতা সত্যই সাহিত্যের অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এগুলি যে কোন দেশে এবং যে-কোন ভাষায় প্রকাশিত হইলে, লেখকদিগকে অমরত্ব প্রদান করিত। বিজ্ঞান সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ। বাংলা সাহিত্যের এই অঙ্গটি যে বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে এ কথা বলা যায় না। সমগ্র বাংলা গ্রন্থ খুঁজিলে এক আধ খানি ছাড়া ভাল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। লোকে বলে, বর্ত্তমান যুগটা বৈজ্ঞানিক যুগ। কবি, দার্শনিক, রাজনীতিক সকলেই বিজ্ঞানের স্রোতে তাঁহাদের চিন্তার তরণী ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই স্রোতের জোরেই তাঁহারা কূলে উপস্থিত হইবেন। কথাটা সত্য, কিন্তু বাংলা দেশে নয়, ভারতেরও নয়, যে হাওয়া অপর দেশের চিন্তাস্রোতকে ফিরাইয়া সোজা পথ দেখাইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে বহে নাই। বহিলে আমাদের সাহিত্য অঙ্গহীন হইয়া থাকিত না, সুবাতাসের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িত। বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লেখকের মৌলিকতা বা চিন্তাশীলতার কোনই পরিচয় পাওয়া

যায় না। অধিকাংশই বিদেশী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। অনুবাদের আবশ্যকতা আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু মৌলিকতার আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। সে জন্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ কোন স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলে আশার সঞ্চার হয়। তখন মনে হয়, আমাদের দেশেও বুঝি সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাস্রোত সংযত হইয়া আমাদিগকে কূলে ভিড়াইতে আর বিলম্ব করিবে না। ভারতের সুসন্তান জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র বসু যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেই এই আশার সঞ্চার হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইলেও পুস্তকগুলি ভারতেরই জিনিস: বাঙ্গালীর নিজস্ব। তাই ইহার একখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। এই পুস্তকখানির নাম (Comparative Electro–Physiology।

গ্রন্থকার আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরিচয় নূতন করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল স্বদেশে নয়, দূর বিদেশেও শিক্ষিতসাধারণ আচার্য্য বসুর সহিত পরিচিত। তাঁহার প্রথম পুস্তক খানি (Response-of the Living and the Non-livin) প্রকাশিত হইলে, নানা দেশের বৈজ্ঞানিক-সমাজে যে প্রবল আন্দোলন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় যে সকল পরিবর্ত্তন কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়া স্থির ছিল, সেই সকল উত্তেজনা ধাতু প্রভৃতি নির্জীব পদার্থে প্রয়োগ করিয়াও আচার্য্য বসু অবিকল একই প্রকারের পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। জড় হইতে জীবকে পৃথক করিবার প্রাচীন প্রথার মূলে অবৈজ্ঞানিক দেশের একজন হিন্দু বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক কুঠারাঘাত হইতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য বসু স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন;—

আমরা যাহাকে প্রাণীর বেদনা, অবসাদ ও মৃত্যু বলি, তাহার সকলই প্রাণিশরীরস্থ অণুরাশির বিকৃতির ফল। প্রাণীর ন্যায় ধাতু প্রভৃতি জড়পদার্থ অণুদ্বারা গঠিত; সুতরাং মাদকদ্রব্য ও বিষাদি প্রয়োগ করিলে এগুলিতেও মত্ততা, অবসাদ ও মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ারই সম্ভাবনা। আচার্য্য বসু এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা হইতেই জড় ও প্রাণীর সাড়ার একতা স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল।

প্রাণিশরীরে আঘাত-উত্তেজনা দিলে সাধারণতঃ তাহাতে দুই প্রকারের সাড়া প্রকাশ পায়। প্রথম,—বৈদ্যুতিক সাড়া, অর্থাৎ শরীরের আহত অংশ হইতে অনাহতের দিকে, এবং কখন কখন ইহার বিপরীত যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিয়া আঘাতের কার্য্য পরীক্ষা। দ্বিতীয়,—প্রত্যক্ষ-সাড়া, অর্থাৎ দেহের আহত অংশের প্রত্যক্ষ আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা আঘাতের কার্য্য বুঝিয়া লওয়া। আচার্য্য বসু প্রথমে বৈদ্যুতিক সাড়া দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রাণী ও জড়ের আঘাত-অনুভূতির একতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিকগণ দৃশ্য পদার্থকে সাধারণতঃ নির্জীব, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী—এই তিনটি প্রধান-ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। উদ্ভিদ্-জাতি প্রাণীর ন্যায় সচেতন নয়, এবং মৃত্তিকা বা প্রস্তর প্রভৃতি নির্জীব পদার্থের ন্যায় অচেতনও নয়। উদ্ভিদ্ যেন চেতন ও অচেতন রাজ্যের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। অচেতন জড়ে চেতনধর্ম্ম যেন ইহাদেরই ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নির্জীব ও প্রাণীর সাড়ার একতা দেখিয়া আচার্য্য বসু উদ্ভিদ্ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছিল। গাছের পাতা, ডাল, মূল, কাণ্ডাদিতে আঘাত দেওয়ায় তাহারা প্রাণীরই মত সাড়া দিয়াছিল। লজ্জাবতী প্রভৃতি

উদ্ভিদ্ বাহিরের আঘাতে সাড়া দেয়। আঘাত দিয়া আচার্য্য বসু উদ্ভিদ্‌মাত্রেই লজ্জাবতীর মত সাড়া দেখিয়াছিলেন। উত্তেজক পদার্থ ও বিষাদি প্রয়োগে প্রাণীর অবস্থা যে প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, উদ্ভিদ্‌কেও অবিকল সেই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

১৯০১ সালের জুন মাসে ইংলণ্ডের রয়াল্ সোসাইটির কোন অধিবেশনে আচার্য্য বসু মহাশয় অজৈব পদার্থ, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাড়া পূর্ব্বোক্ত একতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভাস্থ বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার কথাটা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ স্যাণ্ডারসন্ (Sir I. B. Sanderson) সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া কেবল লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদেই দেখা যায়, অপর বৃক্ষাদির সাড়া দেওয়া অসম্ভব। আচার্য্য বসু ইহার পর শত শত পরীক্ষায় উদ্ভিদ্‌মাত্রেরই সাড়ার অস্তিত্ব যখন প্রত্যক্ষ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই শুনা যায় নাই।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাড়ার একতা বৈদ্যুতিক প্রথায় প্রতিপন্ন করিয়াই আচার্য্য বসু ক্ষান্ত হন নাই; বাহিরের আঘাতে ইহারা শরীরের আকুঞ্চন-প্রসারণাদি দ্বারা যে প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, তাহার মধ্যেও একতা দেখাইবার জন্য তিনি গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গবেষণার ফল তাঁহার "উদ্ভিদের সাড়া" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌মাত্রেই যে লজ্জাবতী লতার ন্যায় সাড়া দেয়, এ গ্রন্থে তাহার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ্‌সম্বন্ধীয় অনেক স্থূল স্থূল ব্যাপারের কারণ এ পর্য্যন্ত অনির্ণীত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আধুনিক উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে যে সকল

ব্যাখ্যান দিতেন, তাহাতে কেহই প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। এমন কি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও রসশোষণ এবং লতার সঞ্চলন প্রভৃতি মোটা মোটা ব্যাপারের কারণজিজ্ঞাসু হইয়া পণ্ডিতদিগের শরণাপন্ন হইলে যে সকল ব্যাখ্যান পাওয়া যাইত, তাহাতেও সন্তোষ লাভ করা যাইত না। আচার্য্য বসুর গবেষণায় সেই সকল অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে।

তাপ, আলোক প্রভৃতি উত্তেজনা উদ্ভিদের উপর কি প্রকার কার্য্য করে, তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকেরই মনে ছিল না। কয়েকটি অমূলক বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া, এবং নানাপ্রকার বিসম্বাদী যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়া ইঁহারা উদ্ভিদ তত্ত্বকে কোনক্রমে খাড়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। গোড়ার খবর জানিতে চাহিলে, ইহারা বলিতেন, কামানের ভিতরকার গুলি ও বারুদ যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে পুড়িয়া বৃহৎ শক্তির প্রকাশ করে, বাহিরের উত্তেজনাও ঠিক সেই প্রকারে উদ্ভিদেরই অন্তর্নিহিত শক্তির খেলা দেখায়। কিন্তু এই অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, উদ্ভিদ্-বিদ্‌গণকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা যাইত। আচার্য্য বসু আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের এই গোড়ার গলদ ধরিয়া, বাহিরের উত্তেজনাকেই সকল কার্য্যের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আচার্য্য বসুর "উদ্ভিদের সাড়া" নামক গ্রন্থখানি সত্যই উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে।

Comparative Electro-Physiology কে পূর্ব্বপ্রকাশিত "উদ্ভিদের সাড়া" নামক পুস্তকখানির অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ সাড়া (Mechanical Response) পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থকার পূর্ব্বে উদ্ভিদের যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বৈদ্যুতিক

সাড়া দ্বারা তাহারই অনেক ছোট বড় ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া তিনি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ব্যাপারটা উদ্ভিদ্ হইতে ক্রমে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া কি প্রকারে জটিল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রাণীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহারও একটা সুন্দর ধারা এই পুস্তকপাঠে অবগত হওয়া যায়।

আচার্য্য বসু বলিয়াছেন, বলপ্রয়োগ করিলে পদার্থের অণুগুলির যে বিকৃতি হয়, তাহাই সাড়ার একমাত্র কারণ। কাজেই, আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব নয়, ইহা অণুময় পদার্থ মাত্রেরই নিজস্ব। উদ্ভিদের শারীরযন্ত্র মৃৎ-পিণ্ড অপেক্ষা জটিল হইয়া নানা কারণে সাড়া দিবার উপযোগী হইয়াছে। তাই আমরা মৃৎ-পিণ্ড অপেক্ষা উদ্ভিদ্‌কে সসাড় দেখি। আবার প্রাণীর শারীরযন্ত্র উদ্ভিদ্ অপেক্ষাও জটিল। এই জন্য ইহার সাড়া দিবার শক্তি উদ্ভিদের তুলনায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে। কাজেই, আমরা প্রাণীকে সচেতন ও উদ্ভিদ্‌কে অচেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি।

জড়তত্ত্ব ও জীবরহস্যের এই গোড়ার খবরগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় আধুনিক বিজ্ঞান যে, কতদূর লাভবান হইয়াছে; তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জড়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর কার্য্যের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা খুঁজিয়া না পাইয়া জীবতত্ত্ব-বিদ্‌গণ এপর্য্যন্ত ইহাদের প্রত্যেক কার্য্য-কেই এক একটা পৃথক্ ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতে-ছিলেন। এমন কি, একই উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের কার্য্য-গুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা না পাইয়া, সেগুলিকে সেই সেই অঙ্গেরই বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া ইঁহারা মানিয়া চলিতেছিলেন। বলা বাহুল্য,

এই সকল ব্যাখ্যানে পুথির অবয়ব অনাবশ্যকরূপে বাড়িয়া আসিয়াছে মাত্র, শিক্ষার্থীগণ ব্যাখ্যানের কোন মর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আচার্য্য বসুর নূতন আবিষ্কারগুলি দ্বারা সমগ্র জীবতত্ত্বে আজ এক নূতন আলোক পতিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের বিচিত্র কার্য্যের সকল রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ে আট শত পৃষ্ঠাব্যাপী নব তথ্যপূর্ণ মহাগ্রন্থের একটা স্থূল পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব। আমরা এখানে আচার্য্য বসুর আবিষ্কৃত আরও দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব।

পাঠক অবশ্য অবগত আছেন, জীবতত্ত্ব-বিদ্‌গণ এ পর্য্যন্ত প্রাণি-শরীরের পেশী (Muscles) নামক অংশকে স্নায়ু বা তৈজসনাড়ী (Nerve) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণবিশিষ্ট বলিয়া মানিয়া আসিতে-ছিলেন। অর্থাৎ পেশী জিনিসটা চলধর্ম্মী (Mobile) এবং স্নায়ু সম্পূর্ণ অচলধর্ম্মী (Non-mobile)। আচার্য্য বসু কিন্তু উভয়কেই একই গুণসম্পন্ন দেখিয়াছেন। অপর বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে অচলধর্ম্মী বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই আচার্য্য বসুর সূক্ষ্ম পরীক্ষায় চলধর্ম্মী হইযা দেখা দিয়াছে। বাহিরের আঘাত-উত্তেজনা পরিবহন করিবার শক্তি কেবল প্রাণিদেহেরই বিশেষত্ব বলিয়া স্থির ছিল। আচার্য্য বসু উদ্ভিদ্-দেহেও এই বেদনা-পরিবহন দেখাইয়াছেন, এবং ইহাদের দেহ যে প্রাণীর মতই স্নায়ুজালে আচ্ছন্ন, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিপাক-ক্রিয়া, পাকরসের নির্গম এবং ভুক্ত দ্রব্য দেহস্থ করা ইত্যাদি ব্যাপার যে প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে ঠিক একই প্রকারে সম্পন্ন হয়, তাহাও আচার্য্য বসু প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর নানা কার্য্যের মধ্যে এই একতা আবিষ্কৃত হওয়ায়, শারীর-তত্ত্বের যে সকল ব্যাপার প্রাণীর শারীর-যন্ত্রের জটিলতার

ভিতর দিয়া অতি অস্পষ্টভাবে আমাদের চোখে পড়িত, উদ্ভিদের সরল শারীর-যন্ত্রে অতি সহজে তাহাদেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে জীবতত্ত্বের অনেক কঠিন সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইহা কম লাভের কথা নয়।

পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুইএর মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই মনে মনে বুঝেন। নানা কারণে সেই নিগূঢ় সম্বন্ধ আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। নূতন আবিষ্কারগুলি দ্বারা আচার্য্য বসু মন ও জড়-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সেই রহস্য-কুহেলিকাবৃত সীমান্ত প্রদেশেরও সংবাদ আনিবার উপক্রম করিয়াছেন। সুখ, দুঃখ, মেধা, স্মৃতি প্রভৃতির উৎপত্তি-তত্ত্বের অভ্যাস এই আবিষ্কারগুলিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। যে মহাশক্তির কণামাত্র পাইয়া বায়ু সঞ্চালিত হয়, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করে, মনোরাজ্যের বিচিত্র কার্য্য যে তাঁহারই অনন্তলীলার একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ, আচার্য্য বসুর আবিষ্কারে আমরা আজ তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি। যে মূলভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃতি দেবী অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখাইতেছেন, সেই ভিত্তির সন্ধানই বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। আচার্য্য বসু সেই লক্ষ্যকে সাফল্যের দিকে অগ্রসর করিয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ড

জড় ও জীব

সজীব ও নির্জীব

জড় ও জীবের মধ্যে যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য এপর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহা অস্বীকার করায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশবিদেশে যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কথা পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, আলোক উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া একা জীবেরই বিশেষত্ব নয়। যে উত্তেজনায় জীব সাড়া দেয়, তাহাতে নির্জীব ধাতু প্রভৃতি পদার্থ অবিকল সেই প্রকারেই সাড়া দিয়া থাকে। বিষ ও মাদক দ্রব্যের প্রয়োগে এবং পুনঃপুনঃ আঘাত-তাড়নাদি দ্বারা প্রাণিগণ যে প্রকারে মৃত্যু, মত্ততা ও অবসাদাদির লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। নির্জীব ধাতুপিণ্ডে বিষাদি প্রয়োগ করিয়া আচার্য্য বসু প্রাণীর মৃত্যু প্রভৃতির ন্যায় সকল লক্ষণই দেখাইয়াছেন।

ধাতুপিণ্ড যে প্রাণীর মত সচেতন, তাহা আচার্য্য বসু প্রচার করেন নাই। দেহে আঘাত লাগিলে আমরা যে প্রকার বেদনা অনুভব করি জড় ধাতুপিণ্ড যে তাহাই করে, ইহাও জানা যায় নাই ; সজীব পদার্থ আঘাত পাইলে, যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করে, ধাতুপদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ইহাই পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

সজীব মাংসপেশীতে যদি চিমটি কাটা যায়, বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া উঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ

যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থান-পতন, রেখায় আঁকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গ-রেখা করাতের দাঁতের মত হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে শেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতিস্থ হইতেও বিলম্ব ঘটে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড়া সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষে ভিন্নরূপ।

দ্রব্যগুণে মাংসপেশীর সাড়া বাড়ে কমে। উত্তেজক পদার্থে সাড়া প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আসে। অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিষে এই সাড়া-শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন দ্রব্য মাত্রাবিশেষে উত্তেজনা বা অবসাদ আনায়ন করে।

সজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি সজীব স্নায়ুকে লইয়া পরীক্ষা করা যায়; তবে তাহাতেও এইরূপ পরে পরে সাড়া ও প্রকৃতিলাভ দেখা যায়; কিন্তু স্নায়ুতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্য প্রকার। ঘা লাগিলে স্নায়ুর আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে সুস্থ অংশ পর্য্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃপুনঃ আঘাত, শীতাতপের মাত্রাধিক্য এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্যদ্বারা স্নায়ুতে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াশক্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্র-বিশেষের দ্বারা তাহার রেখাচিত্র লওয়া হইয়াছে। মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। আচার্য্য বসু এইরূপ বিবিধ চিত্র

সংগ্রহ করিয়াছেন। দেহবিদ্গণ বলেন, দেহপদার্থের মধ্যে এই সাড়াই জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ, মৃতপদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। আচার্য্য বসু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎমাপক সূচীর বিচলন দ্বারা এই সাড়ার পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া আচার্য্য বসু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত সাড়া ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্নায়ু-মাংসপেশীর তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, তাহা দন্তুর; সেই তাড়না আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখা নিরন্তর স্ফীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়াশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বিকাশ পায়। ধাতুতারের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ার প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে। কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং মাত্রান্তরে অবসাদক। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময়মত ঔষধ দিতে পারিলে বিষ ক্রিয়ার প্রতিকার করা যায়।

এইরূপ নানা আঘাত উত্তেজনায় ধাতুদ্রব্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় তাহার তরঙ্গ-চিত্র জৈবতরঙ্গের এতই সদৃশ যে, দেহবিদগণ উভয় চিত্রকে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

এই গেল আঘাতজনিত সাড়া। আলোকজনিত সাড়া-সম্বন্ধেও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিয়া সমফল পাইয়াছেন। তিনি একটি

কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যে সকল রশ্মিসম্বন্ধে আমাদের চক্ষু অসাড়, তাঁহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া থাকে। আলো লাগিলে প্রাণীর চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে উত্তেজনা প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ।

জড় ও জীবের আঘাত-অনুভূতি

জড় ও জীব বাহিরের আঘাত-উত্তেজনায় যে একই প্রকারে সাড়া দেয় তাহা বুঝিতে হইলে আচার্য্য বসু যে এক সাড়া-লিপির পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, প্রথমে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক।

প্রতিদিনে বা প্রতিবৎসরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সে গুলিকে আমরা নানা পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিতে পারি। মনে করা যাউক, যেন বৈশাখ মাসে কলিকাতার বাজারে চালের দর দিন দিন কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি। পাকা মুহুরি লিখিবেন,—

১লা	বৈশাখ	প্রতি মণ	২৷৷০
২রা	,,	,,	২৸০
৩রা	,,	,,	৩।০
৪ঠা	,,	,,	৩৲
৫ই	,,	,,	৩৲
৬ই	,,	,,	৪৲
৭ই	,,	,,	৫৲
৮ই	,,	,,	৪৷৷০

কিন্তু দোকানদারটি যদি বিজ্ঞানের একটু ধার ধারেন, তবে তিনি ঐ প্রকার একটা সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুতে অযথা মসীপত্রের অপব্যবহার না করিয়া একটা আঁকা-বাঁকা রেখা টানিয়া ঐ আট দিনের বাজার-দর প্রকাশ করিবেন। তখন রেখাটার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, উক্ত আট দিনের বাজার-দর কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

২৫শ চিত্রের শায়িত রেখা "ক খ" এর গায়ে যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি বিন্দু রহিয়াছে, সেগুলি তারিখ জ্ঞাপন করিতেছে। দণ্ডায়মান রেখা
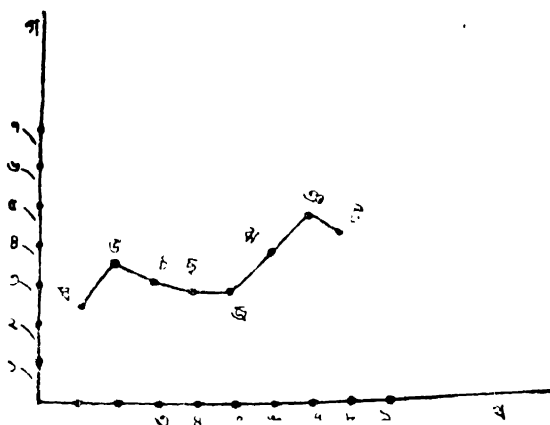
২৫শ চিত্র

"ক গ" এর গায়ের অঙ্কগুলি টাকার জ্ঞাপক। চিত্রের ঘ, ঙ, চ, ছ ইত্যাদি বিন্দুগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য পাঠককে অনুরোধ করিতেছি। ঘ বিন্দু ১লা তারিখের উপরে আছে। এদিকে ঠিক আড়াই টাকার পাশে আছে সুতরাং আর কিছু না লিখিয়া ঠিক ১এর উপর ও আড়াইয়ের পাশে "ব" এর স্থানে যদি একটা বিন্দু বসানো যায় তাহা হইলে ১লা তারিখে চালের দর প্রতিমণ ২॥০ ছিল, বুঝিতে কষ্ট হয় না। ঙ বিন্দু ঠিক ২রা তারিখের উপরে আছে এবং দণ্ডায়মান রেখার ৩৸০ অংশের পাশে আছে। সুতরাং "ঙ" বিন্দুকে দেখিলেই বলা যায়, ২রা তারিখে চালের দর ৩৸০ ছিল। ৩রা হইতে ৮ই তারিখ পর্য্যন্ত যে চালের দর আছে, তদনুসারে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ও ট বিন্দু বসানো

হইয়াছে। এখন চিত্রস্থ এই সকল বিন্দুর স্থান দেখিলেই বলা যাইতে পারে, ঐ সকল দিনে চালের দর কত ছিল।
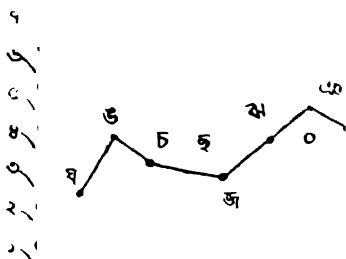
২৬শ চিত্র

মনে করা যাউক, ৭ই তারিখের চালের দর জানিতে ইচ্ছা করা গিয়াছে। শায়িত রেখার ৭ চিহ্নিত অংশের উপরেই "ঞ" বিরাজমান এবং তাহা মূল্যনির্দ্দেশক দণ্ডায়মান রেখার পাঁচ অঙ্কের পাশে অবস্থিত; কাজেই চট্ করিয়া বলিয়া দেওয়া যায় যে, ৭ই তারিখে চালের দর ৫ টাকা ছিল।

এখন যদি ২৬শ চিত্রের মত ঘ, ঙ, চ ইত্যাদি বিন্দুকে যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঘ হইতে ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেশ একটা বাঁকা রেখা পাওয়া যায়। দর জানার কাজটা এই রেখা দ্বারা যেমন সহজে হয়, তালিকা দ্বারা সে রকম হয় না। রেখার উঠা-নামা দেখিলেই চালের দরের উঠা-নামা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। ৭ই তারিখে চালের দর যে

সর্ব্বাপেক্ষা চড়া ছিল, রেখার সর্ব্বোচ্চ অংশ "ঞ" দেখিলেই জানিতে বাকি থাকে না।

বলা বাহুল্য, কেবল চালের দরই এরকম রেখা দ্বারা জ্ঞাপন করানো হয় না; যে সকল ঘটনা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাদের সকলগুলির বাড়া-কমার ইতিহাস ঐ প্রকার রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

গত ৭ই পৌষ—রাত্রি বারোটা হইতে বেলা নয়টার মধ্যে উষ্ণতাব কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ২৭শ (ক) চিত্রে রেখাঙ্কনে তাহা

২৭শ (ক)
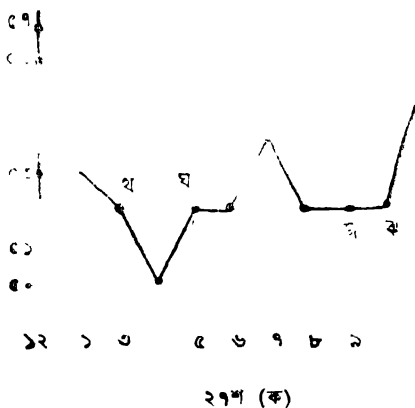
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এখানে দণ্ডায়মান রেখা ফারেন্‌হাইটের ডিগ্রির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে এবং শায়িত রেখা ঘড়ির ঘণ্টা জ্ঞাপন করিতেছে। দেখা যাইতেছে, "গ" বিন্দুতে রেখা খুব নীচে নামিয়াছে। বিজ্ঞ পাঠক একবার চিত্রের দিকে তাকাইয়াই বলিতে পারেন, ৩টার

সময় উষ্ণতা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ৫০ ডিগ্রি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ, গ বিন্দু ঠিক তিনের উপরে এবং পঞ্চাশের পাশে অবস্থিত। রেখার চ, জ, ঝ অংশটার উত্থান-পতন নাই, ঠিক এক সরল রেখায় চলিয়াছে। পাঠক ঐ বিন্দুগুলির অবস্থান দেখিলেই বুঝিবেন, ৭টা, ৮টা ও ৯টার সময় উষ্ণতার পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই দুই ঘণ্টা কালের উষ্ণতা ৫২ ডিগ্রি ছিল। তার পরে রেখাটা যখন হঠাৎ উপরে উঠিয়া "ঞ" স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বুঝিতেই হইতেছে যে, বেলা দশটার সময় কোন কারণে হঠাৎ উষ্ণতা বাড়িয়া ৫৫ ডিগ্রিতে পৌঁছিয়াছিল।

আচার্য্য বসু পূর্ব্বোক্ত প্রকার কতকগুলি রেখা টানিয়া সজীব ও নির্জীবের সাড়ার আলোচনা করিয়াছেন। তাহা বুঝাইবার জন্য এই রেখালিপির কথা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে হইল।

নাতিস্থুল লৌহদণ্ডের দুই প্রান্ত ধরিয়া সবলে বাঁকাইতে চেষ্টা করিলে দণ্ড কিয়ৎকালের জন্য একটু বাঁকে, কিন্তু তার পরেই আবার পূর্ব্বের ঋজু অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। কতটা বাঁকিল এবং প্রকৃতিস্থ হইতে উহা কতটা সময় লইল, পরিমাপ করা চলে। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত চিত্রগুলির মত কালজ্ঞাপক শায়িত রেখা এবং পরিমাণজ্ঞাপক দণ্ডায়মান রেখা দ্বারা, লৌহদণ্ডের বাঁকিয়া প্রকৃতিস্থ হওয়ার একটা রেখালিপি অনায়াসেই অঙ্কন করা যাইতে পারে। প্রাণীদেহে আঘাত করিলে ইহাতে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু এই সঙ্কোচ স্থায়ী হয় না। আঘাত অল্প হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই পেশী প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বাকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং শায়িত রেখাকে কালজ্ঞাপক ও দণ্ডায়মান রেখাকে সঙ্কোচের মাত্রাপ্রকাশক ধরিয়া লইয়া আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিদেহ কি প্রকারে কুঞ্চিত ও প্রকৃতিস্থ হয়, তাহা রেখালিপি দ্বারা অনায়াসে প্রকাশ করা যায়।

একটি লৌহদণ্ড বা মাংসপেশীতে আঘাত দিলে কত সময়ে তাহার কি পরিমাণ আকুঞ্চন ঘটে, তাহা ২৭শ (খ) চিত্রে দেখানো হইল। ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক বুঝিবেন, আঘাত প্রাপ্তির পর সঙ্কোচের মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং তার পরে উহা তিন

২৭শ খ) চিত্র

মিনিটের সময় খুব বাড়িয়া পাঁচ মিনিটের শেষে পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাহিরের আঘাত-উত্তেজনা পাইলেই যেমন মাংসপেশীতে সঙ্কোচ প্রভৃতি নানা বিকার হয়, ধাতুপদার্থেও ঠিক সেই প্রকার বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু এই বিকৃতি ঠিক চাক্ষুষ আকুঞ্চন-প্রসারণের মত নয়, ইহা এক-প্রকার বৈদ্যুতিক বিকৃতি। আঘাত-উত্তেজনা পাইলেই প্রাণীর দেহ ও ধাতুর দেহ উভয়েরই তাড়িৎ-পরিচালনাশক্তি বাড়িয়া যায়, এবং কিয়ৎকাল পরে তাহারা আবার পূর্ব্বের অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। এই তাড়িত-পরিচালনা শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিকেও রেখালিপি দ্বারা প্রকাশ

করা যাইতে পারে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই প্রকার বৈদ্যুতিক রেখালিপি দ্বারাই তাঁহার আবিষ্কারের কথা প্রচার করিয়াছেন।

২৮শ চিত্রের (ক) ও (খ) দুইটা অংশ মাংসপেশী ও ধাতু-পদার্থের সাড়ালিপি। অর্থাৎ আঘাত দিলে ধাতুপদার্থেরও বিদ্যুৎ-পরিচালনা

(ক) (খ)

২৮শ (চিত্র)

শক্তি কি প্রকারে কমিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা (ক) চিত্রের রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে এবং সেই প্রকার অবস্থায় সজীব মাংসপেশী কি প্রকারে আঘাতের বেদনায় কাতর হইয়া তাহার বিদ্যুৎ-পরিচালনা-শক্তির পরিবর্ত্তন করে, তাহা (খ) চিত্রে

(ক) (খ)

২৯শ চিত্র

বিবৃত হইতেছে। আঘাতের সাড়া দেওয়াতে নির্জীব ধাতুপিণ্ড ও সজীব মাংসপেশী কি প্রকার একতা দেখায়, চিত্রদর্শনেই পাঠক তাহা বুঝিবেন।

২৯শ চিত্রটির (ক) মাংসপেশী এবং (খ) ধাতুপিণ্ডের সাড়ালিপি। মাংসপেশীতে বার বার আঘাত-উত্তেজনা দিলে তাহা ক্রমেই অসাড় হইয়া

আসে। প্রথমটা প্রত্যেক আঘাতে ইহা বেশ সাড়া দেয়, কিন্তু আঘাত অবিরাম দীর্ঘকাল চালাইলে পেশীর সাড়ার পরিমাণ কমিয়া আসে। এই ব্যাপারটা আমাদের অতি সুপরিচিত। শরীরের কোন অংশে বার-বার চিম্‌টি কাটিতে থাকিলে, শেষে যে আমাদের বেদনা লোপ পাইয়া যায়, তাহা পাঠক অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যাহা হউক, চিত্রের (ক) অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, পেশী প্রথম কয়েকটি আঘাতে বেশ সুস্পষ্ট সাড়া দিয়াছিল; কিন্তু আঘাত

৩০শ চিত্র

পুনঃপুনঃ পাইয়া শেষে সেটি ক্রমে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। (খ) অংশ ধাতুপিণ্ডের সাড়ালিপি। পুনঃপুনঃ আঘাতে ধাতুপিণ্ডকেও ঠিক সেই প্রকারে অসাড় হইতে দেখা যাইতেছে।

মাংসপেশী বেদনায় কাতর হইয়া যে রকমে সাড়ার পরিমাণ কমাইয়া আনে, নির্জীব ধাতুও সেই প্রকার সাড়া কমাইয়া যে বেদনার অনুরূপ

লক্ষণ প্রকাশ করিতে পারে, আচার্য্য বসু তাহা দেখাইয়াছেন। এই সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

মাংসপেশীতে হঠাৎ একটা গুরু আঘাত দিলে সেটি সেই আঘাতে সাড়া দেয়, কিন্তু ইহার পরও আঘাত দিতে থাকিলে সেগুলিতে আর অধিক সাড়া পাওয়া যায় না। পেশী একই আঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পেশীর এই অবসাদের লক্ষণ ধাতুপিণ্ডেও দেখিতে পাইয়াছেন। ৩০শ চিত্রের (ক) অংশ পেশীর
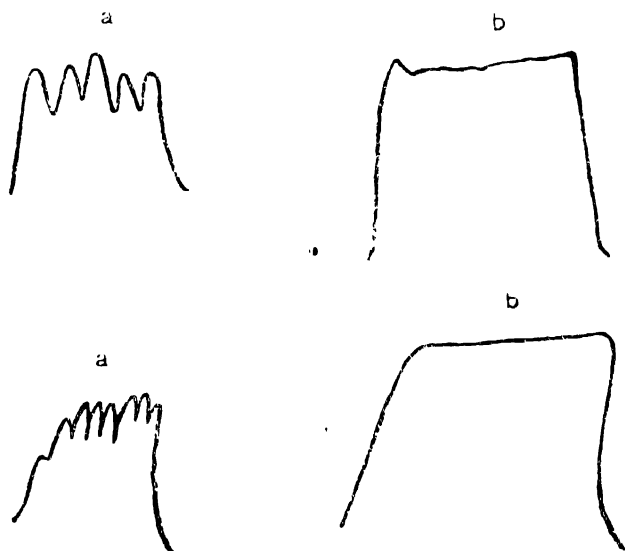
৩১শ চিত্র

সাড়ালিপি এবং (খ) অংশ ধাতুর—উভয়ের ঐক্য অতি অদ্ভুত। গুরু আঘাতে পেশী ও ধাতু উভয়েই অবসন্ন এবং আড়ষ্ট। তাই চিত্রের রেখা

উপরে উঠিয়াই সরল হইয়া গিয়াছে। পরে কিছুকাল বিশ্রামের পর সেই রেখা নামিয়া পেশীর স্বভাবপ্রাপ্তির কথা জানাইতেছে।

৩১শ চিত্রটি মাংসপেশী ও ধাতুর ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। a, b অংশ মাংসপেশীর এবং a′, b′ ধাতুর সাড়ালিপি। প্রথমে ইহারা নিয়মিত সাড়া দিতেছিল, পরে কঠিন আঘাতেই উভয়েই অবসন্ন ও আড়ষ্ট হইয়াছে। এই জন্য চিত্রের রেখা উপরে উঠিয়াই সরল হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল বিশ্রামের পর সেই রেখা নামিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির কথা জানাইতেছে।

অল্প উত্তাপে প্রাণিদেহের অবসাদ নষ্ট হয়। কোন স্থানে বেদনা হইলে, তাপপ্রয়োগে বেদনার স্থান সুস্থ হয়। কিন্তু তাপের পরিমাণ অধিক হইতে থাকিলে, তাপই আবার বেদনার কারণ হয়। তখন তাপপ্রাপ্ত অংশ অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে।

৩২শ চিত্র

৩২শ চিত্রটির (ক) ও (খ) অংশে মাংসপেশী ও ধাতু তাপে কি প্রকারে সাড়া দেয়, তাহা লিপিবদ্ধ আছে। ত্রিশ ডিগ্রি উষ্ণতায় মাংসপেশী কি

প্রকার সবলে সাড়া দিতেছে, চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। তার পরে উষ্ণতার পরিমাণ ৬০ ডিগ্রি হইবামাত্র সাড়া ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। (খ) অংশে ধাতুর অবস্থাও অবিকল তাহাই প্রকাশ করিতেছে। শীতের দিনে এক পেয়ালা গরম চা সেবন করিয়া
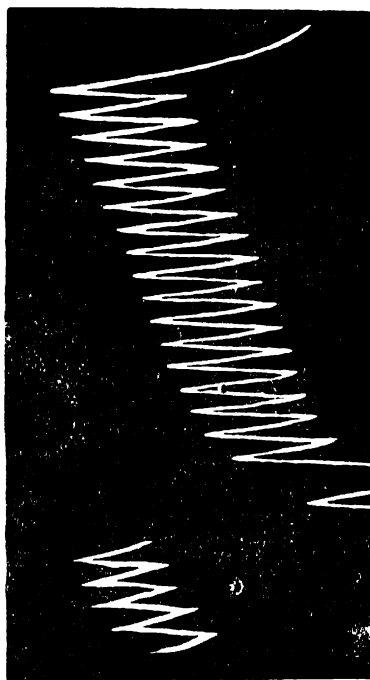
৩৩শ চিত্র

প্রাণিদেহ যে বলসঞ্চার করে, তাহা পাঠককে বলিয়া দেওয়া বৃথা। ধাতুপিণ্ডও যে সবল হইবার জন্য একটু গরমের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা কিন্তু আচার্য্য বসুর আবিষ্কার হইতেই জানা গেল।

বীর্য্যবান ঔষধ অল্পমাত্রায় সেবন করিলে দেহের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়; প্রাণী তখন খুব সবল হয়। কিন্তু সেই ঔষধের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইলে দেহে অবসাদের লক্ষণ দেখা দেয় এবং শেষে তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। আচার্য্য বসু ধাতুদ্রব্যেও প্রাণীর এই লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন।

৩৩শ এবং ৩৪শ চিত্রদ্বয় ধাতুর সাড়ালিপি। স্বাভাবিক অবস্থায় ধাতু কি প্রকারে সাড়া দেয়, ৩৩শ চিত্রের দক্ষিণস্থ রেখালিপি তাহা
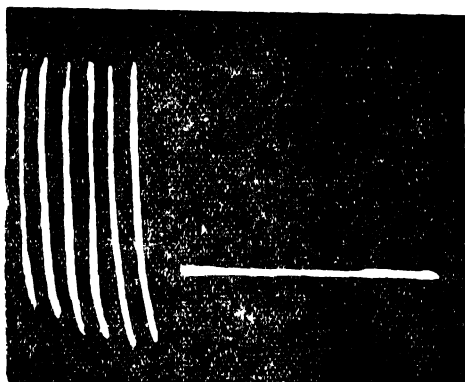
৩৪শ চিত্র

প্রকাশ করিতেছে; তার পর উত্তেজক কষ্টিক্‌পটাস নামক ঔষধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করায় তাহাই কি প্রকার সজোরে সাড়া দিতেছে, তাহা ঐ চিত্রের বামদিকের অংশে দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক বুঝিবেন।

৩৪শ চিত্রটির বাম পার্শ্বের লিপি সুস্থ ধাতুর (টিনের) স্বাভাবিক সাড়ালিপি। কষ্টিক্-পটাস্ বিষ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করায় ধাতুটির

অবস্থা কি প্রকার শোচনীয় হইয়াছে, দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সরলরেখার মত সাড়ালিপিতে তাহা প্রকাশিত রহিয়াছে। এই অবস্থায় ধাতু একেবারে অসাড়; তাই রেখার উত্থান-পতন একেবারেই নাই।

যেমন বিষ আছে, তেমনি বিষের ঔষধও আছে। কোন বিষাক্ত ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করিয়া প্রাণী যখন অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, তখন বিষঘ্ন কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে সে সুস্থ হয়।

আচার্য্য বসু এই লক্ষণও ধাতুতে দেখিতে পাইয়াছেন। প্রাণী ও ধাতুর ঐক্যের ইহা অপেক্ষা সুন্দর প্রমাণ বোধ হয় আর নাই। আফিম্, বেলেডোনা, ইপিকাক্, প্রভৃতি যে কি প্রকারে মাত্রা-ভেদে দেহে কখনও ঔষধ, কখনও বিষের কাজ করে তাহা পাঠককে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য। আচার্য্য বসু এই সকল ঔষধ ধাতুতে প্রয়োগ করিয়া ঠিক সেইপ্রকার কাজ দেখিতে পাইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, প্রাণীকে অল্প মাত্রায় মদ খাওয়াইলে সে যেমন সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠে, মদ্যপ্রয়োগে আচার্য্য বসু ধাতুকেও সেই প্রকার মত্ত হইতে দেখিয়াছেন। এই অবস্থায় মদমত্ত ব্যক্তির ন্যায় ধাতু খুব সবলে সাড়া দিতে থাকে। অধিক মদ খাইলে পাকা মাতালও নিঃস্পন্দ হইয়া ভূশায়ী হয়,—অধিক মদ্য প্রয়োগে ধাতুকেও ঠিক সেই প্রকার নিঃস্পন্দ হইতে দেখা গিয়াছে।

সজীব ও নির্জীবের পূর্ব্বোক্ত স্থূল একতা ছাড়া আচার্য্য বসু উহাদের খুটিনাটি অন্য বিষয়ে যে সকল ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতে গেলে সেগুলি লইয়াই একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। কৌতূহলী পাঠককে আচার্য্য বসুর Response on Livin; and Non-living" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানির আগাগোড়া সজীব ও নির্জীবের জীবনের বিস্ময়পূর্ণ কাহিনীতে পূর্ণ।

যাহা হউক, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সজীব ও নির্জীবের মধ্যে এই সকল সাদৃশ্য আবিষ্কার লইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এই আলোকে জীব ও জড়তত্ত্বের আরো যে কত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহা এখন বলা যাইতেছে না। প্রাণীর ন্যায় নির্জীব ধাতুপিণ্ড যে বাহিরের আঘাতে সাড়া দেয়, বিষে অবসন্ন হয়, আবার প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগে সুস্থ হয়,—এ সকল কথা কিছুদিন পূর্ব্বে কোন বৈজ্ঞানিকই জানিতেন না। সজীব ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা বিজ্ঞান সুস্পষ্ট দেখাইতে পারে নাই। প্রাচীন আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপারে অনেক সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন, কিন্তু ফলে কিছুই লাভ করা যায় নাই, কেবল যুক্তিতর্কের জঞ্জাল বাড়িয়া চলিয়াছিল। আচার্য্য বসুর এই আবিষ্কার জড় ও জীবতত্ত্বের মূলের রহস্য প্রত্যক্ষ উদ্ঘাটন করিয়াছে।

অবসাদ

শ্রম ও অবসাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একের অস্তিত্বে আমরা অপরটির পরিচয় পাই। শ্রম করিলেই অল্পাধিক অবসাদ তাহার অনুসরণ করিবে এবং কাহাকেও অবসন্ন দেখিলে, কোন প্রকার শ্রমই যে সেই শান্তির উৎপাদক, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণকে অবসাদ উৎপত্তির মূল কারণের কথা জিজ্ঞাসা কর। তাহারা বলিবেন,—প্রাণী যখন শ্রমে নিযুক্ত থাকে, তখন অবস্থা-বিশেষে মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি শারীরিক অংশগুলির ক্ষয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই ক্ষয়ের পূরণ করিয়া শরীরকে প্রকৃতিস্থ রাখার সুব্যবস্থা প্রাণদেহেই আছে বলিয়া, অল্প শ্রমজনিত দৈহিক ক্ষয় প্রাণীকে অসুস্থ করিতে পারে না।

যন্ত্রমাত্রেরই কার্য্যোপযোগিতার একটা সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলে যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। যে এঞ্জিন্ সহজে একখানি গাড়ি টানিতে পারে, তাহাকে ৪০ খানি গাড়ি টানিতে দিলে চাকা একবারও ঘুরিবে না। শারীরযন্ত্রের কার্য্যোপযোগিতারও ঐ প্রকার একটা সীমা দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের স্বাভাবিক শক্তি যে শ্রমজাত ক্ষয়কে অতি অল্পকাল মধ্যে পূরণ করে, দ্বিগুণ শ্রমজাত ক্ষয়কে সেই সময়ের মধ্যে পূরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রাণী যখন ক্রমাগত কঠোর শ্রমে নিযুক্ত থাকে, পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষয়ের পূরণ হয় না; কাজেই শ্রমের কালের দীর্ঘতা অনুসারে সমবেত ক্ষয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই প্রকারে দৈহিক ক্ষয় যখন খুব অধিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রাণী আর শ্রম করিতে পারে না। একদল বৈজ্ঞানিকের মতে ইহাই অবসাদের মূল কারণ।

অবসাদ-উৎপত্তির আর একটি মতবাদ আছে। এই মতাবলম্বিগণ বলেন—শ্রম দ্বারা প্রাণীর কোনও অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় সঞ্চালিত হইলে তাহাতে স্বতঃই এক প্রকার অবসাদজনক পদার্থের (Fatigue Substance উৎপন্ন হয়। ইহাদের মতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত দৈহিক ক্ষয় এবং ঐ অবসাদজনক পদার্থই ক্লান্তির মূল কারণ। উৎপত্তিমাত্র এই জিনিসটি যদি নিয়মিত শোণিতপ্রবাহ দ্বারা দেহ হইতে নিষ্কাশিত না হয়, তাহা হইলে সেটা প্রাণিশরীরে বিষবৎ অনিষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত শারীর কোষের মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম ব্যবধানগুলিতে ঐ পদার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোষের জড়তা উৎপন্ন করে। ইহাদের মতে ঐ জড়তাই অবসন্ন প্রাণীর নির্জীব ভাবের কারণ।

ভুবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত সিদ্ধান্ত দুইটির নানা প্রকার ভ্রম দেখাইয়া, অবসাদ-উৎপত্তির আর একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

ঐ পুরাতন সিদ্ধান্ত দুইটি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক পণ্ডিতগণ একমাত্র রক্তকে অবসাদ-নাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই শরীরের সর্ব্বাংশে প্রবাহিত হইয়া দেহপুষ্টির উপযোগী পদার্থ বহন করিয়া আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসাদজনক পদার্থ (Fatigue Substance) ক্ষয় করে। আচার্য্য বসু রক্তহীন পেশী পরীক্ষা করিয়া অবসাদের লক্ষণ দেখাইয়াছেন এবং প্রাণী যেমন বিশ্রাম দ্বারা স্বভাবতঃ বিগতশ্রম হয়, তিনি শোণিতহীন পেশীরও তদ্রূপ অবসাদ-নাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চেতন অচেতন, ধাতু, উদ্ভিদ্‌বস্তুমাত্রেই আচার্য্য বসু অবসাদের লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সকল স্থানেই একই নিয়মে অবসাদের অপনোদন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শোণিত-মাংসহীন নির্জীব ধাতুকে যদি প্রাণীর ন্যায় অবসন্ন হইতে দেখা যায়, এবং তাহার অবসাদ আপনোদনের উপায়ও যদি এক হয়, তবে দেহের ক্ষয় ও অবসাদজনক পদার্থের উৎপত্তিকে কি প্রকারে ক্লান্তির কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করুন। উদ্ভিদ্‌দেহে ও ধাতুপিণ্ডে ত রক্ত নাই, তবে শোণিত-সঙ্কলনকেই বা কি প্রকারে অবসাদের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়?

অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, চেতন-অচেতন, সজীব-নির্জীব পদার্থমাত্রেই আচার্য্য বসু কি প্রকারে অবসাদ-লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা যাউক। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, প্রাণীর সজীবতার লক্ষণ ধরিবার কতকগুলি উপায় আছে। ধমনীর স্পন্দন-পরীক্ষা সেগুলির মধ্যে একটি। মুমূর্ষু রোগীর জীবন আছে কি না দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার ধমনী-স্পন্দন পরীক্ষা করেন। স্পন্দনের লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে, ডাক্তারী সিদ্ধান্তে রোগী মৃত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এটা মৃত্যু পরীক্ষার খুব প্রচলিত সহজ উপায় বটে, কিন্তু ইহাকে কোন ক্রমেই সূক্ষ্ম উপায় বলা যায় না,— কেবল নিজের স্পর্শশক্তির উপর নির্ভর করিলে জীবিতকে মৃত সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়। যাহা হউক, সজীবতা পরীক্ষার ইহা অপেক্ষাও একটা সূক্ষ্ম উপায় আছে। প্রাণিশরীরের কোনও পেশী বা স্নায়ুর দুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়া তাহাতে আঘাত কর। পেশী সুস্থ ও সজীব থাকিলে প্রতি আঘাতেই তাহার মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া সেই তারের মধ্য দিয়া চলিতে দেখিবে এবং যদি সেই তারটির মধ্যে তড়িদ্‌বীক্ষণ (Galvanometer) যন্ত্র সংযুক্ত থাকে, তবে কি পরিমাণ আঘাতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সেই যন্ত্রের শলাকার বিচলন দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে। যে প্রাণী যত সবল ও সুস্থ

থাকিবে, অল্প আঘাতে তাহার শরীরে তত প্রবল প্রবাহ উৎপন্ন হইবে মৃতপ্রায় প্রাণিশরীরে প্রচণ্ড আঘাত দাও, একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি দেখিবে। মৃত প্রাণিদেহে শত আঘাত দাও, বিদ্যুতের অণুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাইবে না।

পাঠকপাঠিকাগণ পূর্ব্বোক্ত তড়িৎ-প্রবাহকে বৈদ্যুতিক শকটের চালক বা আলোকোৎপাদক প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিবেন না। ঐ প্রবাহগুলি প্রায়ই অত্যল্পকাল স্থায়ী হয়। কোন প্রকার আঘাত-উত্তেজনা প্রাপ্তিমাত্র প্রাণিদেহে একটা ক্ষীণ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া সেটি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং তার পর বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইলে প্রবাহটি আপনা হইতেই মৃদুতর হইয়া ক্রমে একবারে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

৩৫শ চিত্র

আচার্য্য বসু আঘাত-উত্তেজনাজাত বৈদ্যুতিক-প্রবাহের প্রাবল্য এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লয়কাল লিপিবদ্ধ রাখিবার একটি সুন্দর উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরের ৩৫শ চিত্রটি সেই প্রথায় অঙ্কিত একটি স্নায়ুর বৈদ্যুতিক লিপি। ইহার উর্দ্ধগামী কখ, গঘ, ইত্যাদি রেখা প্রবাহবৃদ্ধির সূচক এবং নিম্নমুখী খগ ও ঘঙ প্রভৃতি রেখাগুলি দ্বারা প্রবাহের হ্রাস বুঝায়। উর্দ্ধগামী কখ, গঘ ইত্যাদি রেখার খ ও

প্রান্তগুলি যতই ভূমি রেখা হইতে দূরে থাকিবে, ততই প্রবাহ প্রবল হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। কোন আঘাতজাত প্রবাহের বৃদ্ধি বা লয় পাইতে কত সময়ের আবশ্যক হইয়াছিল, চিত্রপরীক্ষায় তাহাও বুঝা যায়। প্রবাহবৃদ্ধির সূচক কখ, গঘ ইত্যাদি রেখাগুলি কঙ ভূমির দিকে যত হেলিয়া থাকিবে, বৃদ্ধির চরম সীমায় পৌছিতে তত অধিক সময় লাগিয়াছিল, বুঝিতে হইবে। প্রবাহের লয় প্রাপ্তি কাল ও ভূমির সহিত নিম্নগামী খগ ও ঘঙ প্রভৃতি রেখার ঐ প্রকার অবনতি পরীক্ষা করিলে অনায়াসে বুঝা যায়। সজীব মাংসপেশীতে আঘাত দিতে থাকিলে প্রত্যেক আঘাতেই যে একটি ক্ষণিক তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৩৫শ চিত্রস্থ তরঙ্গরেখার প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্ আঘাতজাত প্রবাহের সাড়ালিপি।*

আচার্য্য বসু সজীব মাংসপেশীতে ক্রমাগত ঘন ঘন আঘাত প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন, প্রথমে আঘাতে প্রবলভাবে বৈদ্যুতিক সাড়া দিয়া, সেটি ক্রমে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, তখন প্রবল আঘাতে অতি ক্ষীণ সাড়া ব্যতীত আর কিছুই তাহাতে দেখা যায় না। কিন্তু ইহার পর যদি পেশীটিকে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেটি সুস্থ হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল সাড়া দিতে থাকে।

---

* বলা বাহুল্য, আঘাত-উত্তেজনা দ্বারা আচার্য্য বসু এই শ্রেণীর যতগুলি চিত্র পাইয়াছেন, তাহার একটিও হাতে অঙ্কিত নয়। বিদ্যুদ্বীক্ষণ (Galvanometer) যন্ত্রের শলাকায় যে দর্পণ সংলগ্ন থাকে, তাহার প্রতিফলিত আলোকই চিত্র-অঙ্কনের মূল অবলম্বন। শলাকার বিচলনের সহিত সেই দর্পণের প্রতিফলিত আলোক চঞ্চল হইয়া ফোটোগ্রাফের কাচের উপর পড়িলে, তাহাতে আলোকপথের যে রেখাময় ছবি স্থায়িভাবে অঙ্কিত হইয়া পড়ে, তাহাই সেই সাড়ালিপি।

৩৬শ চিত্রটি সজীব প্রাণিদেহের অবসাদলিপি। প্রাণী সুস্থাবস্থায় প্রতি আঘাতেই যেমন নিয়মিত সাড়া দেয়, তাহা চিত্রের বাম পার্শ্বস্থ সমদীর্ঘ তরঙ্গ-রেখাগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন। তার পরে আঘাতসংখ্যা

৩৬শ চিত্র

বৃদ্ধি দ্বারা প্রাণীকে অবসন্ন করিলে, সেটি কি প্রকার ক্ষীণ সাড়া দিয়াছে, পাঠক ঐ চিত্রের মধ্যস্থ অংশে তাহার স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাইবেন।।

৩৭শ চিত্র

অবসন্ন হওয়ার পর, আচার্য্য বসু অবসাদ মোচনের। জন্য। প্রচুর অবকাশ দিয়া আবার তাহাতে আঘাত প্রদান আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিগত-
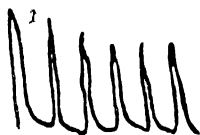
৩৮শ চিত্র

শ্রম প্রাণী কি প্রকারে পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল সাড়া দিয়াছিল, চিত্রের দক্ষিণ-প্রান্তস্থ দীর্ঘতর তরঙ্গ রেখাগুলি দ্বারা পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আচার্য্য বসু সজীব উদ্ভিদ্ ও নির্জ্জীব ধাতু-পিণ্ডে ঘন ঘন আঘাত দিয়া অবিকল পূর্ব্বের অনুরূপ ফল পাইয়াছেন।* ৩৭শ ও ৩৮শ চিত্রদ্বয় অবসন্ন উদ্ভিদ্ ও ধাতুর সাড়ালিপি। চিত্রগুলির ঐক্য কতদূর সূক্ষ্ম পাঠক একবার সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সুস্থ উদ্ভিদ্ ও ধাতু আঘাত দ্বারা বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিয়া যে প্রকার সাড়া দেয়, চিত্রদ্বয়ের প্রথম অংশ দেখিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। তারপর উপর্য্যুপরি আঘাতে অবসন্ন হইয়া উহারা যখন ক্ষীণ সাড়া দিতে থাকে, পাঠক চিত্রের মধ্যস্থলে তাহার সাড়ালিপি দেখিবেন। এই অবসন্ন উদ্ভিদ্ ও ধাতুকে বিশ্রামের অবকাশ দাও, প্রাণীর ন্যায় ইহারাও বিগতশ্রম হইবে। পাঠক চিত্রদ্বয়ের দক্ষিণপার্শ্বস্থ দীর্ঘতরঙ্গরেখা দেখিলে তাহা বেশ বুঝিবেন। ঐ রেখাগুলিই সেই বিগতশ্রম উদ্ভিদ্ ও ধাতুর সাড়ালিপি।

অবসাদ কেবল শ্রমপরায়ণ প্রাণীরই ধর্ম্ম ভাবিয়া আধুনিক পণ্ডিতগন কি প্রকার ভ্রম করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার হইতে পাঠক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কেবল কল্পনা-সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ যে অবসাদ-জনক পদার্থ (Fatigue Substance) ইত্যাদির সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন, সেগুলি আমূল ভ্রমপূর্ণ।

অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণসম্বন্ধে আচার্য্য বসু কি বলেন, এখন দেখা যাউক। সজীব মাংসপেশীতে আঘাত দিলে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়, সেটা তাঁহার মতে একটা আণবিক ব্যাপার ব্যতীত আর

* কেবল অবসাদ ব্যাপারে নহে,—বাহ্য আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণিশরীরে বেদনা বা অসুস্থতাব্যঞ্জক বৈদ্যুতিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদবস্থ উদ্ভিদ্ ও ধাতুতে আচার্য বসু অবিকল একই লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। মদমত্ত, বিষমৃত গ্রীষ্ম বা শীতে অবসন্ন হইয়া প্রাণিদেহ যেমন সাড়া দেয়, উদ্ভিদ্ ও ধাতু অবিকল যে সেই প্রকার সাড়া দিয়া থাকে, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

কিছুই নয়। আঘাতাদি দ্বারা কোন পদার্থের এক অংশের আণবিক বিন্যাস বিকৃত করিলে, এই অংশের অণুগুলি প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য স্বতঃই সচেষ্ট হইয়া পড়ে। আচার্য্য বসুর মতে ইহাই আহত ও অনাহত স্থানের মধ্যেকার সেই তড়িৎ-প্রবাহের মূল কারণ। অবসাদও ঐ প্রকার এক শ্রেণীর আণবিক বিকৃতির ফল। চেতনা অচেতনা বা সজীবতা-নির্জ্জীবতার সহিত তাই অবসাদের কোন সম্বন্ধই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঘন ঘন আঘাত দ্বারা কোন পদার্থের আণবিক বিন্যাস বিকৃত কর অবসাদ-লক্ষণ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে।

এই আণবিক সিদ্ধান্তটি আচার্য্য বসুর অনুমানমূলক উক্তি নয়। একখণ্ড ধাতুর এক অংশের আণবিক বিন্যাস কোন উপায়ে বিকৃত করিয়া তিনি বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের স্পষ্ট অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর প্রমাণ প্রয়োগ প্রকৃতই অসম্ভব।

অবসাদ-উৎপাদক আণবিক বিকৃতিটা যে কি, তাহা বুঝিতে হইলে, অণুর উপর বাহ্য আঘাত-উত্তেজনার কার্য্যটা প্রথমে জানা আবশ্যক। আচার্য্য বসু একটি সহজ যন্ত্র দ্বারা পদার্থের আভ্যন্তরীণ এই আণবিক বিচলন ব্যাপারটা বেশ বুঝাইয়াছেন।

যন্ত্রটি সূত্রসংলগ্ন একটি গোলক ব্যতীত আর কিছুই নয়। গোলকে ধাক্কা দিলে অবস্থাবিশেষে তাহার যে প্রকার আন্দোলন দেখা যায়, কোন পদার্থে আঘাত দিলে তাহার অণুগুলির বিচলনও কতকটা তদ্রূপ হইয়া পড়ে। গোলকের একদিকে একটি মাত্র ধাক্কা দাও, পূর্ব্বের স্থির গোলকটি পুনঃপুনঃ উর্দ্ধাধোভাবে আন্দোলিত হইয়া ক্রমে স্থির হইয়া যাইবে। কোন পদার্থে আঘাত দাও, তাহারও অণুসকল পূর্ব্ববৎ আন্দোলিত হইয়া এবং ইহাতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিতে করিতে শেষে

স্থির হইয়া পড়িবে। চক্ষুর কৃষ্ণপর্দ্দার (Retina) উপর পতিত আলোক দ্বারা, এই প্রকার পুনরান্দোলনের লক্ষণ আচার্য্য বসু অনেক পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গোলকের আন্দোলনের সময় যদি বালুকাপূর্ণ একটি পাত্র উহার সংস্পর্শে আনা যায়, তাহা হইলে গোলকটি বালুকার বাধায় আর পুনরান্দোলন করিতে পারে না। কারণ ধাক্কা দ্বারা একবার উপরে উঠার পর নীচে নামিবামাত্র বালুকা গতি ক্ষয় করিয়া দেয়; কাজেই, এক একটি আঘাতে তাহার একবার উর্দ্ধে গমন এবং একবার নিম্নে আগমন ব্যতীত আর আন্দোলন হয় না। পদার্থে আঘাত দিলে, আমরা সাধারণতঃ যে, প্রতি আঘাতে এক একটি করিয়া বৈদ্যুতিক সাড়া পাই, অণুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আন্দোলনই তাহার কারণ।

এই ত গেল আঘাতজাত সাধারণ বৈদ্যুতিক সাড়ার কথা। পুনঃপুনঃ আঘাতে যে আণবিক বিচলন হয়, তদ্দ্বারা পদার্থের বৈদ্যুতিক সাড়া বৃদ্ধি না পাইয়া তাহা কি প্রকারে ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া অবসাদ-লক্ষণ প্রকাশ করে, এখন তাহা দেখা যাউক। প্রবল আঘাত-প্রাপ্তির পর সেই উদাহৃত গোলকটি খুব উর্দ্ধে উঠিয়া যখন প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সবেগে নীচে নামিতে থাকে, সেই সময় তাহাকে গতির বিপরীত দিকে একটি ধাক্কা দাও। এই সময়ে প্রদত্ত ধাক্কার অধিকাংশই সেই বেগবান গোলক-টিকে মধ্যপথ হইতে বিপরীত দিকে ফিরাইতেই ব্যয়িত হইয়া যাইবে, —ধাক্কার যে একটু বল অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা সেটি হয়ত একটু উর্দ্ধে উঠিয়াই আবার নীচে নামিতে আরম্ভ করিবে। ঘন ঘন আঘাত দ্বারা পদার্থের যে অবসাদ হয়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আণবিক বিচলনই তাহার মূল কারণ বলিয়া আচার্য্য বসু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন পদার্থে ধীরে ধীরে আঘাত দাও। প্রথম আঘাতে বিচলিত হওয়ার পর অণু-সকল যখন স্বাভাবিক স্থানে আসিয়া পড়ে, তখনই ইহারা দ্বিতীয়

আঘাতের ধাক্কা পায়; কাজেই সেই আঘাতে অণুগুলি আবার সবলে বিচলিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে নিয়মিত সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ঘন আঘাতগুলির পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবহিত কাল অতি অল্প; এজন্য প্রথম আঘাত দ্বারা যে আণবিক আন্দোলন হয়, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্ব্বেও, অণুসকল তাহাদের গতির বিপরীত দিকে আর এক আঘাতের সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে। কাজেই, পূর্ব্ব-উদাহৃত নিম্নগামী গোলকের ধাক্কার ন্যায়, এই আঘাতের অনেকটা শক্তি অণুগুলির গতি থামাইতেই ব্যয়িত হইয়া যায় এবং যে একটু শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে অণুগুলির অতি সামান্যই বিচলন হয়। ঘন ঘন আঘাতে অণুর এই স্বল্প বিচলনই অবসাদের মূল কারণ।

আচার্য্য বসুর এই আবিষ্কারের বিবরণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশের নানা বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অভ্রান্ত যুক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। বিধাতা সৃষ্টির কোন জিনিসকেই যে বিশেষ গুণসম্পদ্ দিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহা আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতামহগণ বেশ জানিতেন। তুচ্ছ বালুকণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধীশক্তি-সম্পন্ন মানব পর্য্যন্ত সকল পদার্থ একই অখণ্ড নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শাসিত হইতেছে, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। পিতামহগণের উপযুক্ত সন্তান জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারগুলি দ্বারা সেই মহাসত্যের একটু সামান্য অংশ দেখাইয়াছেন মাত্র।

দৃষ্টিতত্ত্ব

কৃত্রিম চক্ষু

আধুনিক শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে দৃষ্টিজ্ঞান-উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন,—চক্ষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী কৃষ্ণপর্দ্দায় (Re ina) বাহিরের আলোক পড়িয়া উত্তেজনা উপস্থিত করিলে, সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কের যোগে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার করে। কিন্তু সেই উত্তেজনাটা যে কি, এবং অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় ঈথর তরঙ্গ অক্ষিপর্দ্দায় আঘাত দিবামাত্র যে কি প্রকারে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপাদন করে, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

একদল বৈজ্ঞানিকের মতে, অক্ষিপর্দ্দায় লিপ্ত পদার্থবিশেষের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দৃষ্টিজ্ঞানের মুল কারণ। বাহিরের আলোক অক্ষিচ্ছিদ্রের (Pupil) মধ্য দিয়া পর্দ্দালিপ্ত পদার্থে পড়িয়া সেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। ইহাঁরা আরও বলেন,—এই পরিবর্ত্তন ঠিক সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের অনুরূপ নয়, আলোক দ্বারা পর্দ্দালিপ্ত পদার্থ অবস্থাবিশেষে কখন ধ্বংস এবং কখনও বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় এবং বৃদ্ধি (Katabolic and Anabolic Changes) দ্বারা দৃষ্টিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহিরের আলোক দ্বারা আমরা দৃষ্ট পদার্থে যে নানা-বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই, ইহাঁদের মতে উক্ত দুই প্রকার রাসায়নিক পবিবর্ত্তনের (Metabolic Changes) মিশ্রণই তাহার মুল কারণ।

প্রাকৃতিক কার্য্য বাহির হইতে দেখিলে খুব জটিল ও অনিয়ন্ত্রিত বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু একবার রহস্যাবরণ উন্মোচিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সুব্যবস্থা ও সরল নিয়ম ধরা পড়িয়া যায়। দৃষ্টিজ্ঞান-উৎপাদনের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় নানা

জটিলতা থাকায়, সেটা কতকটা অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য আজকাল অনেকেই সেটিকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। আলোকপাতমাত্র অক্ষিপর্দ্দালিপ্ত পদার্থের ক্ষয় ও নিমেষ-মধ্যে সেই ক্ষয়ের পূরণ এবং তার পরে আবার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপাদন, এ সকলই আমাদেরও নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এ প্রকার দ্রুত রাসায়নিক কার্য্যের উদাহরণও জড়বিজ্ঞানে দুর্লভ।

যাহা হউক, দৃষ্টিজ্ঞানোৎপত্তির রাসায়নিক ব্যাখ্যার এই সকল গলদ দেখিয়া একদল আধুনিক পণ্ডিত আর এক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। ইহাঁদের মতে—দৃষ্টিজ্ঞানের মূল কারণ বিদ্যুৎ। আলোকপাতমাত্র কৃষ্ণ-পদার্থলিপ্ত অক্ষিপর্দ্দায় তড়িৎ উৎপন্ন হয়, এবং তার পরে সেই তড়িৎ-তরঙ্গ অক্ষিস্নায়ু (Optic Nerve) দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হইলে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়। অক্ষিস্নায়ুর কার্য্য কতকটা টেলিগ্রাফের তারের কার্য্যের অনুরূপ এবং প্রাণিমস্তিষ্কটা যেন টেলিগ্রাফের সঙ্কেতগ্রহণ যন্ত্র,—অতি মৃদু তরঙ্গও ইহাতে আসিয়া প্রবল সাড়ার উৎপাদক হয়।

উল্লিখিত নূতন মতবাদ প্রচারের পর এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কি কারণে আলোকপাতে তড়িৎ উৎপন্ন হয় এবং চক্ষুপ্রবিষ্ট আলোকের প্রকারভেদেই বা কোন প্রক্রিয়ায় বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়, এই সকল তথ্যের সহজ মীমাংসা এই মতবাদে পাওয়া যায় নাই। ভারতের সুসন্তান বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বহু গবেষণা দ্বারা সম্প্রতি দৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বৈদ্যুতিক মতবাদের পোষক অনেকগুলি প্রত্যক্ষ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আচার্য্য বসুর এই সকল আবিষ্কার দ্বারা শিশুমতবাদটির ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে. এবং অপর বৈজ্ঞানিকগণ দৃষ্টিব্যাপারের যে সকল জটিল ঘটনার কোন

কারণই এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে পারেন নাই, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় তাহাদেরও উৎপত্তিতত্ত্ব আবিস্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে আচার্য্য বসুর দৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

হোম্‌গ্রেন (Holmgren), কুনে (Kuhn), ডিউয়ার (Dewer) এবং ষ্টেনার্ (Steiner)-প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক অনেক পণ্ডিত দৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আলোকপাত-জনিত বিদ্যুৎপ্রবাহ যে, দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপত্তি করে, ভেকের চক্ষে আলোকপাত করিয়া ইহাঁরাই তাহা প্রথমে দেখিতে পান। আচার্য্য বসুও পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় প্রাণিচক্ষে আলোকপাত করিয়া বিদ্যুৎ-লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং হঠাৎ আলোকপাত-রোধ ও আলোকের প্রাখর্য্য পরিবর্ত্তন করিলে প্রবাহের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও লিপিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এই পরীক্ষাকালে আচার্য্যের মনে হইয়াছিল, যদি প্রকৃতই আলোক দ্বারা প্রাণিচক্ষে বিদ্যুতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তবে সুকৌশলে চক্ষুর অনুরূপ একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আলোকপাত করিলে নিশ্চয়ই বিদ্যুতের উৎপত্তি হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একটি নাতিস্থুল রৌপ্যদণ্ডের একপ্রান্ত পিটাইয়া সেটাকে অক্ষি-কোষের আকার প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর সেই অক্ষিপুটে ব্রোমিনের (Bromine) প্রলেপ দ্বারা কৃত্রিম অক্ষিপর্দ্দা রচনা করিয়া তাহাতে আলোকপাত করিয়া দেখিয়াছিলেন। প্রাণিচক্ষুতে আলোক-পাত হইলে যেমন অক্ষিপর্দ্দা ও অক্ষিস্নায়ুর মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালন করে, কৃত্রিম চক্ষুতেও অক্ষিপুট ও সেই রৌপ্যদণ্ডের মুক্তপ্রান্ত-সংলগ্ন তারের মধ্য দিয়াও তদ্রুপ তড়িৎপ্রবাহ দেখা গিয়াছিল।

পূর্ব্ববর্ণিত সহজ ও অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রটি, আচার্য্য বসুর দৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আবিষ্কারের প্রধান অবলম্বন। প্রাণিচক্ষু ও উক্ত কৃত্রিম চক্ষুর উপরে

আলোকের নানা খুঁটিনাটি কার্য্য পরীক্ষা করিলে, দৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যার মীমাংসা হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। এই প্রথায় পরীক্ষা করিয়া এবং পরীক্ষালব্ধ ফল প্রাণিচক্ষুর উপর আলোকের নানা কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া তিনি অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ
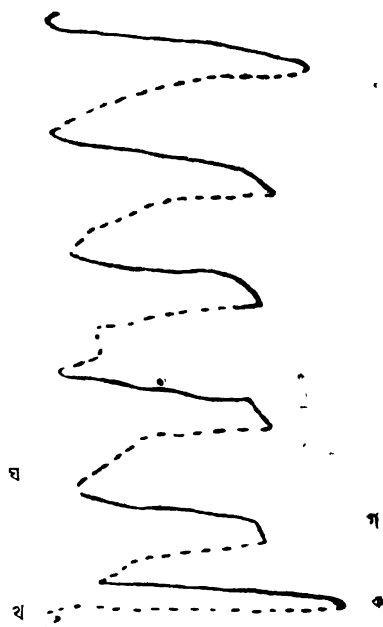
৩৯ চিত্র

করিয়াছেন। এত অনায়াসে এবং এপ্রকার সহজ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিতত্ত্বের নানা জটিল রহস্যের উদ্ভেদ দেখিয়া আজ সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাণিচক্ষে পতিত আলোক ও পূর্ব্ববর্ণিত কৃত্রিম চক্ষে পাতিত আলোক দ্বারা যে সকল বৈদ্যুতিক লক্ষণের বিকাশ হয়, আচার্য্য বসু তাহাদের ঐক্য কি প্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক। প্রাণিচক্ষে একই প্রকারের আলোকরশ্মি পুনঃপুনঃ নিয়মিতভাবে আঘাত করিলে, প্রতি আঘাতেই তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য বসুর এই প্রকার নিয়মিত আলোক-তাড়ন-জাত প্রাণিচক্ষুর সাড়ালিপি অঙ্কিত করিয়া এবং ঠিক সেই অবস্থায় কৃত্রিম চক্ষুর বৈদ্যুতিক প্রবাহ-পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিয়া, অবিকল একই সাড়ালিপি পাইয়াছেন।

চিত্রগুলি দেখিলে পাঠক বক্তব্যটা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ৩৯শ চিত্রটি প্রাণিচক্ষুর উপর পতিত আলোকোৎপন্ন সাড়ার ছবি। ছয় বার নিয়মিতভাবে আলোকপাত হওয়াতে, প্রতি বারে কি প্রকার বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উৎপত্তি ও লয় হইয়াছিল, চিত্রের ছয়টি তরঙ্গরেখা দ্বারা পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। এই শ্রেণীর চিত্রে কখ, গঘ ইত্যাদি স্থূল রেখাগুলির দৈর্ঘ্য ও ভূমির সহিত তাহাদের অবনতি তুলনা করিলে, প্রত্যেক আলোকপাতে, কত সময়ে, কি পরিমাণে, তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে। চিত্রে কখ-রেখা গঘ অপেক্ষা দীর্ঘতর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, প্রথম আলোকপাতে যে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয় আলোকপাতে তদপেক্ষা অল্প তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে। গঘ-রেখা যদি কখ অপেক্ষাও লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কগ-ভূমি-রেখার সহিত বৃহত্তর কোণ উৎপন্ন করিত, তাহা হইলে পাঠক বুঝিতেন, দ্বিতীয় আলোকপাত-জাত প্রবাহ, প্রথম প্রবাহটি অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর, প্রবাহ কি প্রকারে ক্রমে লয় পাইয়া চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করে, নিম্নগামী সূক্ষ্ম রেখাগুলি

দ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে। যে রেখা যত হেলিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহার উৎপাদক তড়িৎ প্রবাহ তত অধিক সময়ে লয় পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে।
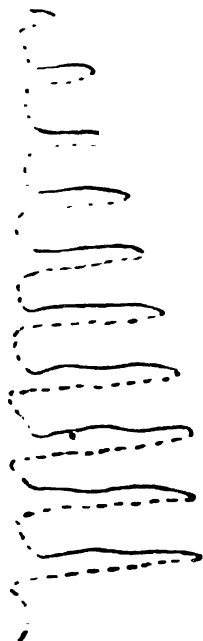
৪০শ চিত্র

৪০শ চিত্রটি সেই রৌপ্যনির্ম্মিত কৃত্রিম চক্ষে পতিত আলোক হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের সাড়ালিপি। পাঠক উভয় চিত্রের অদ্ভুত ঐক্য দেখুন। আলোকপাতের কাল ও তদুৎপন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে একটা অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। প্রাণিচক্ষুতে একই আলোক যথাক্রমে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সেকেণ্ড ধরিয়া পাতিত কর, এই সকল আলোকতাড়নায় সমান সাড়া

দেখিতে পাইবে না। কালবৃদ্ধির সহিত সাড়া প্রথমে বৃদ্ধি পাইয়া এমন একটি সীমায় উপস্থিত হইবে যে, তখন সময় বাড়াইলেও সাড়া অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া যাইবে। ইহার পরও কালবৃদ্ধি করিতে থাকিলে চক্ষু অবসন্ন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু সাড়া দিতে থাকিবে। কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ালিপিতে কাল ও সাড়ার পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ অবিকল ধরা পড়িয়াছে। ৪১শ ও ৪২শ চিত্রে প্রাণী ও কৃত্রিমচক্ষুর পূর্ব্ববর্ণিত সাড়ার ছবি। চিত্রের নিম্নস্থ সংখ্যাগুলি দ্বারা আলোকপাতের কাল এবং তাহাদের প্রত্যেকের উপরকার তরঙ্গরেখা দ্বারা তত্তৎকালের সাড়া-পরিমাণ সূচিত হইতেছে। কালসহকারে সাড়ার পরিবর্ত্তন যে, প্রাণী ও কৃত্রিম চক্ষুতে অবিকল এক, তাহা পাঠক চিত্রদ্বয়ে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আলোকপাত কাল আট সেকেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দশ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত স্থায়ী করিলেও উভয়ের সাড়া যে আর বৃদ্ধি পায় না, পাঠক তাহাও চিত্রদ্বয় তুলনা করিলে বুঝিবেন।

সুদীর্ঘ কাল অবিচ্ছিন্ন আলোকপাত দ্বারা প্রাণিচক্ষুর সাড়া চরম সীমায় উপনীত হইলে পর যদি আলোকপাত হঠাৎ রহিত করা যায়, তাহা হইলে আর এক প্রকার বৈদ্যুতিক লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে। আচার্য্য বসু ইহাকে After oscillation বা পরান্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৪২শ চিত্রের শেষ অংশে দীর্ঘকাল আলোকপাত-জনিত যে তরঙ্গ-রেখাগুলি আছে, পাঠক তাহার মূলদেশে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, ইহার কতকগুলিতে নিম্নগামী সূক্ষ্মরেখা স্বাভাবিক অবস্থজ্ঞাপক ভূমিরেখাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমে আবার ভূমিরেখার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাই পুনরান্দোলনের সূচক। আচার্য্য বসু বলেন,—বহুক্ষণ অলোক উন্মুক্ত থাকায় চক্ষুর অণুসকল যখন বিকৃত হইয়া পড়ে, সেই সময় হঠাৎ আলোকপাত বোধ করিলে প্রত্যেক অণুরই প্রকৃতিস্থ

হইবার জন্য একটা চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার আধিক্যেই তাহারা স্বাভাবিক অবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়া সাড়ালিপিতে উক্ত লক্ষণ অঙ্কিত করে। প্রকৃত এবং কৃত্রিম চক্ষুতে আচার্য্য বসু অবিকল পূর্ব্বোক্ত পুনরান্দোলন আবিষ্কার করিয়াছেন। আণবিক-বিকৃতি-জাত এই
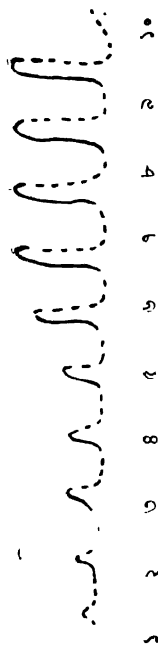
৪১শ চিত্র

৪২শ চিত্র

অনিয়মিত সাড়ার ফলে প্রাণীর যে দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

প্রাণী মরণোন্মুখ বা মৃত হইলে তাহাদের চক্ষুর অণুসকল বিকৃত হইয়া পড়ে; কাজেই, আলোকপাত করিলে যে বৈদ্যুতিক লক্ষণ বিকাশ পায়,
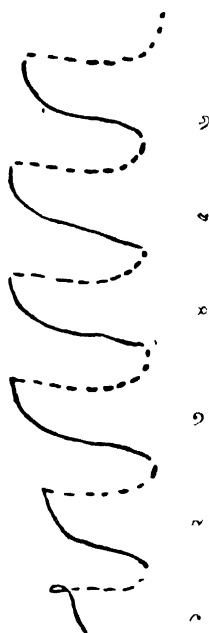
তাহা সুস্থ চক্ষুর সাড়ার সহিত মিলে না। আচার্য্য বসু সুকৌশলে কৃত্রিম চক্ষুর আণবিক বিকার উপস্থিত করাইয়া ঠিক গলিত চক্ষুর সাড়ালিপির অনুরূপ রেখাচিত্র পাইয়াছেন।

প্রাণিচক্ষে আলোকপাত করিয়া হঠাৎ সেই আলোক রোধ করিলে, কখন কখন সেই পূর্ব্বের আলোকজাত বৈদ্যুতিক প্রবাহ যথানিয়মে হ্রাস না হইয়া ক্ষণকালের জন্য প্রবলতর হইয়া পড়ে। কুনে (Kuhne) এই ব্যাপারের সহিত পরিচিত ছিলেন। আচার্য্য বসু তদবস্থ কৃত্রিম চক্ষে বৈদ্যুতিক সাড়ার উক্ত উচ্ছৃঙ্খলতাও আবিষ্কার করিয়াছেন। ৩৯শ চিত্রের সাড়ালিপিতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শৈত্য-তাপাদিভেদে এবং আলোকের প্রাখর্য্য-অনুসারে চক্ষে যে পরিবর্ত্তন হয়, কৃত্রিম চক্ষে অবিকল তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাণিচক্ষু ও কৃত্রিমচক্ষুর উপর আলোকের কার্য্য অবিকল এক, এবং অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এই একতার ভঙ্গ দেখা যায় না। উভয় চক্ষুর এই ঐক্য অবলম্বন করিয়া, আচার্য্য বসু নানা দৃষ্টিবিভ্রমের উৎপত্তি-তত্ত্ব স্থির করিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সুকৌশলে কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণিচক্ষুর সহিত তাহার সাড়ার ঐক্য কি প্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। সেই কৃত্রিম চক্ষুরই কার্য্য পরীক্ষা করিয়া তিনি কি প্রকারে নানা দৃষ্টি বিভ্রমের উৎপত্তি-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই রৌপ্যময় কৃত্রিমচক্ষুর মধ্যে এবং তাহার বাহিরে সেই অক্ষিস্নায়ু-সদৃশ রৌপ্যদণ্ডে তার সংলগ্ন করিয়া তাহার বৈদ্যুতিক-সাড়া পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এখন পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, কৃত্রিম চক্ষুর উপরে যদি আলোকপাত না হয় এবং উভয়েরই আণবিক অবস্থা যদি সমান থাকে, তাহা হইলে তারে প্রবাহের অণুমাত্র চিহ্ন দেখা যাইবে না।* কিন্তু ভিতর-বাহিরের এপ্রকার সাম্যভাব প্রায়ই দেখা যায় না; এজন্য অতি সতর্কতার সহিত আলোক-পাত বা অপর বাহ্য উত্তেজনা রোধ করিলেও, অনেক সময় তার দিয়া ক্ষীণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিয়া থাকে। প্রাণিচক্ষুর অবস্থাও তাই,—অক্ষি পর্দ্দা ও চক্ষুস্নায়ুর ঠিক আণবিক সাম্যভাব প্রায় ঘটে না; কাজেই, একটা ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহ নিয়তই চক্ষুস্নায়ু বাহিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিতে থাকে। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ থাকিলেই তজ্জাত একটা দৃষ্টিজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, আমারা চক্ষু মুদ্রিত করিলে ঘোর অন্ধকার

* পদার্থের নানা অংশের আণবিক বৈষম্য যে বিদ্যুৎ-উৎপত্তির কারণ আচার্য্য বসু তাহা নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। আমরা অন্য অধ্যায়ে এ বিষয়টির বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

দেখি না,—চক্ষু বন্ধ রাখা সত্ত্বেও এক প্রকার ক্ষীণ আলোক (The Intrinsic Light of the Retina) যেন আমাদের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া থাকে। আচার্য্য বসু বলেন,—এই আভ্যন্তরীণ আলোকচক্ষুর নানা অংশের আণবিক-বৈষম্যজাত ক্ষীণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য্য।

কৃত্রিম চক্ষুতে অতি স্বল্পকাল-স্থায়ী কোন আলোকপাত করিলে, তদুৎপন্ন বিদ্যুতের বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না। আলোকপাত রহিত করার পর প্রবাহটা ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। তাহা ছাড়া, যদি পাতিত ক্ষণিক আলোকটা খুব উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলে বৈদ্যুতিক সাড়া সে প্রকার স্বল্পকাল স্থায়ী হয় না; তদুৎপন্ন বৈদ্যুতিক প্রবাহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল প্রবহমান থাকিয়া শেষে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। আচার্য্য বসু প্রাণিচক্ষুর উপর ক্ষণিক আলোকের অবিকল একই প্রকার কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি নাতিদীর্ঘ নলের এক প্রান্তে একখণ্ড কাচ সংলগ্ন করিয়া তাহার বাহির ভাগটা দীপশিখা দ্বারা কজ্জলাবৃত কর এবং তার পর কোন সূক্ষ্মাগ্র পদার্থ দ্বারা তাহার উপর যথেচ্ছ অক্ষর লিখ। লেখনী দ্বারা কজ্জল স্থানচ্যুত হওয়াতে কাচে স্বচ্ছ অক্ষর অঙ্কিত হইবে। এখন যদি সেই অংশে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া তাহার কজ্জললিপ্ত প্রান্তটাকে অতি অল্পক্ষণের জন্য কোন উজ্জ্বল আলোকের দিকে উন্মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে কাচের স্বচ্ছ অংশ দিয়া সেই ক্ষণিক আলোক দর্শকের চক্ষে আসিয়া পড়িবে। আলোকপাত মাত্রই চক্ষু মুদ্রিত করিলে দর্শক প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু আরও কিছুকাল চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলে উল্লিখিত কাচাঙ্কিত অক্ষরগুলিকে তিনি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে দেখিবেন। কিন্তু চক্ষুর এই অন্তর্দৃষ্টি অধিক কাল থাকে না; অক্ষরগুলি অল্পক্ষণের জন্য উজ্জ্বল থাকিয়া ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, কৃত্রিম চক্ষুতে পাতিত

ক্ষণিক আলোকের ন্যায়, পূর্ব্বোক্ত আলোক অতি অল্পকালস্থায়ী হওয়ায়; তজ্জাত বৈদ্যুতিক প্রবাহের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হয়। কাজেই, মূল আলোক নির্ব্বাপিত বা স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোকপাতে কৃত্রিম চক্ষে যে দীর্ঘকালব্যাপী প্রবাহ-উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আচার্য্য বসু প্রাণিচক্ষে অত্যুজ্জ্বল আলোকপাত করিয়া ঠিক তদনুরূপ কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ম্যাগ্নিসিয়ম-ধাতুচূর্ণ দ্বারা কৃষ্ণ কাষ্ঠফলকের উপর কয়েকটি অক্ষর রচনা করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ কর। ধাতুচূর্ণ অত্যুজ্জ্বল শিখায় অল্পকালের জন্য জ্বলিত থাকিবে। কিন্তু দর্শক ধোঁয়া ও উজ্জ্বলতার আধিক্যে অক্ষরগুলিকে তখন পড়িতে পারিবেন না। কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবামাত্র যদি দর্শক চক্ষু মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে অল্পক্ষণ পরে তিনি সেই অক্ষরগুলিকেই উজ্জ্বল অবস্থায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইবেন। *

সুদীর্ঘ আলোক-তাড়নায় চক্ষুর বিভিন্নাংশের আণবিক বিকার দ্বারা এবং আলোক রোধের পর অণুগুলির স্বভাব প্রাপ্তির অতিরিক্ত চেষ্টায় যে অনিয়মিত বৈদ্যুতিক সাড়া বা পরান্দোলনের (After-Oscillation) কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাণিচক্ষে কি প্রকার দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়, এখন দেখা যাউক। এই স্থলে আলোকরোধ মাত্র, স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল চেষ্টায় অণুগুলি

---

* একবার আমরা এই পদ্ধতিক্রমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছিলাম। গ্রহণকালে সূর্য্যগোলকের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করি। বলা বাহুল্য, ইহার অত্যুজ্জ্বলতায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই কিন্তু ইহার পরেই চক্ষু মুদ্রিত করায় খণ্ডিত সূর্য্যগোলককে কিয়ৎকালের জন্য স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।

বৈদ্যুতিক প্রবাহ শীঘ্র রোধ করিয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে। কাজেই, যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিপরীত দিকে স্বতঃই তাহাদের আর একটা আন্দোলন আসিয়া পড়ে এবং সূত্রলম্বিত গোলকের আন্দোলনের ন্যায় অণুসকল গমনাগমন করিয়া শেষে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য বসু পদার্থের অণুসকলের এই প্রকার আন্দোলনজাত তড়িৎপ্রবাহকে "পরান্দোলন" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। পাঠক একটি উজ্জ্বল আলোকের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে উক্ত আন্দোলনের কার্য্য বেশ বুঝিতে পারিবেন। চক্ষু বন্ধ করিবামাত্র ঘোর অন্ধকার সম্মুখে দেখা দিবে। পূর্ব্ব-আলোকপাত-জাত আণবিক বিচলন দ্বারা যে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল, চক্ষুর অণুগুলির স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল চেষ্টায় এখনকার আণবিক বিচলন ঠিক তাহার বিপরীত দিকে হয় বলিয়া, সেই প্রবাহও ক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই, চক্ষুর বৈদ্যুতিক সাম্যাবস্থায় ঘোর অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু পাঠক যদি কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট উজ্জ্বল আলোকের ছবি চক্ষু বুজিয়াও দেখিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য, স্বভাবপ্রাপ্তির অতিরিক্ত চেষ্টায় নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করার পর, পুনরায় স্বাভাবিক স্থানে আসিবার চেষ্টায় অণগুলির যে নূতন বিচলন হয়, উক্ত অস্পষ্ট ছবি তাহারই কার্য্য।

কোন উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত রাখিলে সেই পদার্থের যে আলোকময় ছবি ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়, তাহা আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই। পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণও এই দৃষ্টিবিভ্রম দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা ইহার একটা কারণও

স্থির করিয়াছিলেন। ইঁহারা বলিতেন,—উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখায়, আলোক অন্তর্হিত হইলেও সেই উত্তেজনার কতকটা চক্ষে থাকিয়া যায়; কিন্তু আলোক দর্শনে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় সে সময়ে আমরা ঐ উত্তেজনার কোন কার্য্যই দেখিতে পাই না। ক্লান্তির উৎপত্তিসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের দুইটি প্রচলিত সিদ্ধান্ত আছে। একদল পণ্ডিত বলেন,—শ্রম দ্বারা শরীরে একপ্রকার অবসাদজনক পদার্থের (Fatigue Substance) উৎপত্তি হয়, বিশ্রামসহকারে শোণিত-প্রবাহ দ্বারা সেই পদার্থ স্থানান্তরিত হইলে জীব আবার শ্রমক্ষম হইয়া পড়ে। আর একদল পণ্ডিত বলেন,—শ্রম শরীরের ক্ষয়সাধন করে এবং ক্ষয়ই শ্রান্তির কারণ। প্রাণীকে বিশ্রাম করিতে দাও, স্বাভাবিক শারীর কার্য্যে সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নূতন শ্রমভার বহনে উপযোগী দেখিবে। দৃষ্টিবিভ্রমটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা নির্ভুল হইলে,—বিশ্রামসহকারে চক্ষুর প্রকৃতিস্থ হওয়ার পরে অন্ধকারের মোচন হওয়াই সঙ্গত; কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যাপারে বিশ্রাম-লাভের পরও আমরা পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের আলোক ও অন্ধকারময় ছবির পুনঃপুনঃ বিকাশ দেখিতে পাই। এই বিসদৃশ ঘটনার কারণ উক্ত দৃষ্টিবিভ্রমের প্রচলিত ব্যাখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আচার্য্য বসু প্রচলিত সিদ্ধান্তের এই প্রকার আরও অনেক ভ্রম দেখাইয়া তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন।

জগতের অতি বৃহৎ আবিষ্কারগুলির মূলান্বেষণ করিলে অনেক স্থলেই এক একটা তুচ্ছ অবান্তর ঘটনাকে মহদাবিষ্কারের কারণ হইতে দেখা যায়। চক্ষুসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার সময়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ঐ প্রকার এক ক্ষুদ্র ব্যাপারে দৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটা মহদাবিষ্কার সাধন করিয়াছেন। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিই এই আবিষ্কারের বিষয়। উভয়

চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। বাম চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যখন প্রবল থাকে, দক্ষিণ চক্ষু তখন ক্ষীণশক্তি হইয়া বিশ্রাম করে; এবং পরমুহূর্ত্তে দক্ষিণ চক্ষু যখন বিগতশ্রম হইয়া দাঁড়ায় তখন দর্শনের ভার তাহার উপর দিয়া বাম চক্ষু বিশ্রামের অবকাশ লয়। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির এই পরিবর্ত্তন অতি ঘনঘন হইয়া থাকে, কিন্তু স্থুলতঃ উভয়ের সমবেত শক্তি অপরিবর্ত্তনীয় থাকিতে দেখা যায়।

৪৩শ (ক) ও ৪৩শ (খ) চিত্র

আচার্য্য বসুর আবিষ্কৃত ব্যাপারটি সহজে পরীক্ষা করিবার একটি সুন্দর উপায় আছে। ৪৩শ (ক) চিত্রাঙ্কিত রেখার ন্যায় বিপরীত দিকে হেলানো দুইটি স্থুল সরল রেখা কাগজে অঙ্কিত করিয়া সেটিকে ষ্টেরিয়োস্কোপ-(Stereoscope) যন্ত্রে সংযুক্ত কর। এই যন্ত্রে ফটোগ্রাফের ছবি যেমন উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া পড়ে, এখানেও ঐ হেলানো রেখাদ্বয় পরস্পরের উপরে পড়িবে, এবং ৪৩শ (খ) চিত্রস্থ ক্রুসের অনুরূপ একটি ছবি দর্শক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এখন যদি যন্ত্রটিকে আকাশের উজ্জ্বল আলোকের দিকে ধরিয়া দর্শক কিয়ৎকালের জন্য ছবিটিকে দেখিতে থাকেন, তবে সেই ক্রুসটিকে (Cross) সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবেন না,

উহার একটি রেখাকে কিয়ৎকালের জন্য খুব উজ্জ্বল ও অপরটিকে লুপ্তপ্রায় দেখিবেন এবং পরক্ষণেই ম্লানটিকে স্ফুটতর ও উজ্জ্বলটিকে ক্ষীণজ্যোতি হইতে প্রত্যক্ষ করিবেন।

দুইটি বিভিন্ন লেখার প্রতি যুগপৎ দুই চক্ষু ন্যস্ত রাখিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলে, পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারটির পরিচয় সহজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। একই সময়ে দুই চক্ষু একটা পৃথক্ লেখার উপর আবদ্ধ থাকায়, পাঠক কোনটিই পড়িতে পারিবেন না। কিন্তু ইহার পরই যদি চক্ষু মুদ্রিত করা যায়, তাহা হইলে পর্য্যায়ক্রমে সেই লেখারই এক একটিকে চক্ষুর সম্মুখে ক্রমান্বয়ে ফুটিয়া মিলাইতে দেখা যাইবে। এই জন্যই আচার্য্য বসু তাঁহার আবিষ্কার-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন—"মুক্তচক্ষে আমরা যাহা পড়িতে না পারি, চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহাই সহজপাঠ্য হইয়া পড়ে।"

যে সকল পদার্থ আমরা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে দেখি, কেবল তাহারই ছবির যে পুনরাবির্ভাব হয়, তাহা নহে। অজ্ঞাতসারে ও অন্যমনে দৃষ্ট পদার্থের ছবির পুনরাবির্ভাবও আচার্য্য বসু আবিষ্কার করিয়াছেন। দৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণাকালে তিনি একদিন একটি জানালার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার ছবির পুনরাবির্ভাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। ছবি যথারীতি কয়েক বার আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু পুনঃপুনঃপরীক্ষায় অক্ষি-পর্দ্দা অবসন্ন হইয়া পড়ায় শেষে বহুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে থাকিয়াও আর জানালার ছবি দেখিতে পান নাই, এবং তৎপরিবর্ত্তে চক্ষুর এক প্রান্ত হইতে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষের সুস্পষ্ট ছবি আবির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আচার্য্য বসু সেই গবাক্ষটির প্রতি পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় দৃষ্টিপাত করেন নাই এবং ইতিপূর্ব্বে সেটির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতেন না। বলা বাহুল্য, তিনি সেই পূর্ব্বের জানালাটি দেখিতে গিয়া নিশ্চয়ই গবাক্ষটিকেও অজ্ঞাতসারে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহাতেই শেষে সেই অজ্ঞান-দৃষ্ট পদার্থ

ছবি দ্বারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল। সুস্থ মানুষের বিভীষিকা—দর্শনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা শারীরবিদ্যায় পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাপারের সহিত বিভীষিকা দর্শনের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন।

কোন উজ্জ্বল পদার্থে কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত কবিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে দৃষ্ট বস্তুব ছবির যে আবির্ভাব-তিরোভাব হয়, তাহা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে দর্শক প্রত্যেক পুনরাবির্ভাবের সহিত ছবিটিকে ক্রমেই ম্লানতর হইতে দেখিবেন এবং অবশেষে সেটি এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে যে, তখন ছবি দেখা যাইতেছে কি পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মৃতি মনে জাগিতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে ঠিক করা যাইবে না। আচার্য্য বসু এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়ের এই পবান্দোলন-জাত সাড়ার সহিত সম্ভবতঃ স্মৃতির সাড়ার কোন পার্থক্য নাই। দৃষ্ট পদার্থের ছবির পুনরাবির্ভাব ও বিলোপের ন্যায় স্মৃতিরও তদনুরূপ আবির্ভাব ও লোপ দেখা গিয়া থাকে; সুতরাং উভয়েই একই শ্রেণীর প্রাকৃতিক ঘটনা।

আচার্য্য বসু কেবল আবিস্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার প্রত্যেক আবিষ্কারের সহিত যে শত শত ব্যাপার জড়িত রহিয়াছে, তাহাদেরও আভাস দিয়াছেন। সেই সকল আভাসের প্রত্যেকটির আলোচনা ও অনুসন্ধান একজন বৈজ্ঞানিকের জীবন-ব্রত হইলেও, অনুমিত ব্যাপার-গুলির মীমাংসা হয় কি না সন্দেহ। শত অবান্তর কার্য্য ও বাধাবিঘ্নের মধ্যেও ধ্যানমগ্ন মুনির মত তিনি গবেষণানিরত ছিলেন। একক আচার্য্য বসুর নিকট হইতে জড়বিজ্ঞান যাহা পাইয়াছে, তাহা যে অমূল্য, তাহার সন্দেহ নাই।

ফোটোগ্রাফি

ফোটোগ্রাফি একটি সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ ডেভি ও ওয়েজ্‌উড্ আলোক-সাহায্যে পদার্থের নিখুঁত ছবি আঁকিবার সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে শত বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে, ফোটোগ্রাফি আজকালকার একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুদূরবর্ত্তী গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থা ও গতিবিধি বৃহৎ দূরবীণ দিয়াও পরিদর্শন করা অসম্ভব। ফোটো গ্রাফি এই ব্যাপারে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছে। আজ কাল পণ্ডিতগণ কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় গ্রহনক্ষত্রাদির ছবি তুলিয়া তাহাদের অবস্থান, গতিবিধি ও গঠনোপাদান পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতেছেন। জ্যোতিষ্ক পরিদর্শন ব্যাপারে স্পেক্ট্রোস্কোপ্ ও দূরবীণের ন্যায় ফোটোগ্রাফের ক্যামেরা প্রকৃতই একটা অপরিহার্য্য যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ফোটোগ্রাফির খুব উন্নতি হইয়াছে, সত্য, এবং ইহার সাহায্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা যে ক্রমেই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাও ঠিক, কিন্তু পদার্থের কোন্ বিশেষ ধর্ম্মে কেবল আলোকপাত দ্বারা চিত্র অঙ্কিত হইয়া পড়ে, তাহা আজও কেহ আবি-ষ্কার করিতে পারেন নাই। নানা পরীক্ষাদি করিয়া যে দুই একজন আধুনিক পণ্ডিত এ সম্বন্ধে মতামত প্রচার করিয়াছেন, তাহা এত অসম্পূর্ণ যে, তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপন চলে না। ভারতের গৌরব বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রত্যক্ষ পরীক্ষাদি দ্বারা ফোটোগ্রাফ্-তত্ত্বের পূর্ব্বপ্রচা-রিত মতবাদগুলির অসারতা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বিষয়টার

মূল ব্যপার কোথায়, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত ফোটোগ্রাফি-বিদ্যা প্রাচ্য বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য বসুর মৌলিক গবেষণায় পূর্ণতা লাভ করিতে চলিযাছে।

ফোটোগ্রাফির নাম শুনিলেই টিপয়ের উপরকার একটি কাচযুক্ত ক্ষুদ্র বাক্স ও তাহার মধ্যে সেই রাসায়নিক-পদার্থ লেপিত কাচফলক আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ব্যাপারটিও মোটামুটি তাই বটে। সেই ঢাকা বাক্সের সম্মুখস্থ স্থূলমধ্য কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া বহিঃস্থ পদার্থের আলোকময় ছবি রাসায়নিক-পদার্থ-লেপিত কাচফলকে পড়িলেই, আলোক দ্বারা সেই কাচলিপ্ত পদার্থের কি একটা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন এ সময়ে চোখে ধরা যায় না, এই জন্য সেটাকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে কাচখানিকে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ-মিশ্র জলে ডুবাইবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রক্রিয়ায় কাচের আলোক-সংযুক্ত অংশটার পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও ফুটিয়া উঠে। এই কাচফলককে ফোটোগ্রাফির ভাষায় নিগেটিভ (Negative) বলে। ফোটোগ্রাফার্-গণ এখন এই ছবি-অঙ্কিত কাচফলকের সাহায্যে রাসায়নিক কাগজের উপর যত ইচ্ছা আলো-ছায়াময় ছবি মুদ্রিত করিয়া লইতে পারেন।

এই ত গেল সাধারণ ফোটো তুলিবার কথা। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি উপায়ে ছবি তুলিবার কথা আমরা জানি, এ গুলিতে সূর্য্যা-লোক-সংস্পর্শের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। রন্‌জেনের বৈদ্যুতিক কিরণ এবং রেডিয়ম্ বা ইউরেনিয়মের রশ্মি কাচফলকে পড়িলে, ঠিক সূর্য্যকিরণ-পাতেরই কার্য্য করে। তা ছাড়া, ফোটাগ্রাফের কাচে কোন প্রকার বাহ্য আঘাত-অপঘাত বা বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সুকৌশলে প্রয়োগ করিতে পারিলেও একই ফল পাওয়া যায়।

পদার্থ বিশেষের উপর আলোক বা অপর কোন বাহ্যশক্তি পতিত হইলে তদ্দ্বারা পদার্থের কি পরিবর্ত্তন ঘটে, জিজ্ঞাসা করিলে, "পরিবর্ত্তনটা সম্পূর্ণ রাসায়ানিক" বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ নিরস্ত হন। রাসায়নিক-পদার্থ-মিশ্র জলে ফোটোগ্রাফের কাচফলক ডুবাইলে, তাহার আলোক-প্রাপ্ত অংশ ও আচ্ছন্ন অংশের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ফুটিয়া উঠা যে একটা প্রত্যক্ষ রাসায়নিক ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ছবি ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বে কাচের যা অবস্থা থাকে, সেটাও কি রাসায়নিক ব্যাপার? এই অবস্থায় কাচলিপ্ত পদার্থে কোন বাহ্য পরিবর্ত্তনই ত দেখা যায় না অথচ বহুকাল পূর্ব্বে আলোকে উন্মুক্ত থাকা হেতু কাচে যে একটু গূঢ় পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, রাসায়নিক মিশ্র জলে ডুবাইলে সেটিকেই ত ফুটিয়া উঠিতে দেখি। পদার্থের কোন্ বিশেষ অবস্থায় সেই গূঢ় পরিবর্ত্তন হয়, জিজ্ঞাসা করিলে, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণের নিকট কোন সদুত্তরই পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া বাহ্য, আঘাত ও বৈদ্যুতভাড়নাদি দ্বারা যে গূঢ়চ্ছবি অঙ্কিত হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও ইঁহাদিগকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা যায়।

আচার্য্য বসু বলেন, ফোটোগ্রাফিক্ কাচের আলোক-পাতিত অংশের যে পরিবর্ত্তনকে বৈজ্ঞানিকগণ কেবলমাত্র রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বলিয়া আসিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটা আণবিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সূর্য্যালোকের উৎপাদক ঈথরতরঙ্গ ফোটো-গ্রাফের কাচের উপর পড়িয়া কাচলিপ্ত পদার্থে ধাক্কা দিতে থাকিলে আলোকপাতিত অংশের অণুগুলি পূর্ব্বে যে প্রকার সজ্জিত ছিল, এখন আর সে প্রকার থাকিতে পারে না; কাজেই, আলোকপ্রাপ্ত অংশের আণবিকবিন্যাস অপরাংশের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়। আণবিক বিন্যাসের এই পার্থক্যটা সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণযন্ত্রের

সাহায্যেও ধরা অসম্ভব। এই জন্য ফোটোগ্রাফের কাচে কোন্ অংশ আলোকে উন্মুক্ত থাকিয়া বিকৃত হইয়াছে এবং কোন্ অংশই বা অবিকৃত আছে, তাহা আমরা কেবল কাচ পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিতে পারি না। কোন পদার্থের আণবিক-বিন্যাসের পরিবর্ত্তন ধরিতে হইলে, তাহার উপর অপর পদার্থের রাসায়নিক কার্য্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। ফোটোগ্রাফের রাসায়নিক পদার্থমিশ্র জলে ডুবাইলে আমরা ইহার আলোকপ্রাপ্ত অংশকে যে পৃথক্ হইয়া ফুটিতে দেখি, তাহা কেবল সেই ঈথর-তরঙ্গজাত আণবিক বিকৃতির ফল। বাহ্য-আঘাত, বৈদ্যুত-রশ্মি-সংস্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা পদার্থের যে গূঢ় পরিবর্ত্তন হয়, তাহার কারণও আচার্য্য বসুর মতে আণবিক-বিন্যাসের বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আজকাল নূতন মতবাদের অভাব নাই। কোন একটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া দাঁড়াইলে, শত শত মতবাদ দ্বারস্থ হইয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মাথা ঘুরাইয়া দেয়। কিন্তু মতবাদগুলির ইতিহাস খুঁজিলে প্রত্যেকটিরই মূলে নিছক অনুমান বা কোন একটা আজ্‌গবী কল্পনা ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, আচার্য্য বসুর আবিষ্কারগুলি এই শ্রেণীভুক্ত নয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নানা পণ্ডিত-সম্মিলনীর সম্মুখে প্রদর্শিত পরীক্ষাদি দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক উক্তির অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বৈদেশিক পণ্ডিতগণের শত কূট-প্রশ্নে আচার্য্য বসুর যুক্তি ও মীমাংসার অণুমাত্র স্খলন হয় নাই।

আলোক ও বৈদ্যুত-রশ্মির তাড়না এবং বাহিরের আঘাতাদিতে পদার্থের যে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা ঠিক ধরিবার উপায় কি, এখন দেখা যাউক। বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া আণবিক বিকার ধরিবার যে উপায়ের কথা পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে, তাহা একটা নির্ভুল উপায় সন্দেহ নাই ; কিন্তু সকল স্থলে তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। আচার্য্য বসু আণবিক বিকার ধরিবার একটা অতি সহজ ও সূক্ষ্ম উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এটিকে সকল স্থলেই সহজে কার্য্যোপ-যোগী করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন পদার্থের এক অংশের আণবিক-বিন্যাস বাহ্য আঘাত-উত্তেজনায় বিকৃত হইয়া পড়িলে, পদার্থটির বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে একটা তড়িৎ-প্রবাহ স্বতঃই চলাফেরা আরম্ভ করে। এই দুই অংশ তড়িন্মাপক যন্ত্র ও তারের দ্বারা সুকৌশলে সংযুক্ত করিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিলে, পদার্থটির আণবিক-বিন্যাস কতদূর বিকৃত হইয়াছে, বুঝা যায়। আচার্য্য বসু ইহা ছাড়া বিদ্যুৎ-পরিচালনের বাধা উৎপাদনকেও আণবিক বিকারের আর একটা লক্ষণস্বরূপ ধরিয়াছেন। মনে কর, একটি পদার্থের দুই প্রান্তে তার সংযুক্ত করিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হইতেছে। এখন যদি কোন প্রকার বাহ্য-আঘাত-অপঘাতে পদার্থের আণবিক-বিন্যাস ভঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে বিদ্যুৎ-প্রবাহটিকে স্পষ্ট মন্দীভূত হইতে দেখা যাইবে। উত্তেজনা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে পদার্থের যে অণুগুলি বেশ লঘু ও সংযত অবস্থায় থাকিয়া বিদ্যুৎকে চলিবার পথ দিতেছিল, এখন তাহারাই বাহ্য আঘাতে স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া প্রবাহের গতিরোধ করিতে থাকিবে।

পাঠকগণের অনেকেই বোধহয় জানেন, রসায়নবিদ্‌গণের নিকট গ্রাফাইট, কয়লা ও হীরক একই জিনিস। গ্রাফাইটের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা কর, প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকিবে। তার পর সেই প্রবাহকেই যদি হীরকের মধ্য দিয়া চালাও, তবে প্রবাহটিকে

স্পষ্ট মন্দীভূত হইতে দেখিবে। গ্রাফাইটের অণুসকল নিয়মিত ও লঘুভাবে সজ্জিত থাকে, সেই জন্য ইহাতে বিদ্যুৎ চালনাব কোনও বাধা হয় না; কিন্তু হীরকের আণবিক-বিন্যাস জটিল, কাজেই ইহাদের অণুসকল প্রবাহ-পথে বাধা জন্মায়। এই প্রকাবে কেবল বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পদার্থের আভ্যন্তরীণ আণবিক অবস্থার পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন, এবং এই প্রবাহ-পরিবর্ত্তনটা যে কেবল বিকৃত আনবিক বিন্যাসের ফল, তাহাও তিনি পবীক্ষা সিদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন।*

আলোক ও বৈদ্যুতিক রশ্মিব সংঘাত বা বাহ্য আঘাত উত্তেজনায় কতকগুলি পদার্থের যে আণবিক বিচলনের কথা বলা হইল, তাহা কেবল সেই সকল পদার্থেরই বিশেষ ধর্ম্ম নয়। আচার্য্য বসু বাহ্য উত্তেজনায় পদার্থ মাত্রেরই আণবিক-বিন্যাসের অল্পাধিক বিচলন দেখিতে পাইয়াছেন। আলোক-রশ্মিপাতে ফোটোগ্রাফের কাচস্থিত ত্বকটির আণবিক বিচলন অধিক হয়; তজ্জন্য আলোকের এই কার্য্যটি সহসা আমাদের নজরে পড়ে। কাজেই, আমরা এটিকে ফোটোগ্রাফের কাচের একটা বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলি। একখণ্ড বাঁশের কঞ্চির দুই প্রান্ত ধরিয়া সেটাকে অল্প মোচড় দিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহার আকারের ক্ষণিক পরিবর্ত্তন হইয়া আবার তাহা সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আলোক বা বিদ্যুৎ-রশ্মিপাতে সাধারণ পদার্থের যে আণবিক বিকার হয়, তাহাও কতকটা তদ্রূপ। যে কোন পদার্থে আলোক বা বৈদ্যুতিক রশ্মিপাত কর, তৎক্ষণাৎ তাহার আণবিক বিকার উপস্থিত হইবে। তার পরে

* অবিমিশ্র ফস্‌ফরসের যে দু'টি রূপান্তর দেখা যায়, তাহাও বিভিন্ন আণবিক-বিন্যাসের ফল।

সেই রশ্মি রোধ কর, পূর্ব্বোক্ত কঞ্চির ন্যায় পদার্থটিও পূর্ব্বের আণবিক সহজ অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন, মোচড়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে, হাত ছাড়িয়া দিবামাত্র কঞ্চিটি পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় না। বহুকাল ধনুকাকারে থাকিয়া সেটি ক্রমে সোজা হইয়া আসে। ফোটোগ্রাফের কাচের আণবিক বিকারকে এই প্রকার সবলে মোচড়ান কঞ্চির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ঋজু অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যেমন ইহাকে অনেকক্ষণ ধনুকাকারে বিকৃত থাকিতে দেখা যায়, ফোটোগ্রাফির কাচ-স্থকে আলোকময় ছবি পতিত হইলে তাহার আণবিক বিন্যাসও সেই প্রকার বহুকাল বিকৃত অবস্থায় থাকে এবং প্রচুর অবসর দিলে বক্র কঞ্চির ন্যায় কাচও যথাসময়ে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়।* কঞ্চিটিকে চিরকাল ধনুকাকারে রাখিতে হইলে যে প্রকার কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যক হয় কাচ-পাতিত অদৃশ্য ছবিটি অণুর স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তির সহিত যাহাতে লোপ পাইয়া না যায় তজ্জন্য কাচফলকটিকেও সেই প্রকার রাসায়নিক পদার্থ-মিশ্র জলে ডুবান আবশ্যক। এই উপায়ে স্থায়ীভাবপ্রাপ্ত বক্র কঞ্চির ন্যায় কাচেরও আণবিক বিকৃতি চিরস্থায়ী হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানিও ফুটিয়া উঠে।

---

* এ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই জানিতাম, ফোটোগ্রাফের কাচের উপর এক বার আলোকময় ছবি ফেলিলে, চিত্রটি কাচফলকে চির-অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং যে কোন সময়ে সেটিকে নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক-পদার্থ মিশ্র জলে ডুবাইলে পূর্ব্বের ছবি ফুটিয়া উঠে। আচার্য্য বসুর আবিষ্কার দ্বারা আমাদের এই বিশ্বাসের অমূলকতা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। ইনি দেখিয়াছেন,—কাচখণ্ডের বিকৃত অংশকে প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য সময় দিলে, তাহাতে আর আলোকপাতের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এখন কাচটিকে শতবার সেই রাসায়নিক মিশ্রজলে ডুবাও, ছবি কোনক্রমেই ফুটিবে না। আচার্য্য বসু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার এই সকল আবিষ্কারের সার্থকতা দেখাইয়াছেন।

পাঠকগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, মৃদু চাপ বা আঘাতাদি দ্বারা কোন জিনিসের আকার বিকৃত করিতে থাকিলে প্রথমে সেটি সহজে এবং অল্পকাল মধ্যে পূর্ব্বের আকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পরে চাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে তাহার অনেকটা সময় আবশ্যক হইয়া পড়ে। তার পরও আঘাত বা চাপ বৃদ্ধি কর, সেটা আর পূর্ব্বের অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না—বিকৃত অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে। একটা লোহার শিক লইয়া পরীক্ষা করিলে কথাটা সহজে বুঝা যাইবে। শিকের দুই প্রান্ত ধরিয়া অল্প মোচড় দাও, সেটির আকার বিকৃত হইয়া পড়িবে এবং মোচড় রহিত করিবামাত্র স্প্রিংয়ের মত লাফাইয়া পূর্ব্বের আকার গ্রহণ করিবে। কিন্তু মোচড়ের বল ক্রমে বৃদ্ধি করিতে থাকিলে সেটি এত অল্পকাল মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না, এবং শেষে মোচড়ের মাত্রা অত্যন্ত বাড়াইলে চিরকালের জন্য সেটি বক্রাকারেই থাকিয়া যাইবে। এখন শিকটি প্রকৃতিস্থ করিতে হইলে অপর বাহ্যশক্তি প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

লৌহ-শিকের ন্যায় পদার্থমাত্রেরই স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ-প্রাপ্তির চেষ্টার এক একটা সীমা আছে। সেই চেষ্টার সীমা অতিক্রম করিয়া পদার্থের আকার বিকৃত করিলে, বিকার চিরস্থায়ী হইয়া যায়। আচার্য্য বসু দেখিয়াছেন,—আলোকপাত বা বৈদ্যুতিক রশ্মি প্রভৃতি দ্বারা পদার্থের যে আণবিক বিকার হয়, তাহার অবস্থাও কতকটা তদ্রূপ। আণবিক বিকার প্রচুর হইলে, চরম চেষ্টা দ্বারাও কোন জিনিস তাহার স্বাভাবিক আণবিক বিন্যাস আর ফিরিয়া পায় না। স্থায়িভাবে বক্র শিকটীকে প্রকৃতিস্থ করিবার

জন্য যেমন তাপ বা বাহ্য-বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা দেখা যায়, স্বাভাবিক আনবিক অবস্থায় ফিরাইতে ইহাতেও সেই প্রকার তাপাদি প্রদানের দরকার হইয়া পড়ে। একখণ্ড সাধারণ কাচের উপর একটী বৃত্ত বা চতুষ্কোণাকার ধাতুময় জিনিস রাখিয়া, সেটাকে বিদ্যুৎ-যুক্ত কর। ধাতু-অধিকৃতস্থানাস্থিত কাচের আনবিক-বিন্যাস বিদ্যুৎপ্রভাবে বিকৃত হইয়া যাইবে। চক্ষু বা কোন যন্ত্রের সাহায্যে এই বিকার ধরা পড়িবে না বটে, কিন্তু কাচফলকটীকে জলীয় বাষ্পে উন্মুক্ত রাখিলে কাচের বিকৃত অংশে বাষ্প জমিয়া সেই ধাতবপদার্থের ছবি ফুটাইয়া তুলিবে। কাচের এই অবস্থার স্থায়িত্ব ইহার আনবিক বিকারের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতিস্থ হইবার নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া আণবিক বিন্যাস ভঙ্গ হইয়া থাকিলে, কাচফলকটী চিরকালই সেই অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। তাপ-প্রয়োগাদি বাহ্য শক্তির সাহায্য ব্যতীত সে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবে না। কিন্তু আণবিক-বিন্যাসের অল্প বিচলন হইয়া থাকিলে অল্পকাল মধ্যেই সেটী পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ধাতুচূর্ণের কোন দুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালন করিলে, প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকে। সেই চূর্ণে এখন বৈদ্যুতিক রশ্মিপাত কর, পূর্ব্বের প্রবল প্রবাহটিকে স্পষ্ট পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিবে। গুঁড়াগুলিকে একটু ঝাঁকাইয়া বা তাপ দিয়া লও; এখন আর ইহাতে প্রবাহ গমনাগমনের কোন বাধাই দেখিবে না। ধাতুচূর্ণের এই বিশেষ ধর্ম্মটি আজকালকার তারহীন টেলিগ্রাফিতে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক রশ্মিপাতে কি প্রকারে ধাতুচূর্ণের প্রবাহ পরিচালনক্ষমতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এ পর্য্যন্ত তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারেন নাই। আচার্য্য বসু ইহার প্রকৃত ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া-

ছেন। তিনি দেখাইয়াছেন,—বৈদ্যুতিক রশ্মি দ্বারা ধাতুচূর্ণের আণবিক-বিন্যাস বিকৃত হইয়া যায়, এজন্য তাহার ভিতরকার বিদ্যুৎ-প্রবাহের বেগ পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু গুঁড়াটাকে একটু ঝাঁকাইয়া লইলে বা গরম করিয়া রাখিলে তাহার আণবিক অবস্থাটা স্বভাবে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পায়। কাজেই, তখন পূর্ব্ব-প্রকারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে। আচার্য্য বসুর মতে—আলোক দ্বারা ফোটো-গ্রাফের কাচে ছবি-অঙ্কন, এবং বৈদ্যুতিক রশ্মি দ্বারা ধাতুচূর্ণের প্রবাহ পরিচালন-শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি একই প্রাকৃতিক ব্যাপার।

পাঠকগণ বোধ হয় জানেন, আলোকের পরিমাণ ও আলোক-প্রদানের কালের উপর ফটোগ্রাফ-ছবির ভালমন্দ, অনেকটাই নির্ভর করে। ফোটোগ্রাফের যে কাচে যত নিয়মিত আলোক পড়ে এবং যেখানি যত নিয়মিত কাল ধরিয়া আলোকে উন্মুক্ত থাকে, তাহার ছবিও ততই সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত হয়। অস্থির আলোকে ছবি অস্পষ্ট হয়; তাহা ছাড়া আলোকটা কখন ক্ষীণ এবং কখন উজ্জ্বল হইয়া আসিলেও ছবি ভাল উঠে না। আচার্য্য বসু বহু পরীক্ষাদি দ্বারা ফোটোগ্রাফের কাচের উপর অস্থির আলোকের কার্য্যের অনেক রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এ আবিষ্কারটি কি এখন দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আলোকরশ্মি কাচের কোন অংশে পড়িলে, তদ্দ্বারা সেই স্থানের আণবিক-বিন্যাস ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু আলোকপাত হঠাৎ বন্ধ করিবামাত্র, সেই ভঙ্গ আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পায় না, বরং অণুসকল প্রাকৃতিক অবস্থার পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা আরম্ভ করে। এই সময়ে সেই একই অংশে আবার আলোকরশ্মি পতিত হইলে আণবিক-বিন্যাসের নূতন বিচলন আরম্ভ হয়। এই নূতন বিচলনটা যদি পূর্ব্বেকার বিচলনের দিকেই হয়, তবে আলোক-

পাতরাহিত্য দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য অণুসকলের যে একটা গতি হইয়াছিল, সেটি নষ্ট হইয়া আণবিক বিন্যাস বিষম জটিল হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও অস্পষ্ট হইয়া উঠে। নূতন আলোক-পাত-জাত অণুর বিচলন পূর্ব্ব বিচলনের প্রতিকূলে হইলেও ছবি অস্পষ্ট হয়। কারণ, এখানে নূতন বিচলনটা অণুসকলের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তিরই সহায়তা করে, কাজেই, যে আণবিক বিকার দ্বারা পূর্ব্বে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, সেটা আর অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না।

একটা ছোটখাট উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। রজ্জুবদ্ধ কোন একটি ভারী বস্তুর পারদোলনকে আলোকপাত-জনিত অণুর বিচলনের সমান ধরা যাউক। এখানে সেই আবদ্ধ জিনিষটার চরম উর্দ্ধে উঠার পর নীচের দিকে নামিবার চেষ্টা, যেন আলোকপাত-রাহিত্য-হেতু অণুর স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টার সমান হইল। এখন জিনিষটা দুলিতে দুলিতে চরম উর্দ্ধে উঠিয়া নামিতে আরম্ভ করিলে যদি সেটাকে আরও উপরে উঠাইবার বা নীচে নামাইবার জন্য একটা ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহা হইলে জিনিষটা যেমন উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে না পারিয়া এক বিকৃত গতিতে চলিতে থাকে, আলোক রহিত হওয়ার পর নূতন আলোকপাত দ্বারা ফোটোগ্রাফ কাচের অণুর যে বিচলন হয়, তাহাও কতকটা তদ্রূপ। পূর্ব্বের আলোক রহিত হইবা-মাত্র অণুসকল প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য আলোকপাত জাত বিকৃত বিন্যাসের বিপরীতে সঞ্চলন আরম্ভ করে। এখন পুনরায় আলোকপাত হইবামাত্র একটা নূতন গতি আসিয়া ইহাতে যোগ দেয়, কাজেই সমবেত গতিতে কোন নিয়ম রক্ষিত না হওয়ায় আণবিক-বিন্যাসে গোলযোগ উপস্থিত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও অস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া যায়। স্থির

সমভাবে আগত আলোকপাত দ্বারা আণবিক বিচলন একই দিকে নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে ; কাজেই, সে স্থলে আণবিক-বিন্যাসের কোন গোলযোগই হইতে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া পড়ে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আলোকময় ছবির অবিকল চিত্র উঠাইয়া রাখিবার শক্তি যে কেবল ফোটোগ্রাফের কাচলিপ্ত পদার্থগুলিরই আছে, তাহা নয়। এই শক্তিটা জড়পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি,—জগতের পদার্থমাত্রেরই অণুসকল আলোক বা বিদ্যুৎশক্তির সংযোগে বিচলিত হইয়া থাকে। ফোটোগ্রাফের কাচস্থিত পদার্থের অণুসকলের বিচলন অধিক এবং চিত্রাঙ্কন পক্ষে উপযোগী ; তাই সেটা হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে, এবং তাহাকে আমরা কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পদার্থেরই বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া ফেলি।

নানা বিচিত্র ও জটিল ঘটনার মধ্যে একটা সহজ ও প্রত্যক্ষ নিয়ম দেখানো আচার্য্য বসুর আবিষ্কারগুলির একটা বিশেষ ধর্ম্ম। জড়জগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে যে একটা বৃহৎ নিয়ম ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান আছে, তাহার মহিমা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রত্যেক আবিষ্কার দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে। ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধীয় আবিষ্কারেও তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সেই অনন্যসুলভ বিশেষত্বটি পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

উদ্ভিদের দৈহিক ক্রিয়া

উদ্ভিদের পরিপাক-ক্রিয়া

চলা-ফেরা, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি সকল শারীরিক কাজের জন্য প্রাণীকে নিয়তই শক্তি ব্যয় করিতে হয়। কেবল প্রাণী নয়, উদ্ভিদও জীবনের কার্য্যে এই প্রকার শক্তি ব্যয় করে। মাটি হইতে জল টানিয়া চূড়া পর্য্যন্ত উঠানো, দেহের অংশবিশেষকে তালে তালে স্পন্দিত করা, কম শক্তি-সাধ্য ব্যপার নয়! এই শক্তি আসে কোথা হইতে? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দেহের ভিতরে তাহাদের খাদ্য হইতে যে সারবস্তু সঞ্চিত রাখে, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া শক্তির উৎপত্তি করে।

একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায়, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ যে শক্তি দ্বারা জীবনের কার্য্য দেখায়, তাহার মূলাধার-সূর্য্যের তাপালোক ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রাণীর প্রধান খাদ্য ফলমূল, শাক-সব্জী। এই সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্য প্রাণীকে পুষ্ট করে, এবং তাহার দেহে শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু উদ্ভিদের এই পত্র-পল্লব, ফল-মূল কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? উদ্ভিদ্ তাহার পত্রের হরিৎ বস্তুর (Chlorophyl) সাহায্যে সূর্য্যের তাপালোক শোষণ করে এবং বাতাস হইতে অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic acid) টানিয়া লয়! তার পরে সেই অঙ্গারক বাষ্পের অঙ্গার সূর্য্যের তাপালোকের শক্তিতে মিলিয়া দেহের ভিতরে যে সার-বস্তুর উৎপত্তি করে, তাহাই উদ্ভিদ্‌কে সজীব রাখে এবং তাহার জীবনের ক্রিয়া দেখায় কাজেই, সূর্য্যের শক্তিকে সর্ব্বশক্তির মূল না বলিলে চলে না। আজ যে কয়লার তাপে রেলগাড়ী চলিতেছে, তাহা সূর্য্যের তাপই নয় কি? অতি প্রাচীনকালে উদ্ভিদ্ সূর্য্য-তাপের যে শক্তি নিজের দেহের ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা কয়লায় পরিণত হওয়ায় ক্ষয় পায় নাই। আজ কয়লা নিজেকে পুড়াইয়া সেই সঞ্চিত শক্তিকেই প্রকাশ করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য অঙ্গার। তাহারা বাতাসে ও জলে মিশানো অঙ্গারক বাষ্পকে দেহস্থ করে। খাঁটি অঙ্গারক বাষ্প উদ্ভিদের শরীর-পোষণের কাজে লাগে না। সূর্য্যালোক কর্ত্তৃক দেহমধ্যে রূপান্তরিত হইলে পরে উহা হজমের উপযুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইংরাজিতে (photosynthesis) বলা হয়। ইহাতে উদ্ভিদ্ সূর্য্যের চলৎ-শক্তি (Kinetic energy) আলোককে শোষণ করিয়া স্থির-শক্তি (Potential energy) রূপে শরীরে লুকাইয়া রাখে, এবং পরে তাহাই তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি চলৎ-শক্তির আকারে প্রকাশ করে। আমরা যখন কাঠ বা কয়লা পুড়াইয়া তাপ উৎপন্ন করি, তখন উদ্ভিদ্ দেহে সঞ্চিত সূর্য্যের স্থির-শক্তিই চলৎ-শক্তির আকার গ্রহণ করে।

বাতাস হইতে বা জল হইতে উদ্ভিদ্ কতটা অঙ্গার দেহস্থ করিল, তাহার মোটামুটি হিসাব কঠিন নয়। কারণ, কতটা অঙ্গারক বাষ্প দেহে প্রবেশ করিল, তাহা মাপিতে পারিলেই অঙ্গারের পরিমাণ বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রকার পরিমাপে ঝঞ্ঝাট অনেক এবং সময়ও লাগে যথেষ্ট। তাহা ছাড়া সাধারণতঃ হিসাব নির্ভুল ও সূক্ষ্ম হয় না। ইহা দেখিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের অঙ্গার-গ্রহণ পরিমাপ করিবার জন্য একটি যন্ত্র নির্ম্মানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আমরা এখন তাঁহার (Automatic Recorder for Photosynthesis) নামক যন্ত্রটি পাইয়াছি। কতটা অঙ্গার হজম হইল, তাহা উদ্ভিদ্ এই যন্ত্রে সংলগ্ন কাগজে নিজেই লিখিয়া দেয়। কখন অঙ্গার হজম আরম্ভ হইল এবং কখনই বা শেষ হইল, তাহা যন্ত্রের ঘণ্টা শব্দ করিয়া আমাদের গোচরে আনে। এই যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের অঙ্গার হজম সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

কেবল স্থলজ উদ্ভিদ্‌ই যে অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়া অঙ্গার গ্রহণ করে, তাহা নয়। জলজ উদ্ভিদেরও দেহ-পোষণের জন্য অঙ্গারের প্রয়োজন হয়। ইহারাও অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে, কিন্তু এই বাষ্প থাকে জলের সঙ্গে মিশানো। জলজ উদ্ভিদ্‌ জল হইতে তাহা চুষিয়া লয় এবং তার পরে সূর্য্যের আলোকে তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া অঙ্গার ও অক্সিজেনে পরিণত হইলে, সে অঙ্গারটুকুকে Carbohydrates-এর আকারে দেহস্থ করে; বাকি অক্সিজেন বুদ্‌বুদের আকারে জল ভেদ করিয়া উপরে উঠে। পুষ্করিণীর জলে যে শেওলা জন্মে, রৌদ্রের সময়ে পরীক্ষা করিলে পাঠক তাহার দেহ হইতে ঐ প্রকারে অক্সিজেন বাহির হইতে দেখিতে পাইবেন। পরিস্রুত জলে জলজ উদ্ভিদ্‌ অনাহারে মারা যায়; কারণ, তাহাতে অঙ্গারক বাষ্প থাকে না, কাজেই সে অঙ্গার খাইতে পায় না। কিন্তু সেই জলেই খানিকটা সোডা-ওয়াটার ঢালিয়া দিলেই উদ্ভিদের মুখ চাহিতে আরম্ভ করে, কারণ সোডা-ওয়াটারে প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প মিশানো থাকে। এই অবস্থায় উদ্ভিদ্‌ যেমন অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অনাবশ্যক অক্সিজেন বুদ্‌বুদের আকারে উদ্গার করিতে থাকে। কাজেই, উদ্ভিদ্‌ কতটা অক্সিজেন উদ্গার করিল, তাহা পরিমাপ করিলে সে কতটা অঙ্গার হজম করিয়াছে ধরা পড়ে। কোনো উদ্ভিদ্‌ কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতটা অঙ্গার হজম করিল, তাহা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই প্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন।

যন্ত্রটির গঠন খুব জটিল না হইলেও ইহার নির্ম্মাণকালে অনেক বাধা বিঘ্ন দেখা দিয়াছিল। জগদীশচন্দ্র সমস্ত বাধা কাটাইয়া এখন যন্ত্রটিকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে পারিয়াছেন। আমরা এখানে ইহার কেবল একটা মোটামুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প-মিশানো

এক বোতল পুষ্করিণীর জলে একটি জলজ উদ্ভিদ্ (Hydrilla verticillata) রাখিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বোতল ছিপি-বদ্ধ করা ছিল, কিন্তু ছিপির সঙ্গে ইংরাজি U অক্ষরের আকারের একটা বাঁকানো নল লাগানো ছিল এবং তাহার মুক্ত প্রান্তটি কয়েক বিন্দু পারদ দিয়া আট্‌কানো হইয়াছিল। অঙ্গার হজম করার সঙ্গে বোতলের গাছটি যে অক্সিজেন উদ্গার করিতেছিল, তাহার চাপে ছিপির নলের পারদ-বিন্দু স্থির থাকিতে পারে নাই। তাহা মাঝে মাঝে উপরে উঠিয়া সঞ্চিত অক্সিজেন ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং পরক্ষণে নীচে নামিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। পারদ-বিন্দুর এই সঞ্চলনে যাহাতে যন্ত্রসংলগ্ন কলম নড়াচড়া করে এবং বৈদ্যুতিক ঘণ্টার তারের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া ঘণ্টাকে বাজায়, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা যন্ত্রে আছে। কাজেই, অঙ্গার হজম করার সময়ে উদ্ভিদ্ আপনিই ঘণ্টা বাজাইয়া বা যন্ত্র-সংলগ্ন কাগজে রেখাপাত করিয়া পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যন্ত্রটির কার্য্য এত সূক্ষ্ম যে, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা হয়। মনে করা যাউক, যন্ত্রের বোতলে কোনো উদ্ভিদ্ রাখিয়া যেন তাহার অঙ্গার হজম পরীক্ষা করা যাইতেছে। উদ্ভিদ্‌টির উপরে সূর্য্যের আলো পড়িয়াছে, সে আনন্দে হজম-কার্য্য চালাইয়া যন্ত্রের ঘণ্টা বাজাইতেছে। এখন যদি কেহ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আলো অবরুদ্ধ করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার হজম কার্য্য রোধ পায় এবং ঘণ্টা ধীরে বাজিতে আরম্ভ করে। উদ্ভিদ্ যে এ প্রকারে আলোক অনুভব করিয়া ভোজন-কার্য্য চালায়, তাহা আচার্য্য বসুর যন্ত্রেই প্রথম ধরা পড়িল। কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কত আলোকপাত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র (Photometers) আছে। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন,—উদ্ভিদের সাহায্যে আলোক পরিমাপ করিলে

ফল সূক্ষ্ম হইবার সম্ভাবনা আছে। কেবল ইহাই নয়, মেঘে বা কুয়াসায় ক্ষণকালের জন্য হঠাৎ সূর্য্যের আলো রোধ পাইলেও এই যন্ত্রে তাহা ধরা পড়ে। তখন যন্ত্র-সংলগ্ন বিদ্যুৎ-দীপ আপনিই জলিয়া উঠে এবং সূর্য্য মেঘনির্মুক্ত হইলে তাহা আপনি নিভিয়া যায়।

দিনের কোন্ সময়ে উদ্ভিদ্ বেশী আহার করে, তাহা এ পর্য্যন্ত কাহারো জানা ছিল না। আচার্য্য বসুর যন্ত্রটীতে তাহা ধরা পড়িয়াছে। তিনি যন্ত্রের কাছে বসিয়া ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন—বেলা সাড়ে সাতটার পূর্ব্বে সূর্য্যের যে মৃদু আলোক উদ্ভিদের শরীরে পড়ে, তাহা উহার ক্ষুধার উদ্রেক করিতে পারে না। খুব ভোরে আমাদের যেমন গুরু-ভোজনে অরুচি থাকে, উদ্ভিদেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। তার পরে বেলা সাড়ে সাতটায় যেই প্রখর সূর্য্যালোক গায়ে লাগে, অমনি সে আহারে মন দেয়। আমরা আধ ঘণ্টায় বা এক ঘণ্টায় আহারের কাজ সারিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করি। তার পরে তিন-চারি ঘণ্টা চুপ—এই সময়ে আর আহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উদ্ভিদের প্রকৃতি সে রকম নয়। যত বেলা বাড়িতে থাকে, ততই তাহাদের ক্ষুধা জাগিয়া উঠে এবং ততই তাহারা খাইতে থাকে। ক্ষুধার মাত্রাটা চরম হইয়া দাঁড়ায় বেলা একটার সময়, প্রাতে যতটা খায় এই সময়ে তাহার চারি গুণ আহার করিয়াও তাহাদের পেট ভরে না। কিন্তু যেই বেলা পড়িতে আরম্ভ করে, অমনি তাহাদের ভোজন কমিয়া আসে। শেষে যখন রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক ঢাকিয়া যায়, তখন তাহারা একদম মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এ সময়ে আর ভোজন কার্য্য চলে না।

খাদ্য হজম করা একটি জীবনের ক্রিয়া। তাই অসাধারণ উত্তেজনা হজমের ব্যাঘাত করে। প্রফুল্ল চিত্তে আহার করিয়া নিশ্চিন্তমনে

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিবার জন্য ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়েরা আমাদের যে পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা নিঃসন্দেহ সুপরামর্শ। হজমের সময়ে উত্তেজনা আসিলেই বদহজম হয়। একটি উদ্ভিদ্ রৌদ্রে পিঠ দিয়া যখন হজমে ব্যস্ত ছিল, এবং যন্ত্রের ঘণ্টা বাজাইয়া যখন হজমের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল, আচার্য্য বসু মহাশয় হঠাৎ তাহার শরীরে বিদ্যুৎ চালনা করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্ চমকাইয়া উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আহার বন্ধ করিয়াছিল। আহারের সময়ে পিঠে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারিলে পরম ভোজন-বিলাসীরও যেমন ভোজন-স্পৃহা দূর হয়, এই ব্যাপারটা কতকটা সেই রকমেরই নয় কি?

এই যন্ত্রটি লইয়া গবেষণা করিবার সময়ে আচার্য্য বসু দেখিয়াছেন, হজমের সময়ে কতকগুলি বস্তু অতি সামান্য পরিমাণে দেহস্থ করিলে উদ্ভিদের হজমের কার্য্য হঠাৎ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়া যায়। আমাদের পরিপাক-শক্তি বাড়াইবার জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা বড় বড় বড়ি সেবনের ব্যবস্থা করেন; আবার তাহার সঙ্গে অনুপানও থাকে অনেক। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এক-শত কোটি ভাগ জলে কোনো কোনো দ্রব্যের কেবল এক-ভাগ মাত্র মিশাইয়া সেই জল উদ্ভিদ্-দেহে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই অতি সূক্ষ্ম কণিকায় উদ্ভিদের হজম-শক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। কেবল ইহাই নয়, এক-শত কোটি ভাগ জলে এক-ভাগ মিশাইয়া তিনি যে ফল পাইয়াছিলেন, দুই-শত কোটি ভাগ জলে এক-ভাগ মিশাইয়া তাহারই দ্বিগুণ ফল দেখিতে পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ জিনিসটি যত অল্প পরিমাণে দেহস্থ করানো যায়, পরিপাক-শক্তির উপরে তাহার ক্রিয়া ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি? আমাদের ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা এই তত্ত্ব লইয়া কোনো গবেষণা করিতেছেন না কেন, তা জানি না। ইহাতে ভেষজ-তত্ত্বের কোনো এক বৃহৎ আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যতই

ডাইলিউসন বাড়ানো যায়, ততই তাহা শক্তিমান্ হয় বলিয়া একটা কথা আছে। আচার্য্য বসুর আবিষ্কৃত তত্ত্বের সঙ্গে ইহার যেন কতকটা মিল ধরা পড়িতেছে। এক-ভাগ থাইরয়েড্ গ্রন্থির রসের (Extract of thyroid gland) সহিত এক-শত কোটি ভাগ জল মিশাইয়া জগদীশচন্দ্র তাহারই একটু উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, ইহাতে উহার হজমের মাত্রা শতকরা সত্তর অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,—এই প্রকারে আয়োডিন (Iodine) প্রয়োগ করিয়াও একই ফল পাওয়া গিয়াছিল। জীবনের ক্রিয়ায় রাসায়নিক পদার্থের সূক্ষ্মতম কণিকার এই প্রকার কার্য্য হঠাৎ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা সত্য। উদ্ভিদের দেহে যে সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, প্রাণীর জীবন-ক্রিয়া যে সেই সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভিটামিন (Vitamine) এবং হর্মোনস্ (Hormones) প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য প্রাণিশরীরে অতি অল্প পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়া বৃহৎ কার্য্য দেখায়, তাহাদের প্রকৃতি আধুনিক শরীর-তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে আজও অস্পষ্ট রহিয়াছে। হয় ত একদিন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্যের আলোকে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে।

তাপালোকের আকারে সূর্য্যের যে শক্তি উদ্ভিদের উপরে আসিয়া পড়ে, তাহার কত ভাগ সে গ্রহণ করিয়া জীবনের ক্রিয়া চালায়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এক-শত ভাগ শক্তির মধ্যে কেবল এক ভাগ মাত্র উদ্ভিদে গ্রহণ করে, বাকি ৯৯ ভাগ তাহাদের কাজে লাগে না। পূর্ব্ব-বৈজ্ঞানিকেরা খুব স্থূল যন্ত্রের সাহায্যে এই হিসাব দাঁড় করাইয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার Magnetic Radiometer) নামক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে যে ফল পাইয়াছেন, তাহা ঐ ফলের সহিত মিলে নাই। তাঁহার হিসাবে সৌর শক্তির শতকরা প্রায় সাড়ে সাত ভাগ উদ্ভিদেরা কাজে লাগায়।

কম তফাৎ নয়। ষ্টীম্-এন্‌জিনে কয়লা পুড়াইয়া আমরা তাপ উৎপন্ন করি এবং সেই তাপে কল চালাই। অর্থাৎ কয়লার স্থির-শক্তিকে (Potential Energy) আমরা চলৎ-শক্তিতে (Kinetic Energy) পরিণত করি। কিন্তু কয়লার তাপের সমস্তটাই কি কল চালানোর কাজে ব্যয়িত হয়? কলে সবটাই কাজে লাগিতে পাবে না,—শতকরা ১৪ বা ১৫ ভাগের বেশী তাপ কল-চালানোতে খরচ হয় না। কাজেই বলিতে হয়, সুব্যবস্থার অভাবে শতকরা ৮৫ ভাগ শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের এন্‌জিনের কার্য্যকরী শক্তি (Efficiency) উদ্ভিদের কার্য্যকরী শক্তির প্রায় দ্বিগুণ। আচার্য্য বসু বলিয়াছেন, যে উপায়ে উদ্ভিদ্ সূর্য্যালোকের চলৎ-শক্তিকে স্থির-শক্তিরূপে দেহে সঞ্চিত রাখে, সেই রকম কোনও উপায়ে সূর্য্যালোকের শক্তিকে আমাদের ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত রাখা অসম্ভব হইবে না।

উদ্ভিদের হৃদ্‌স্পন্দন

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি, উদ্ভিদের রস-শোষণ বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌ ষ্ট্রাট্‌বর্গার বলেন,--ইহা একটা জড়ধর্ম্ম, অর্থাৎ শুক্‌না গামছার এক প্রান্ত জলে ডুবাইলে যেমন জল গামছা বাহিয়া তাহার সর্ব্বাংশ ভিজাইয়া দেয়, সেই রকমেই মাটির রস মূল দিয়া উপরে উঠে। ইহার সহিত জৈব ক্রিয়ার কোনো সম্বন্ধ নাই। তিনি আরো মনে করেন, বিষপ্রয়োগে উদ্ভিদের রসশোষণের মাত্রার কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। প্রাণী বিষক্রিয়া বুঝিতে পারে, জড় তাহা পারে না। পম্প্‌ দিয়া আমরা যখন জল তুলি, তখন সে জল বিষাক্ত কি নির্ম্মল, তাহা পম্প্‌ বিচার করে না। সে অবিরাম জল তুলিতেই থাকে। উদ্ভিদ্‌ জড়ধর্ম্মী, তাই সে জড়বৎ রসশোষণ করিতে থাকে। সে রসে বিষ আছে কি অমৃত আছে, তাহা বিচার করে না।

ষ্ট্রাট্‌বর্গারের পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য হইলে বলিতে হয়, শারীরযন্ত্রের সহিত উদ্ভিদের রসশোষণের কোনো সম্বন্ধই নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখাইয়া এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—প্রাণিদেহের হৃদ্‌পিণ্ড এবং ধমনী যেমন তালে তালে স্পন্দিত হইয়া রক্তের প্রবাহ শরীরে সঞ্চালন করে, সেই রকম উদ্ভিদের দেহের অংশ-বিশেষ সেই রকমেই তালে তালে কাঁপিয়া রসধারা সর্ব্ব শরীরে চালনা করে। দেহে উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া তিনি মৃতপ্রায় উদ্ভিদে রস-সঞ্চলন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং সতেজ বৃক্ষে বিষ-প্রয়োগ করিয়া তাহার রসশোষণ অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং, প্রাণিদেহে যেমন হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী আছে, উদ্ভিদ্‌-শরীরেও যে

সেই প্রকার কিছু আছে এবং তাহার স্পন্দনেই যে রসধারা সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া উদ্ভিদ্‌কে পুষ্ট করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

Amphioxus প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণীর শরীরে আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডের মতো সুনির্দ্দিষ্ট যন্ত্র দেখা যায় না। দেহের একটা দীর্ঘ অংশ স্পন্দিত হইয়া রস-স্রোত ইহাদের সর্ব্ব শরীরে চালনা করে। ভ্রূণস্থ মানব-শিশু বা অপর উন্নত প্রাণীর শরীরেও ঐ প্রকার দীর্ঘাকৃতি হৃদপিণ্ড ধরা পড়ে। উদ্ভিদ-দেহেরও একটি দীর্ঘাকৃতি অংশ তালে তালে কাঁপিয়া রসধারা চালনা করে। সুতরাং, এই দীর্ঘাকৃতি অংশই যে উদ্ভিদের হৃদ্‌পিণ্ড, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

আচার্য্য বসু এখানেই ক্ষান্ত হন নাই। প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডের রস-সঞ্চলনের ক্রিয়ার খুঁটিনাটি ব্যাপারের সহিত উদ্ভিদের রস-সঞ্চলনের ক্রিয়ার মিল ধরিবার জন্য তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক। গবেষণার সময়ে তিনি স্বাবিষ্কৃত বিদ্যুৎ-শলাকা (Electric probe) দিয়া উদ্ভিদ্‌-দেহের স্পন্দনশীল অংশ বাহির করিয়াছিলেন, এবং তার পরে নানা অবস্থায় উদ্ভিদের স্পন্দন কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা তাঁহার Sphygmograph যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই যন্ত্রটির কার্য্য অতীব বিস্ময়জনক। প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দন পরীক্ষা করা কঠিন নয়। শরীরে যে সকল ধমনী থাকে, তাহাতে হাত দিলে স্পন্দন বুঝা যায় এবং সেই সকল ধমনীর সহিত বিশেষ যন্ত্র সংলগ্ন করিলে স্পন্দন কি ভাবে চলিতেছে, তাহা যন্ত্রে লিপিবদ্ধ করাও চলে। কিন্তু এই প্রকারে উদ্ভিদের নাড়ী দেখা চলে না। ইহাদের নাড়ী থাকে দেহের গভীর অংশে লুকানো। কাজেই, সাধারণ যন্ত্রে তাহার স্পন্দন পরীক্ষা করা যায় না। তাহা ছাড়া প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দনের জন্য ধমনীর উঠা-নামা যেমন সুস্পষ্ট, উদ্ভিদে তেমন নয়। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়াও তাহা চোখে পড়ে

না। তালে তালে রস-শোষণের সঙ্গে উদ্ভিদ্-দেহের যে অতি মৃদু আকুঞ্চন-প্রসারণ হয়, তাহা আচার্য্য বসুর Sphygmograph যন্ত্রে ধরা পড়ে। যন্ত্রটির গঠন খুব জটিল নয়। পরীক্ষার সময়ে যন্ত্রের দুইটি শলাকা গাছের ডালে বা গুঁড়িতে সংলগ্ন রাখা হয়। এই দুইটির একটি গাছের গায়ে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে, অপরটি নড়া-চড়া করিতে পারে। রসচালনার সঙ্গে গাছের গুঁড়ি যেমন আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়, শিথিল শলাকাটি তেমনি নড়াচড়া করে। শলাকার এই অতিমৃদু সঞ্চলনকে সুকৌশলে চক্ষুগোচর করাইয়া জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের 'নাড়ীর স্পন্দন' পরীক্ষা করিয়াছেন। গাছ সাধারণতঃ যে পরিমাণে স্পন্দিত হয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহাই পঞ্চাশ লক্ষ গুণ বেশী হইয়া আমাদের চোখে পড়ে। এই প্রকার সূক্ষ্ম এবং সুব্যবস্থিত যন্ত্র এ পর্য্যন্ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন কি না, জানি না।

যাহা হউক, আচার্য্য বসু তাঁহার নানা সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের হৃদ্‌স্পন্দনের যে ঐক্য দেখাইয়াছেন, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। উত্তেজক পদার্থে প্রাণিদেহের রক্তের চাপ (Blood Pressure) বৃদ্ধি পায় এবং অবসাদজনক পদার্থের প্রয়োগে তাহা কমিয়া আসে। আচার্য্য বসু উত্তেজক ও অবসাদজনক পদার্থের প্রয়োগে উদ্ভিদের রসের চাপের অবিকল সেই প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, তিনি আরও দেখিয়াছেন, উত্তেজক পদার্থ উদ্ভিদের হৃদ্‌স্পন্দন ও রসশোষণ বৃদ্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, স্পন্দনের উপর দিকের ঝাঁকানি নীচের দিকের ঝাঁকানির চেয়ে বেশী করে। অবসাদক পদার্থ প্রয়োগে আবার ঠিক্ ইহার উল্টা ব্যাপার দেখা যায়। তখন নীচের দিকে ঝাঁকানিই উপর দিকের ঝাঁকানির চেয়ে বাড়িয়া যায়। উদ্ভিদ্-দেহের উপরে উত্তেজক ও অবসাদক পদার্থের এই ক্রিয়াটির কথা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। উদ্ভিদ্-দেহকে কোন জিনিস উত্তেজিত করে এবং

কোন জিনিসই বা অবসন্ন করে, তাহা হঠাৎ বলা যায় না। কোনও দ্রব্য প্রয়োগে উদ্ভিদের স্পন্দনের ঝাঁকুনি উপরে বাড়িতেছে কি নীচে বাড়িতেছে, পরীক্ষা করিয়া দ্রব্যটি উত্তেজক কি অবসাদক, তাহা অনায়াসে স্থির করা যাইতেছে। আচার্য্য বসুর যন্ত্রে এই সকল স্পন্দন-চিহ্ন আপনিই লিপিবদ্ধ হইয়া যায়।

কর্পূর প্রাণিদেহে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। জলে মিশানো কর্পূরে প্রাণীর হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন বাড়িয়া যায়। অবসন্ন প্রাণিদেহে কর্পূর প্রয়োগ করিয়া ইহার লক্ষণ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। আচার্য্য বসু দুই হাজার ভাগ জলে দুই ভাগ কর্পূর মিশাইয়া সেই কর্পূর-জল প্রাণিদেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ইহাতে প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দন কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা তিনি যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তার পরে সেই জল-প্রয়োগে উদ্ভিদের স্পন্দনও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে দুই স্পন্দন-লিপিই প্রায় এক রকমই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে উদ্ভিদ্ পূর্ব্বে ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইয়া রস-চালনা করিতেছিল, কর্পূর-জলে তাহাই সবলে দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ করিয়াছিল। মৃগনাভি, কাফিন্ প্রভৃতি জিনিষও উত্তেজক। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই সকল দ্রব্য-প্রয়োগে কর্পূরের ন্যায় কার্য্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

অহিফেন-ঘটিত মর্‌ফাইন্ (Morphine) জিনিসটি খুব অবসাদক। মাছের শরীরে মর্‌ফাইন প্রবেশ করাইয়া আচার্য্য বসু তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন-লিপি যন্ত্রে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই অবসাদক দ্রব্যের প্রয়োগে স্পন্দনের বিস্তার ও দ্রুততা উভয়ই কমিয়া আসিয়াছিল। উদ্ভিদে মর্‌ফাইন্ প্রয়োগে তাহার স্পন্দনেও অবিকল একই ফল পাওয়া গিয়াছিল। অতি অল্প মাত্রায় মদ্য প্রয়োগ করিয়াও আচার্য্য বসু উদ্ভিদের স্পন্দনে অবসাদ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

একে একে অবসাদ ও উত্তেজক পদার্থের প্রয়োগে প্রাণী ও উদ্ভিদের স্পন্দনে যে ফল পাওয়া যায়, তাহাও জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় হাজার ভাগ জলে পাঁচ ভাগ পটাসিয়ম্ ব্রোমাইড্ মিশাইয়া, এই মিশ্র বস্তুকে অবসাদক দ্রব্যরূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। ইহার প্রয়োগে প্রাণীর হৃদ্‌স্পন্দন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তার পরে সেই প্রাণীরই দেহে হাজার ভাগ জলে এক ভাগ মৃগনাভি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। মৃগনাভি উত্তেজক পদার্থ। ইহার উত্তেজনায় হৃদ্‌স্পন্দনের অবসাদ দূর হইয়া গিয়াছিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড জোরে কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। উদ্ভিদের দেহে একে একে ব্রোমাইডের জল ও মৃগনাভি প্রয়োগ করায় তাহারও স্পন্দনে ঠিক একই ফল প্রকাশ পাইয়াছিল।

বিষ ও বিষঘ্ন পদার্থের প্রয়োগে আচার্য্য বসু উদ্ভিদের হৃদ্‌স্পন্দনের যে পরিবর্ত্তন আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক। ক্রমাগত মর্‌ফাইন্ প্রয়োগে যখন উদ্ভিদের হৃদ্‌স্পন্দন প্রায় অবরুদ্ধ হইতে চলিতেছিল, তখন সেই মৃতপ্রায় উদ্ভিদে আচার্য্য বসু এট্রোপিন (Atropine) প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্ মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া জোরে জোরে হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য চালাইতেছিল। অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্-কোষেও এই প্রকার জীবন-মৃত্যুর লীলা, মরণ-যন্ত্রণা এবং স্বাস্থ্যলাভের উল্লাস দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

ষ্ট্রিক্‌নাইন্ (Strychnine) জিনিষটা প্রাণিশরীরে অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সেই ক্রিয়াকেই লোপ করিতে বসে। এক হাজার ভাগ জলে এক ভাগ ষ্ট্রিক্‌নাইন্ মিশাইয়া প্রাণিশরীরে প্রবেশ করাইয়া আচার্য্য বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাতে আবার সেই ষ্ট্রিক্‌নাইনেরই দুই ভাগ এক হাজার ভাগ জলে

মিশাইয়া প্রয়োগ করায়, ক্রমে হৃদ্‌স্পন্দন মৃদু হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে লোপ পাইয়া গিয়াছিল। উদ্ভিদের দেহে পরীক্ষা করায় আচার্য্য বসু মহাশয় ঠিক একই ফল পাইয়াছেন। হাজার ভাগ জলে এক ভাগ ষ্ট্রিক্‌নাইন মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে উদ্ভিদের স্পন্দন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু যেই এক শত ভাগ জলে এক ভাগ ষ্ট্রিক্‌নাইন মিশাইয়া প্রয়োগ করা গেল, অমনি স্পন্দন কমিতে কমিতে লোপ পাইল,—উদ্ভিদ্‌ মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

গোখুরা সাপের বিষ অতি ভয়ানক। এক গ্রেণ বিষকে লক্ষ ভাগ করিয়া তাহার ৩১ ভাগ লইলে যে কণা-প্রমাণ বিষ পাওয়া যায়, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে আর রক্ষা থাকে না। তখন মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহা রোজার ঝাড়ান-কাড়ান মানে না। এক নীলকণ্ঠ মহাদেব ছাড়া আর কেহ যে এই বিষ হজম করিতে পারিয়াছেন, তাহা জানি না। আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, সাপের বিষে মরিলে মানুষ আবার বাঁচিতেও পারে। তাই সাপের বিষে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার দেহকে না পুড়াইয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ যদি জীবন ফিরিয়া আসে। সর্পাঘাতে নখীন্দরের মৃত্যু হইলে, বোধ করি এই জন্যই বেহুলা দেবী মৃতদেহ নষ্ট করিতে না দিয়া ভেলায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন। আচার্য্য বসু গোখুরার বিষ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করাইয়া যে ফল পাইয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যজনক। একটি সুস্থ মৎস্য যখন জলে বিচরণ করিতেছিল, তখন তাহাকে ধরিয়া আচার্য্য বসু মহাশয় তাহার শিরায় গোখুরার বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। প্রযুক্ত বিষের পরিমাণ অতি অল্পই ছিল। হাজার ভাগ জলে কেবল ½ ভাগ বিষ মিশাইলে তাহাতে যে সামান্য বিষ থাকে, তাহাই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সুস্থ মাছের হৃদ্‌স্পন্দন মৃদুতর হইয়া শেষে একেবারে লোপ পাইয়া গেল। মাছের হৃদ্‌স্পন্দনের যে লিপি

যন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে মৃত্যুকালীন আক্ষেপ (Spasms) পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছিল। ইহার পরে আচার্য্য বসু জলে শতকরা এক ভাগ বিষ মিশাইয়া তাহা উদ্ভিদ্‌-দেহে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। মৎস্যের হৃদ্‌স্পন্দনের ন্যায় ইহাতে উদ্ভিদেরও হৃদ্‌স্পন্দন ক্রমে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

এক লক্ষ ভাগ জলে একভাগ সাপের বিষ মিশাইয়া জগদীশচন্দ্র যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ফল আরও বিস্ময়কর। এই অত্যল্প পরিমাণ বিষে উদ্ভিদের দেহে অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে তাহার স্পন্দন চলিয়াছিল। একটা গাছের ডাল কাটিয়া আচার্য্য বসু মহাশয় সেটিকে ঐ বিষ-মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন, অনেকদিন ধরিয়া তাহা তাজা ছিল। বলা বাহুল্য, বিষের উত্তেজনাই কাটা ডালকে সজীব রাখিয়াছিল।

এই পরীক্ষার সময়ে আমাদের কবিরাজ মহাশয়দিগের সূচিকাভরণ নামক ঔষধের কথা জগদীশচন্দ্রের মনে পড়িয়াছিল। এই ঔষধে অতি অল্প পরিমাণে গোখুরা সাপের বিষ মিশানো থাকে। যখন রোগী হিমাঙ্গ হইয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়ায়, তখন কবিরাজ মহাশয়েরা সূচিকা-ভরণ সেবনের ব্যবস্থা করেন। ইহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ। হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যে বিষ অত্যল্প সময়ে প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে, সেই বিষই অল্প পরিমাণে প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইলে যে অমৃতের কাজ দেখায়, তাহা অতি প্রাচীন কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জানিতেন। ইহা দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। যে-তত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা নানা যন্ত্রের সাহায্যে বহু পরীক্ষায় জানিতেছেন, তাহা প্রাচীনেরা কি প্রকারে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়।

যাহা হউক, যখন হৃদ্‌স্পন্দন প্রায় রোধ হইয়া প্রাণীকে মরণ-দশায় আনিয়াছে, তখন সূচিকাভরণ প্রয়োগে তাহার অবস্থা কি দাঁড়ায়, আচার্য্য বসু পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সাধারণ মাছকে জল হইতে
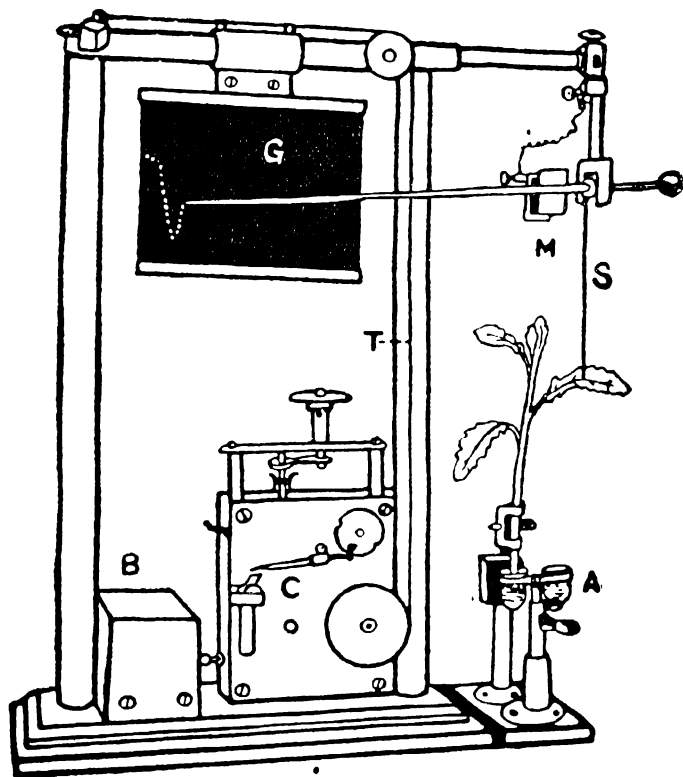
উঠাইলে, তাহার শ্বাস রোধ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদ্‌স্পন্দনও কমিয়া আসে। আচার্য্য বসু এইপ্রকার মৃতপ্রায় মাছের দেহে জলে-মিশানো সূচিকাভরণ অত্যল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অল্প

সময়ের মধ্যে তাহার অনিয়মিত লুপ্তপ্রায় হৃদ্‌স্পন্দন আবার নিয়মিত ভাবে সবলে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য নয় কি?

উদ্ভিদ রস-শোষণ করিতেছে কিনা এবং শোষণের সময়ে তাহার বেগ কত, তাহা নির্ণয় করার উপযোগী কোনো যন্ত্রই ছিল না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, রস-শোষণের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্-মাত্রেরই পাতা উপরে উঠিয়া এবং নীচে নামিয়া রস-শোষণের লক্ষণ জ্ঞাপন করে।
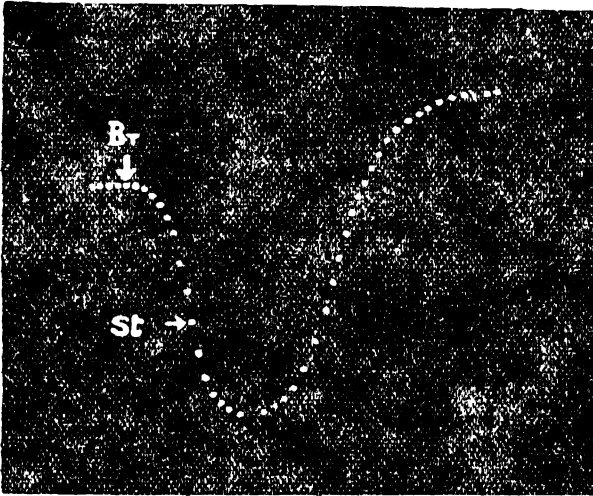
রস-শোষণ বন্ধ থাকিলে পাতার সঞ্চলনও বন্ধ হয়। কিন্তু এই সঞ্চলন এত অল্প যে, তাহা চোখে দেখা যায় না এবং অণুবীক্ষণের মতো যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। জগদীশচন্দ্র Electromagnetic Phytograph নামক একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া এই সঞ্চলন পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন উত্তেজক পদার্থ যে রস-শোষণ বৃদ্ধি করে এবং বিষ-পদার্থের যোগে যে তাহা রোধ প্রাপ্ত হয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে সুস্পষ্ট ধরা পড়ে।

পূর্ব্বপৃষ্ঠায় জগদীশচন্দ্রের ফাইটোগ্রাফের ছবি দিলাম। এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করায় গাছের পাতার অতি-মৃদু সঞ্চলন কত বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা ইহারই পূর্ব্ববর্ত্তী ছবিতে পাঠক দেখিতে পাইবেন। দেখুন, গাছের পাতার সঞ্চলন আলোকবিন্দুর আকারে যন্ত্রের কাগজে আপনিই লিপিবদ্ধ হইতেছে। জগদীশচন্দ্র গাছটিকে একমাত্রা পোটা-সিয়ম্ ব্রোমাইড খাওয়াইয়া ছিলেন। ইহা অবসাদক; তাই পাতার সঞ্চলনেও অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে—বিন্দুময় রেখাটি নীচে নামিয়াছে। যখন গাছটি পোটাসিয়ম্ ব্রোমাইডে অবসন্ন, তখন তাহাকে একমাত্রা কফি সেবন করানো হইয়াছিল। কফি অবসাদ-নাশক। ছবিতে দেখুন, বিন্দুময় রেখাটি ক্রমে উপরে উঠিয়া বলবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

প্রাণী ও উদ্ভিদের স্নায়ু

আগুনে হাত দিলে তাপ পাইবামাত্র হাত আপনা হইতেই আগুনের কাছ হইতে সরিয়া আসে। এই কাজ করিবার জন্য আমাদের নিজের কোনো চেষ্টা করিতে হয় না—বিপদ্ আসন্ন বুঝিয়া হাত আপনাকে আপনিই সাম্‌লায়। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় আমাদের দেহের স্নায়ুর (Reflex) ক্রিয়া। ইহা যে কি, তাহা শরীরবিদ্‌গণ জানেন। তাঁহারা বলেন,—তাপের প্রবল উত্তেজনা স্নায়ু-অবলম্বনে শরীরের ভিতরে গিয়া কোনো কোনো স্নায়ুকেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং তার পরে সেখান হইতে প্রতিফলিত হইয়া তাহাই আবার নূতন স্নায়ু দিয়া বাহিরের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ যে উত্তেজনা পূর্ব্বে ছিল অন্তর্মুখ (Afferent), তাহাই এখন হইয়া দাঁড়ায় বহির্মুখ (Efferent)। শরীরবিদ্‌গণ বলেন,—এই প্রতিফলিত বহির্মুখ উত্তেজনাই আমাদের হাতকে আগুনের কাছ হইতে সরাইয়া আনে। এই কাজের উপরে আমাদের কোনো কর্ত্তৃত্ব নাই। খুব জোর না করিলে হাতকে আগুনের কাছে এগানো যায় না। ইহাতেই কলের মতো হাত আগুনের কাছ হইতে সরিয়া যায়। ইহার উপরে ইচ্ছাশক্তির কোনো অধিকারই নাই। প্রাণিশরীর ব্যবচ্ছেদ করিলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ুসূত্র পাশাপাশি বিন্যস্ত দেখা যায়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের দেহেও অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ুগুচ্ছের আবিষ্কার করিয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, তাহাদের কার্য্য যে প্রাণীরই অনুরূপ চলে, তাহাও দেখাইয়াছেন। তিনি লজ্জাবতীর পাতার বোঁটা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে বোঁটার চারিটি করিয়া স্নায়ুগুচ্ছ ধরা পড়িয়াছিল। এগুলিই বোঁটার উপরকার চারিটি পাতার

বৃন্তমূলের (Pulvinus) সহিত স্নায়বিক যোগ রক্ষা করে। জগদীশচন্দ্র দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন, এই স্নায়ুগুচ্ছগুলি একই প্রকার স্নায়ু লইয়া গঠিত নয়। প্রত্যেক গুচ্ছের বাহিরে এবং ভিতরে দুইটি করিয়া পৃথক্ স্নায়ু-সূত্র স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহাদের কার্য্য প্রাণীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ুর অনুরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি?

আমাদের দেহে যদি কেহ ধীরে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহা বেশ ভালোই লাগে। হাতের এই রকম স্পর্শ আমাদের দেহের হানিকর নয়। ইহার অতি মৃদু উত্তেজনা অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়া চলিয়া শেষে আমাদিগকে আরাম জানায়। কিন্তু হাত না বুলাইয়া যদি কেহ ছুরি দিয়া আমাদের গায়ের চামড়া চাঁচিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আমরা আরাম পাই কি? মোটেই আরাম পাই না। এ ক্ষেত্রে ছুরির আঁচড়ের প্রবল উত্তেজনা অন্তর্মুখ স্নায়ুর সাহায্যে ভিতরে গিয়া স্নায়ুকেন্দ্রে ঠেকে এবং সেখান হইতে প্রতিফলিত হওয়ার পরে বহির্মুখ স্নায়ুর পথে বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে ছুরির কাছ হইতে দূরে লইয়া যায়। প্রবল উত্তেজনা দেহের হানিকর, তাই এই উপায়ে দেহ স্বভাবতঃ নিরাপদ থাকিতে চায়। উদ্ভিদেও অবিকল ইহাই দেখা গিয়াছে। সূর্য্যের আলো না পাইলে উদ্ভিদের জীবনান্ত হয়। আলোই পাতায় পড়িয়া তাহাদের খাদ্য হজম করায়। সুতরাং আলোর মৃদু উত্তেজনা উদ্ভিদের পরম উপকারী। সূর্য্যমুখীর কচি পাতা বেশি আলো পাইবার জন্য সূর্য্য যে দিকে থাকে, সে দিকে আপনা হইতেই মুখ ফিরায়। লজ্জাবতী এত লাজুক, তথাপি সে সব পাতাগুলিকে খুলিয়া সমস্ত দিন রোদ পোহায়। রোদের মৃদু উত্তেজনা উদ্ভিদের অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়া চলিয়া তাহাদের পাতাগুলিকে উন্মীলিত করে এবং যাহাতে পূর্ণমাত্রায় রৌদ্র গায়ে পড়ে তাহার জন্য সেগুলিকে প্রয়োজন মত বাঁকাইয়া ধরে। কিন্তু যখন উত্তেজনা প্রবল হয়, তখন আর এ ভাবটি থাকে না। এই অবস্থায়

উত্তেজনা হইতে দূরে থাকিবার জন্য উদ্ভিদের প্রাণপণ চেষ্টা হয়। এই সময়ে সেই অনিষ্টকর প্রবল উত্তেজনা অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়া ভিতরে যায় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্নায়ুকেন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া বহির্মুখ স্নায়ুর সাহায্যে বাহিরে আসে। ইহাতে আপনা হইতেই পাতা গুটাইয়া যায় এবং উত্তেজনার দিক হইতে দূরে থাকিবার জন্য ঘাড় বাঁকায়। প্রাণীর ও উদ্ভিদের স্নায়ুর কার্য্যে এই প্রকার অত্যাশ্চর্য্য মিল দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। উদ্ভিদের পাতা ও কচি ডালের উঠা-নামা এবং মুখ ফিরানো যে স্নায়ুর উত্তেজনাতেই হয়, তাহা জগদীশচন্দ্র উহাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণীর দেহে যেমন অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ স্নায়ু থাকে, উদ্ভিদের দেহেও ঠিক তাহাই আছে। উভয় দেহেই বাহিরের উত্তেজনা অন্তর্মুখ (Afferent) স্নায়ু দিয়া স্নায়ুকেন্দ্রে যায় এবং উত্তেজনা যদি প্রবল হয়, তাহা কেন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া বহির্মুখ (Efferent) স্নায়ু দিয়া বাহিরের দিকে আসে। ইহাতে প্রাণী ও উদ্ভিদেরা অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া প্রবল উত্তেজনার হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করে। প্রাণিদেহে এই উভয় স্নায়ুতে উত্তেজনার বেগ একই প্রকার বা বিভিন্ন, তাহা আমাদের জানা নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদে স্নায়ুর উত্তেজনা-বহনের বেগ পরিমাপ করিতে গিয়া যে ফল পাইয়াছেন, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। স্নায়বিক উত্তেজনা যত দূরে যায়, ততই তাহার বেগ কমিয়া আসে ইহা দেখিয়া মনে হয়, অন্তর্স্নায়ুর সাহায্যে উত্তেজনা কেন্দ্রে পৌঁছিয়া যখন বহির্স্নায়ু দিয়া বাহিরে আসে, তখন সেই বেগ আরো কমে। কারণ বাহির হইতে কেন্দ্রে যাওয়া এবং কেন্দ্র হইতে বাহিরে আসার পথটা, বাহির হইতে কেবল কেন্দ্রে যাওয়ার পথের দ্বিগুণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র ইহারই ঠিক বিপরীত ফল পাইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, যে বেগে অন্তর্মুখ স্নায়ু দিয়া উত্তেজনা কেন্দ্রে যায়, তাহারই

প্রায় ছয় গুণ বেগে সেই উত্তেজনা বহির্মুখ স্নায়ু দিয়া বাহিরে আসে। এই বেগবৃদ্ধির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা আসে কোথা হইতে? জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন, অন্তর্মুখ উত্তেজনাকে বহির্মুখ করিয়াই স্নায়ু-কেন্দ্রের কাজ শেষ হয় না, নূতন শক্তি দান করিয়া উত্তেজনাকে অধিক বেগে বাহিরে প্রেরণ করাও তাহার একটি কাজ।

ইহা হইতে বুঝা যায়, স্নায়ুকেন্দ্র উত্তেজনাকে নির্দ্দিষ্ট দিকে চালনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সে আবশ্যক-মতে কাজ চালাইবার জন্য অনেক শক্তিও সঞ্চয় করিয়া রাখে। বন্দুকের বারুদের যে শক্তি আছে, তাহা বারুদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বন্দুকের ঘোড়া টিপিলে তাহাই বন্ধনমুক্ত হইয়া গুলিকে চালায়। জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, অন্তর্মুখ উত্তেজনা স্নায়ুকেন্দ্রে পৌঁছিয়া বন্দুকের ঘোড়ার মতই সেখানকার শক্তি-ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দেয়। তার পরে সেই শক্তিতেই বহির্মুখ উত্তেজনা ভীষণ বেগে বাহিরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজারা দুর্গে অনেক গোলা বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। স্নায়ুকেন্দ্রের শক্তি-সঞ্চয় কতকটা সেই রকমেরই ব্যাপার। দেহরক্ষার জন্য কখন অন্তর্মুখ উত্তেজনাকে হঠাৎ বহির্মুখ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। তাই স্নায়ুকেন্দ্র প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিয়া কাছে রাখে। তার পরে বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র স্নায়ু-কেন্দ্র সেই শক্তি-প্রয়োগে উত্তেজনাকে বহির্মুখ করে। ইহার ফলেই উদ্ভিদ্ নিজের ডাল-পাতা বাঁকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। স্নায়ুকেন্দ্রের এই কার্য্যে যদি একটু বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে মহা বিপদ্ উপস্থিত হয়। তাই সে সর্ব্বদা প্রচুর শক্তি সঞ্চিত রাখিয়া অন্তর্মুখ স্নায়ু কি সংবাদ বহন করিয়া আনে, তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। জীবন-রক্ষার জন্য উদ্ভিদ্-দেহের এই সুব্যবস্থা বিস্ময়কর নয় কি?

উদ্ভিদের স্নায়ু

আঙুলে ছুঁচের আগা দিয়া খোঁচা দিলে আমরা বেদনা বোধ করি। শরীর-তত্ত্ববিদ্ বলেন,—খোঁচার উত্তেজনা স্নায়ুতন্তু (Nerve thread) দিয়া বহিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিলে বেদনার অনুভূতি হয়। কোন কারণে যখন প্রাণি-শরীরের স্নায়ু বিকৃত হইয়া যায়, তখন তাহা উত্তেজনাকে মস্তিষ্কে লইয়া যাইতে পারে না;—কাজেই, এই অবস্থায় বেদনা-বোধের শক্তি লোপ পায়।

পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত রোগীতে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই ব্যাধিতে রোগীর বিশেষ কোন অঙ্গের স্নায়ুজাল বিকৃত হইয়া যায়। তাই সেই অঙ্গকে উত্তেজিত ক'রলে, উত্তেজনা স্নায়ু বহিয়া মস্তিষ্কে যাইতে পারে না। কাজেই, রোগীর বেদনা-বোধ লোপ পায়। পায়ের আঙুলে কাঁটা ফুটিলে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার বেদনা অনুভব করি। তাই মনে হয় আঘাত ও বেদনা-বোধ ঠিক এক সঙ্গেই ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। টেলিগ্রাফের তার দিয়া এক জায়গার সঙ্কেত আর এক জায়গায় পৌঁছিতে যেমন অতি অল্প সময় লয়, তেমনি আঘাতের উত্তেজনা স্নায়ু-সূত্র দিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিতেও একটু সময় লয়। শরীর তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা হিসাব করিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন। হিসাব অতি সহজ। যদি কোনো স্নায়ুজাল মাংস-পেশীতে (Muscles) আসিয়া শেষ হয়, তবে স্নায়ুর দূরবর্ত্তী প্রান্তে আঘাত দিলে সেই আঘাতের উত্তেজনা পেশীতে আসিয়া পৌঁছায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পেশী সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং স্নায়ুর এক প্রান্ত হইতে উত্তেজনাটি কতক্ষণে অপর প্রান্তে পৌঁছিল, তাহা উত্তেজনা-প্রদানের সময় এবং পেশীর সঙ্কোচের

সময়ের অন্তর হইতে জানা যায়। তার পরে স্নায়ুর দৈর্ঘ্যকে উক্ত সময় দিয়া ভাগ দিলে উত্তেজনা কিপ্রকার বেগে স্নায়ুর ভিতর দিয়া চলিয়াছিল, তাহা ঠিক করা যায়।

আমরা যখন টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের সাহায্যে এক স্থানের সঙ্কেত অন্য স্থানে প্রেরণ করি, তখন তাহাতে গ্রাহক, বাহক ও প্রকাশক,—এই তিনটি বিশেষ ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। টেলিগ্রাফ মাষ্টার যে কলটির চাবি টিপিয়া সঙ্কেত প্রেরণ করেন, তাহা "গ্রাহক"। টেলিগ্রাফের তার "বাহক"। কারণ ইহাই সঙ্কেত বহন করিয়া লইয়া যায়। তারের সাহায্যে সঙ্কেত পৌঁছিলে যেকলটি আপনা হইতেই শব্দ করিয়া সঙ্কেত জ্ঞাপন করে, তাহাই "প্রকাশক"। স্নায়ুর কাজেও আমরা এই প্রকার তিনটি অংশ দেখিতে পাই। পূর্ব্বের উদাহরণে শরীরের যে অংশ বাহিরের আঘাত অনুভব করে, তাহা "গ্রাহক" (Receiptor)। যে স্নায়ুজাল আঘাতের উত্তেজনা বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহাই "বাহক" (Conductor)। তার পরে যে পেশী উত্তেজনায় সঙ্কুচিত হইয়া সাড়া দেয়, তাহা প্রকাশক (Effector)।

প্রাণীর কোনো অঙ্গে আঘাত দিলে যেমন তাহার উত্তেজনা দূরে পৌঁছায়, সার্ জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের অঙ্গেও তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। লজ্জাবতী গাছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ইহার ডালে বা পাতায় বোঁটার কোনো স্থানে বিদ্যুৎ দ্বারা বা অন্য কোনো প্রকারে উত্তেজনা প্রয়োগ কর ;—দেখিবে, সেই উত্তেজনা তাহার অন্য অঙ্গে গিয়া সেখানকার পাতাগুলিকে বুজাইয়া দিবে। সুতরাং, প্রাণিদেহের স্নায়ু-জাল যেমন উত্তেজনাকে বহিয়া লইয়া যায়, লজ্জাবতীর দেহের সেই রকমই একটা কিছু উত্তেজনা বহন করিয়া লইয়া যায়, ইহা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। লজ্জাবতী লইয়া পরীক্ষা করার সময়ে

ইহাই জগদীশচন্দ্রের মনে হইয়াছিল এবং পরে নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া প্রাণীর দেহের মতো উদ্ভিদেরও দেহ যে সত্যই স্নায়ু-জালে আবৃত, তাহা তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

লজ্জাবতীর দেহের এক অংশে উত্তেজনা দিলে, তাহা যে দূরের পাতাতে পৌঁছায়, ইহা উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ জানিতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে কেন উদ্ভিদের স্নায়ুগুলীর অনুসন্ধান করেন নাই, তাহা বুঝা যায় না। উদ্ভিদের দেহে উত্তেজনা পরিবহন সম্বন্ধে ইঁহারা যে সকল ব্যাখ্যান প্রদান করেন, জগদীশচন্দ্র তাহার প্রত্যেকটির অসারতা প্রমাণ করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন।

ফেফার (Pfeffer) সাহেব একজন নামজাদা উদ্ভিদ্-তত্ত্ব-বিদ্। তিনি লজ্জাবতীর ডালে ছুরির খোঁচা দিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে আহত স্থান হইতে রস বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং দূরের পাতা বুজিয়া আসিয়া আঘাতের বেদনা জানাইয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি ভাঙ্গা গাছের ডালকে জলপূর্ণ রবারের নলের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, রবারের নলের গায়ে ছিদ্র করিলে তাহার ভিতরকার জল বাহিরে আসিয়া যেমন নলটিকে তুব্‌ড়াইয়া ফেলে, গাছের ডালেও ঠিক সেই রকমেরই ব্যাপার ঘটে। গাছের ডাল ঠিক জলপূর্ণ রবারের নলেরই অবস্থায় থাকে। সুতরাং যেই তাহার গায়ে ছুরির খোঁচা মারা যায়, অমনি ভিতরের রস বাহিরে আসিয়া ডালের ভিতর রসের চাপ কমাইয়া ফেলে। এই চাপের হ্রাসেই লজ্জাবতীর পাতা গুটাইয়া আসে।

রিকা (Ricca) সাহেবও একজন বড় বৈজ্ঞানিক। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। ইনিও ফেফার সাহেবের মতো লজ্জাবতীর দেহে ছুরির খোঁচা মারিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে দূরের পাতাগুলি জোড় বাঁধিয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার ব্যাখ্যানে তিনি বলেন,—ছুরির ঘায়ে গাছের আহত স্থানে হার্মোন্ (Harmone) নামে এক রকম বিষের উৎপত্তি হয়। তার পরে সেই বিষ উদ্ভিদের স্বাভাবিক রস-প্রবাহের সঙ্গে পাতার গোড়ায় পৌঁছিলে, পাতা জোড় বাঁধিয়া সাড়া দেয়।

ফেফার ও রিকা সাহেবের এই দুইটি পৃথক্ সিদ্ধান্ত আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র কি প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন, আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই দেখা যায়, ছুরির খোঁচা বা সেই রকম কোনো বড় রকমের আঘাত প্রয়োগ না করিলে উত্তেজনা উদ্ভিদের দেহ দিয়া চলে না, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, প্রাণীদের মতো উদ্ভিদ্ উত্তেজনশীল নয়। সুতরাং বেশি রকম আঘাত না দিলে তাহারা সাড়া দেয় না। এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, আচার্য বসু প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি লজ্জাবতীর দেহে অতি মৃদু বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতেও গাছটির দূরবর্ত্তী পাতাগুলি জোড় বাঁধিয়া সাড়া দিয়াছিল। কেবল ইহাই নয়, যে মৃদু উত্তেজনার বেদনা প্রাণীরা অনুভব করিতে পারে না, সেই রকম উত্তেজনাতেও তিনি উদ্ভিদ্‌কে সাড়া দিতে দেখিয়াছিলেন। দেহে ছুরির খোঁচা দেওয়া গেল না এবং ক্ষত হইতে রসও বাহির হইল না, তবে উদ্ভিদ্-দেহে কি প্রকারে উত্তেজনা বাহিত হইল? জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন,—প্রাণিদেহের মতই উদ্ভিদ্-দেহে স্নায়ুজাল আছে এবং তাহা প্রাণীর স্নায়ুর মতই উত্তেজনশীল। ইহা মৃদু উত্তেজনাকে বহিয়া দূরে লইয়া যায়। উদ্ভিদ্-দেহে উত্তেজনা চলাচল সম্বন্ধে প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি যে মিথ্যা, এই পরীক্ষাতে প্রমাণিত হইয়া যায়। কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এখানেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আরো অনেক পরীক্ষায় সেগুলির অসত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

রিকা সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ক্ষত স্থানে যে উত্তেজক বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাই দেহের ভিতরকার রস-প্রবাহের সহিত চলিয়া লজ্জাবতীর দূরবর্তী পাতাকে গুটাইয়া দেয়। যেমন নর্দ্দামার জল নীচু হইতে উপরের দিকে যায় না তেমনি উদ্ভিদের দেহের রস-প্রবাহ কখনই উপর হইতে নীচে নামে না। উহা পরীক্ষিত ধ্রুব সত্য।' সুতরাং রিকা সাহেবের কথা সত্য হইলে বলিতে হয়, উদ্ভিদ্-দেহের আঘাতের উত্তেজনা রসের সঙ্গে সঙ্গে কেবল নীচু হইতে উপর দিকেই চলিতে পারে. তাহা যে উপর হইতে নীচের দিকে নামিবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় অতি সামান্য উত্তেজনাকেও উদ্ভিদ্-দেহের উপর হইতে নীচের দিকে সুস্পষ্ট নামিতে দেখাইয়াছেন। কাজেই বলিতে হয় ফেফার ও রিকা সাহেব যে দুইটি পৃথক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটুও সত্য নাই।

পরপৃষ্ঠার চিত্রখানির প্রতি পাঠক দৃষ্টিপাত করুন। চিত্রের (a) চিহ্নিত অংশটি উত্তেজনা প্রয়োগের শলাকা। (b) চিহ্নিত অংশটি সামান্য উত্তেজনা-প্রয়োগের চিত্র। দেখুন - স্থানে উত্তেজনা-প্রয়োগে গাছের ডালের উঁচু নীচু উভয় দিকেই উত্তেজনা চলিতেছে। (c) চিহ্নিত অংশটি প্রবল উত্তেজনা-প্রয়োগের চিত্র। দেখিলেই বুঝা যাইবে, s স্থানে উত্তেজনা-প্রয়োগে তাহা ডাইন পাশ দিয়া উপরে উঠিয়াছে এবং পরে তাহাই বাম পাশ দিয়া নীচে নামিতেছে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল দেখিয়া এই সব চিত্র আঁকা হইয়াছে। ইহা দেখিলে উদ্ভিদ্-দেহের উত্তেজনা-পরিচলন-সম্বন্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলি যে কত নিরর্থক, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—উদ্ভিদ্-দেহের উত্তেজনা যে প্রাণিদেহের মতো স্নায়ুর সাহায্যে চলাফেরা করে, তাহার প্রমাণ

কোথায়? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বহু পরীক্ষা দেখাইয়া স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এখন আমরা সেই সকল পরীক্ষার একটু পরিচয় দিব। স্নায়ুর একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে
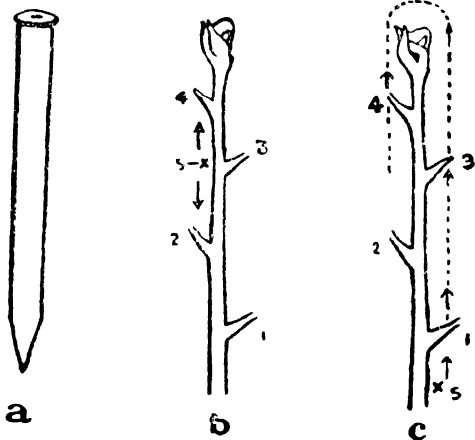
কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহার স্নায়ুর উত্তেজনা-পরিবাহন শক্তিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রাণীর শরীরে খুব ঠাণ্ডা দাও, দেখিবে, তাহার স্নায়ুজালের উত্তেজনা-পরিবাহন-শক্তি কমিয়া আসিতেছে এবং ঠাণ্ডার পরিমাণ অধিক হইলে স্নায়ুজাল একেবারে অসাড় হইয়া পড়িতেছে। বিষ-প্রয়োগেও তাহাই দেখা যায়। দেহের সুস্থ স্নায়ুতে বিষ দিলে, তাহা আর উত্তেজনা বহন করিতে পারে না। শরীরের কোনও অংশের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইতে থাক; দেখিবে, সেই স্থানের স্নায়ু অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। তখন তাহা আর উত্তেজনা বহন করিতে পারিবে না। এইগুলি প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলীর বিশেষ ধর্ম্ম। উদ্ভিদের দেহের ভিতর দিয়া উত্তেজনা পরিচলনের সময়ে যদি এই সকল ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উদ্ভিদ্ স্নায়ুরই সাহায্যে

উত্তেজনা বহন করে, বলা যায় না কি? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের স্নায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার সময়ে এই যুক্তিরই আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি শত শত পরীক্ষায় স্নায়ুর উত্তেজনা-বহনের সহিত উদ্ভিদের উত্তেজনা-বহনের এত সূক্ষ্ম মিল দেখিতে পাইয়াছেন যে, তাঁহার কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। উদ্ভিদ্ বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়া দেহের ভিতর দিয়া কত বেগে উত্তেজনা পরিচালনা করে, তাহা স্বরচিত Resonant Recorder নামক যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশ-চন্দ্র স্থির করিয়া এই সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্যের সহিত এবং বাহিরের শীতাতপের সহিত প্রাণীর স্নায়ু-জালের উত্তেজনা-বহনের গূঢ় সম্বন্ধ আছে। উদ্ভিদের উত্তেজনা-বহনে জগদীশচন্দ্র অবিকল সেই সকল সম্বন্ধও আবিষ্কার করিয়াছেন। শীতে জড়সড় হইয়া পড়িলে প্রাণীর স্নায়ু তাড়াতাড়ি উত্তেজনা বহন করিতে পারে না; কিন্তু গরম পাইলে সেই স্নায়ুই সবেগে উত্তেজনা বহিতে থাকে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদেও তাহাই দেখাইয়াছেন। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে উদ্ভিদ্গণ তাড়াতাড়ি উত্তেজনা চালনা করে। মোটা প্রাণীর দেহের স্নায়ু ঢিলাঢালা রকমে কাজ করে। তাহা কোন উত্তেজনাকে তাড়াতাড়ি বহন করিতে পারে না। কিন্তু সরু ছিপ্‌ছিপে প্রাণীর স্নায়ুতে ঠিক তাহার উল্টা কাজ দেখা যায়,—ইহাদের স্নায়ু তাড়াতাড়ি উত্তেজনা বহন করে। উদ্ভিদেও এই ব্যাপারটি অবিকল ধরা পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় মোটা ডালের চেয়ে সরু ডালের ভিতর দিয়া উত্তেজনা তাড়াতাড়ি চলাফেরা করিয়াছিল। সতেজ তরু লজ্জাবতীর পাতার বোঁটার ভিতরে উত্তেজনা-পরিচলনের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় যোল ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। মানুষ, গরু প্রভৃতি উন্নত প্রাণীর স্নায়ু যে বেগে উত্তেজনা বহন করে, তাহার তুলনায় ইহা অল্প বটে, কিন্তু নিকৃষ্ট

প্রাণীর স্নায়ুর তুলনায় ইহাকে কখনই অল্প বলা যায় না। Anodon প্রভৃতি প্রাণীর স্নায়বিক বেগ ইহা অপেক্ষা অনেক কম। উদ্ভিদের স্নায়ুর কার্য্যকরী শক্তি উন্নত ও অনুন্নত প্রাণীদের স্নায়ু শক্তির মাঝামাঝি।

পাঠক এখন পরপৃষ্ঠার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। অধিক শৈত্য-প্রয়োগে গাছের স্নায়ুর উত্তেজনা-বহনের শক্তি ক্রমে কমিয়া কি প্রকারে লোপ পাইয়াছিল, ইহা চিত্রদৃষ্টে বুঝা যাইবে। চিত্রের 1 চিহ্নিত অংশ সুস্থ লজ্জাবতীর বোঁটার সাড়ালিপি। বোঁটায় অল্প ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিলে, তাহার উত্তেজনা-বহনের বেগ কেমন কমিয়া
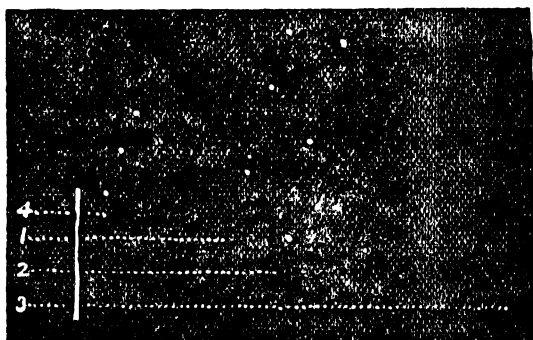
আসিয়াছিল, তাহা (2) চিহ্নিত অংশে লিপিবদ্ধ আছে। (3) চিহ্নিত চিত্রে বরফ-জল প্রয়োগের ফল আঁকা আছে। দেখুন, বরফ-জলের ঠাণ্ডায় বোঁটার স্নায়ু আর উত্তেজনা বহন করিতে পারিতেছে না। ইহার পরে জগদীশচন্দ্র গাছটির পত্র-মূলে (Pulvinus) উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। (4) চিহ্নিত অংশটি দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহাতে গাছটি কেমন স্বাভাবিক ভাবে উত্তেজনা বহন করিতেছে।

মানুষের পক্ষাঘাত রোগ হইলে ডাক্তার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দেহের রোগাক্রান্ত স্থানে বিদ্যুৎ-প্রবাহের চালনা করেন। ইহাতে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা-বহনশক্তি ফিরিয়া আসে,—রোগী ব্যাধিমুক্ত হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইয়া অবিকল ঐ ফলই পাইয়াছেন। খুব ঠাণ্ডা পাইবার পরে যখন গাছের স্নায়ুজাল পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর স্নায়ুর ন্যায় অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তিনি সেই সকল স্নায়ুর ভিতরে বিদ্যুতের প্রবাহ চালনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অল্প কালের মধ্যে স্নায়ুগুলি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। আশ্চর্য্য নয় কি?

পটাসিয়াম্ সাইনাইড্ একটা ভয়ানক বিষ। অতি অল্প মাত্রায় প্রাণিদেহে প্রবেশ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই বিষ-মিশ্রিত জলের পটি লজ্জাবতীর বোঁটায় লাগাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যে সকল স্নায়ু একটু আগে সবেগে উত্তেজনা বহন করিতেছিল, পাঁচ মিনিট পরে তাহারা আর উত্তেজনা বহন করিতে পারে নাই। বিষের ক্রিয়ায় স্নায়ুর কার্য্য একেবারে লোপ পাইয়াছিল।

প্রাণিশরীরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করিলে অবস্থা-বিশেষে স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে প্রবাহের কার্য্য নানা প্রকার হয়। ইহা একটা সুপরীক্ষিত ব্যাপার,—প্রাণিতত্ত্ববিদ্ মাত্রেই ইহার কথা জানেন। প্রাণিশরীরের ভিতর দিয়া হঠাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা কর; দেখিবে যেস্থান হইতে প্রবাহ দেহের বাহিরে আসিতেছে সেখানকারই স্নায়ু উত্তেজিত হইতেছে। এই প্রবাহকে হঠাৎ রোধ কর; এখন দেখিবে যে স্থানে প্রবাহ শরীরে প্রবেশ করিতেছিল, সেখানকার স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইতেছে। লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের দেহে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালাইয়া জগদীশচন্দ্র অবিকল এই ফলই পাইয়াছেন।

প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা-বহনের সহিত উদ্ভিদের উত্তেজনা বহনে৷ এত খুঁটিনাটি মিল দেখিয়া বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। উদ্ভিদের দেহ প্রাণিদেহেরই মতো যে স্নায়ুজালে আচ্ছন্ন, এই সকল পরীক্ষালব্ধ ফলের কথা শুনিলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হয়। যে ক্রিয়ায় প্রাণিদেহের উত্তেজনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বাহিত হয়, উদ্ভিদ্-দেহের উত্তেজনা-বহনে সেই ক্রিয়াই বর্ত্তমান।
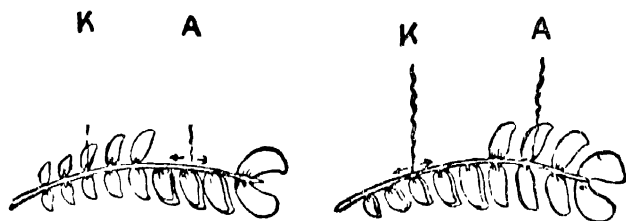
উপরের চিত্রটি দেখুন। বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিয়া পরীক্ষা করায় উদ্ভিদের স্নায়ু কি প্রকারে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে আঁকা হইয়াছে। বাম দিকের চিত্রে উত্তেজনা বাম হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া পাতা গুটাইতেছে। প্রবাহ যেস্থান হইতে বাহির হইয়াছিল, সেই স্থানের স্নায়ু উত্তেজিত হওয়ায়, ইহা দেখা গিয়াছিল। তার পরে সেই প্রবাহকে হঠাৎ রোধ করায় যাহা হইয়াছিল, চিত্রের ডাইন দিকের অংশে তাহা আঁকা আছে। এখানে স্নায়ু-অবলম্বনের উত্তেজনা বিপরীত দিকে দিকে চলিতেছে। অর্থাৎ যেখানে প্রবাহ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই স্থানেরই স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছে।

দেহ-ব্যবচ্ছেদে স্নায়ুর আবিষ্কার

প্রাণিদেহের ন্যায় উদ্ভিদ্-দেহেও যে স্নায়ু আছে, পূর্ব্ব অধ্যায়ের বিবরণ হইতে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কেবল ইহা নয়, উদ্ভিদের স্নায়ুর ক্রিয়া যে প্রাণীর স্নায়ুর ক্রিয়ার অনুরূপ, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রাণীর স্নায়ু কোথায় অবস্থিত, তাহা প্রত্যক্ষ দেখানো যায়। উদ্ভিদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার স্নায়ু বাহির করিবার জন্য সার্ জগদীশচন্দ্র দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে ফল পাইয়াছেন, তাহার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাণীর স্নায়ুজালকে যেমন চোখে দেখা যায়, এবং নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করা যায় জগদীশচন্দ্র ঠিক সেই রকমেই উদ্ভিদের স্নায়ু-সূত্রগুলিকে চোখে দেখাইয়া নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। উদ্ভিদ প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলী নাই,—ইত্যাদি কথা যাঁহারা প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা এই ব্যাপারে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার সত্যই জীবতত্ত্বে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

যাহা হউক, জগদীশচন্দ্র কি প্রকারে উদ্ভিদ্-দেহের স্নায়ুসূত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন, এই অধ্যায়ে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

এক দেশ হইতে দেশান্তরে টেলিগ্রাম্ পাঠাইবার জন্য সমুদ্রের তলায় যেসব মোটা মোটা ধাতুর তার থাকে, সেগুলিকে গাটাপার্চ্চা প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ দিয়া মুড়িয়া রাখা হয়। আমরা পরীক্ষাগারে যেসব বিদ্যুতের তার ব্যবহার করি, সেগুলিতেও রেশমের সূতা জড়ানো থাকে।

রেশম, গটাপার্চ্চা প্রভৃতি দ্রব্য বিদ্যুৎ পরিচালনা করিতে পারে না। সেই জন্য এই সকল তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে কি না, তাহা বাহির হইতে জানা যায় না; জানিতে গেলে একটা ছুঁচ্ দিয়া অপরিচালক আবরণকে ভেদ করিতে হয়। তার পরে সেই ছুঁচ্ যেই ভিতরকার ধাতু তারের সংস্পর্শে আসে, অমনি ছুঁচ্-সংলগ্ন তড়িদ্বীক্ষণ (Galvanometer) যন্ত্রে বিদ্যুতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রের শলাকার এই রকম বিচলন দেখিয়া সমুদ্র-তলের তার দিয়া কোনো সঙ্কেত চলিতেছে কি না, অনায়াসে জানা যায়। কেবল তাহাই নয়, তারের উপরকার আবরণের গভীরতা কত, তাহাও ছুঁচ কতটা ভিতরে প্রবেশ করিল দেখিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। উদ্ভিদের স্নায়ু-সূত্রগুলিকে টেলিগ্রাফের তারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সমুদ্রতলের তারগুলিকে আমরা যেমন গটাপার্চ্চা প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থে মুড়িয়া রাখি, উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্রগুলি সেই প্রকারে তাহার দেহের অপরিচালক কাঠের মধ্যে লুকানো থাকে। তাই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে কিনা জানিতে গেলে যেমন ছুঁচ্ ফুটাইয়া তারের সন্ধান করিতে হয়, উদ্ভিদের স্নায়ুর সন্ধান করিতে গেলে, তাহারও গায়ে ছুঁচ্ ফুটাইতে হয়। ছুঁচ্ অপরিচালক কাঠের আবরণ ভেদ করিতে করিতে যেই স্নায়ু-সূত্রের সংস্পর্শে আসে, তখনই স্নায়ু নিজের অস্তিত্ব নিজেই প্রকাশ করিতে থাকে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই প্রণালীতেই উদ্ভিদের স্নায়ু এবং তাহার স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন।

পাঠক পরপৃষ্ঠার চিত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। লজ্জাবতীর পাতার বোঁটার ভিতরে কোথায় স্নায়ু সূত্র আছে, নির্ণয় করার জন্য যে পরীক্ষা হইয়াছিল, ইহা তাহারই চিত্র। ইহার 'ক' চিহ্নিত অংশটি বৈদ্যুতিক ছুঁচ্ (Electric Probe)। ইহার সহিত 'গ' চিহ্নিত বিদ্যুদ্বীক্ষণ যন্ত্রের তার সংযুক্ত থাকে,—যন্ত্রের শলাকার বিচলন দেখিয়া বিদ্যুতের চলাচল

ধরা যায়। 'ঘ' চিহ্নিত স্ক্রুকে ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক ছুঁচটিকে পাতার বোঁটায় ইচ্ছামত প্রবেশ করানো যায়। ছুঁচ্ উদ্ভিদের দেহের কতটা ভিতরে প্রবেশ করিল চিত্রের 'ঙ' চিহ্নিত অংশ হইতে তাহা জানা যায়। উদ্ভিদের স্নায়ু-সূত্রের সন্ধান করিবার সময়ে জগদীশচন্দ্র ঠিক চিত্রের অনুরূপ যন্ত্র সাজাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি যন্ত্রের 'ঘ' চিহ্নিত স্ক্রুটি ঘুরাইয়া পাতার বোঁটায় ছুঁচ্ প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ছুঁচ
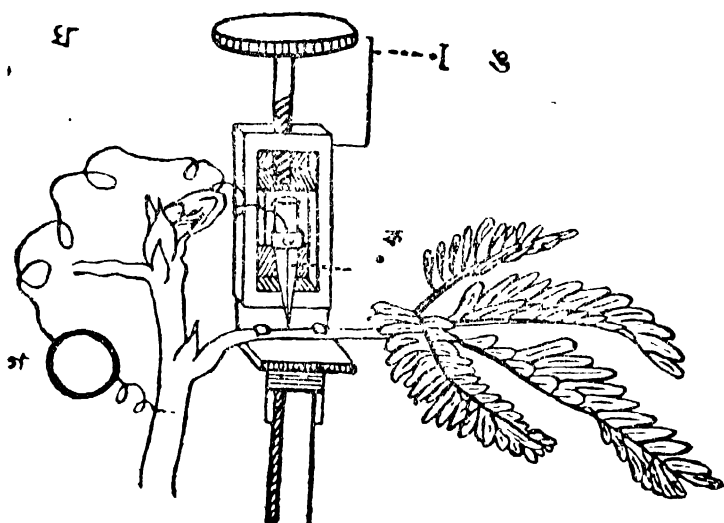
ধীরে অতি ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল,—কিন্তু প্রথমে স্নায়বিক উত্তেজনার লক্ষণ ধরা পড়িল না। ছুঁচ আরো নামিল,—এইবারে মৃদু স্নায়বিক লক্ষণ ধরা গেল। ইহার পরে যখন তাহাকে আরো ভিতরে প্রবেশ করানো গেল, তখন স্নায়ুর উত্তেজনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ছুঁচ্ কত নীচে নামিয়া স্নায়ুর সাড়া পাইল. জগদীশচন্দ্র তাহা লিখিয়া রাখিলেন। কিন্তু ছুঁচটিকে এখনো ভিতরে প্রবেশ

করানো হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, স্নায়ুব সাড়া আর পাওয়া যাইতেছে না। বুঝা গেল ছুঁচ্ স্নায়ু-সূত্র ছাড়িয়া এখন অপরিচালক কাঠের ভিতর দিয়া চলিতেছে। ছুঁচটিকে আরো নীচে প্রবেশ করানো হইল,—হঠাৎ আবার স্নায়বিক সাড়া প্রকাশ পাইল। বুঝা গেল, সেটি আবার আর এক গোছা স্নায়ু-সূত্রের গায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ছুঁচ্ কত দূর নামিয়া নূতন স্নায়ুর সন্ধান পাইল, তাহাও লিখিয়া রাখা হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই প্রকার পরীক্ষা করিয়াই উদ্ভিদ্-দেহে স্নায়ু ও তাহার স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাণিদেহের যে বিশেষ অংশ উত্তেজনা বহন করিয়া পেশীকে সঙ্কুচিত করে বা মস্তিষ্কে অনুভূতি জন্মায়, তাহাই প্রাণীর স্নায়ু। সুতরাং উদ্ভিদ্-দেহের যে বিশেষ অংশ অবিকল সেই প্রকারেই উত্তেজনা বহন করে, তাহাকে আমরা স্নায়ু বলিব না কেন?

উদ্ভিদ্-দেহের ভিতরকার কোন্ অংশ স্নায়ু, তাহা পাতার বোঁটাকে ও ডালকে চিরিয়া জগদীশচন্দ্র সকলকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। পাঠক পরপৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন। পাতার বোঁটা ও ডালকে আড়াআড়ি (transverse) ভাবে চিরিলে, তাহার ভিতরকার যে কোষ-সজ্জা নজরে পড়ে, তাহা চিত্রের বাম দিকের অংশে আঁকা আছে। ডাইনের অংশ সেগুলিকে লম্বালম্বি-ভাবে চিরিয়া দেখার চিত্র। বলা বাহুল্য, ছোট বোঁটা বা ডালকে চিরিয়া অনুবীক্ষণে দেখিলে যে রকমটি দেখায়, ছবি সেই রকম বড় করিয়া আঁকা হইয়াছে। চিত্রের "C" চিহ্নিত অংশটি Cortex ; 'S' অংশ Sclerenchyma ; 'P' বহিঃস্থ Phloem ; "x" অংশ xylem অর্থাৎ কাঠ ; "P'" ভিতরের Phloem ; এবং "O" অংশটি ডালের অসার ভাগ। চিত্রে যে বিন্দুময় (Dotted) রেখাটি দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ব-পরীক্ষায় ছুঁচটি যে পথ ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাই সূচনা করিতেছে। ছবি দেখিলেই বুঝা যাইবে,

Cortex, Sclerenchyma প্রভৃতি যে সকল অংশ লইয়া গাছের ছাল গঠিত, তাহার ভিতর দিয়া চলিবার সময় ছুঁচের ডগায় স্নায়ু-সূত্র ঠেকে নাই। xylem অর্থাৎ কাষ্ঠময় অংশেও স্নায়ু নাই। ছুঁচ যেই চিত্রের "P" চিহ্নিত Phloem নামক অংশে প্রবেশ করিয়াছিল, অমনি স্নায়ুর উত্তেজনা ধরা পড়িয়াছিল। ইহার পরে ছুঁচ চালাইয়া আর সাড়া পাওয়া যায় নাই। শেষে সেটি "P′" চিহ্নিত ভিতরকার Phloem-এ
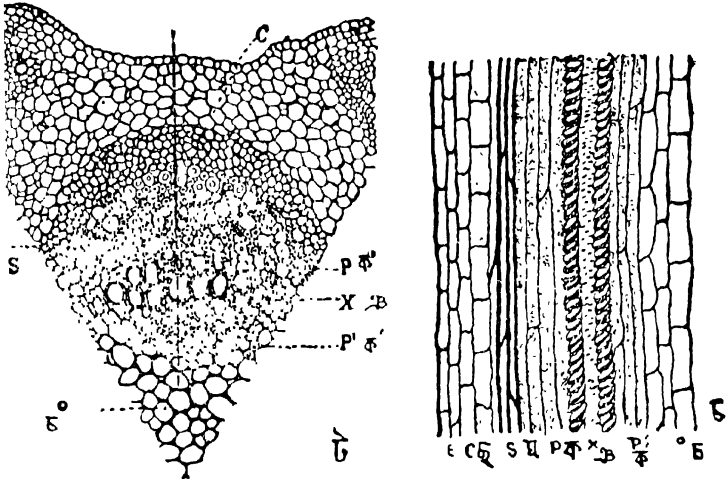
পৌঁছিয়াছিল, তখন আবার সাড়া দেখা গিয়াছিল। এই পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছিলেন, উদ্ভিদ্-দেহের ছাল, দারুময় অংশ বা তাহার অসার অংশে স্নায়ুসূত্র থাকে না; স্নায়ু থাকে তাহার দেহের Phloem নামক দুইটি অংশে। তাহা হইলে দেখা গেল, উদ্ভিদের দেহে একটি স্নায়ু-গুচ্ছ থাকে না;—ছালের কিছু নীচে একটা এবং আরও গভীর অংশে আরও একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ স্নায়ু-গুচ্ছ দেখা যায়। উদ্ভিদ্-

দেহে এই যুগ্ম স্নায়ু-বিন্যাসের প্রয়োজন কি, তাহাও জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব।

মৃত প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে তাহার কোথায় কি প্রকারে স্নায়ু বিন্যস্ত আছে, চাক্ষুষ দেখা যায়। অধ্যাপক যখন স্নায়ু-বিন্যাস সম্বন্ধে পাঠ প্রদান করেন, তখন ঐ প্রকারে প্রাণিদেহের স্নায়ু বাহির করিয়া
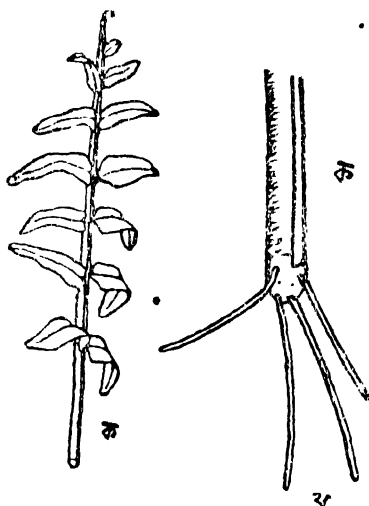
ছাত্রদিগকে দেখাইয়া থাকেন। জগদীশচন্দ্র সুকৌশলে উদ্ভিদের স্নায়ু-গুচ্ছগুলিকে অন্য অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া সকলকে দেখাইয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, প্রাণিবিদ্ যেমন ভেকের স্নায়ু-সূত্রে উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া তাহার পেশীর সঙ্কোচ ইত্যাদি দেখাইয়া থাকেন, জগদীশচন্দ্র গাছের স্নায়ু-গুচ্ছ বাহির করিয়া অবিকল সেই প্রকারের অনেক পরীক্ষাও দেখাইয়াছেন। পাঠক পরপৃষ্ঠার চিত্রখানি দেখুন। ইহা ফার্ণ-জাতীয় একটি গাছের পাতার স্নায়ুর চিত্র। দেখুন,

দেহের অপরিচালক অংশ হইতে স্নায়ু-গুচ্ছগুলিকে যেমন পৃথক করা হইয়াছে। প্রাণীর স্নায়ু-সূত্রের মতোই এগুলির রঙ সাদা এবং সেই প্রকার দীর্ঘ ও কোমল। "ক" অংশ সম্পূর্ণ পাতার চিত্র; "খ" অংশ সেই পাতার বোঁটারই চারিটি স্নায়ু-সূত্র।
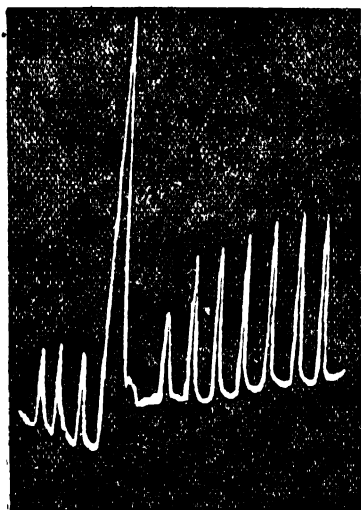
ভেকের স্নায়ুর সাড়া-লিপি

দীর্ঘকাল অলস হইয়া থাকিলে প্রাণীর স্নায়ু সহজে সাড়া দিতে চায় না। কিন্তু সেই অলস স্নায়ুতে কিছু ক্ষণ ধরিয়া বার বার উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, তাহা জাগিয়া উঠে। তখন অল্প উত্তেজনাতেই সে সাড়া দিতে আরম্ভ করে। উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলীতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অবিকল এই ধর্ম্মগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন। পরপৃষ্ঠার চিত্রখানি

ভেকের স্নায়ুব সাড়া-লিপি। কোনো উত্তেজনা দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় ভেকের স্নায়ু যে প্রকারে সাড়া দিয়াছিল, প্রথম তিনটি তরঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার পরে জগদীশচন্দ্র বার বার উত্তেজনা দিয়া সেই স্নায়ুকে সজাগ করিয়াছিলেন। জাগরিত হইবার পরে স্নায়ুর সাড়া কি প্রকার বাড়িয়া গিয়াছিল, পাঠক চিত্রের ডাইন দিক্‌টা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত ফার্ণ-গাছের স্নায়ু লইয়া এই প্রকার
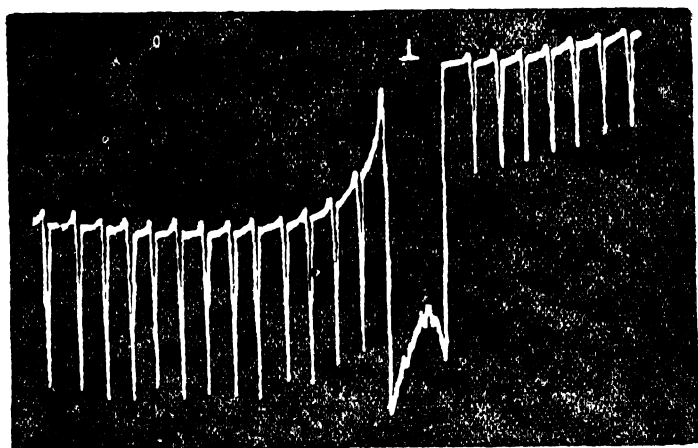
ফার্ণের স্নায়ুর সাড়া-লিপি

পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র অবিকল একই ফল পাইয়াছিলেন। পরপৃষ্ঠার চিত্রখানি তদবস্থ ফার্ণ-গাছের স্নায়ুর সাড়া-লিপি। স্নায়ু স্বাভাবিক ভাবে উত্তেজনা বহন করিয়া যে সাড়া দিতেছিল, চিত্রের বাম দিকে তাহা লিপিবদ্ধ আছে। তার পর পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা প্রয়োগ করায় সেই স্নায়ুই জাগিয়া উঠিয়া যে প্রকারে সাড়া বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা চিত্রের "T" চিহ্নিত অংশেব ডাইন ধারে দেখা যাইবে।

আর কত লিখিব ? জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের স্নায়ুর যে সকল কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির সহিত প্রাণীর স্নায়ুর কার্য্যের অত্যাশ্চর্য্য মিল আছে। জীব-তত্ত্ববিদ্‌গণ এ পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্‌কে কেন প্রাণী হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বুঝা যায় না।

বাহিরের উত্তেজনা ও তাহার অনুভূতি

মানুষ এবং অপর উন্নত প্রাণীরা যে-উপায়ে বহিঃপ্রকৃতির সহিত যোগ রক্ষা করে, তাহা একটা প্রকাণ্ড রহস্য। বাহিরের বাতাসে ঢেউ উঠিল, অমনি আমরা শব্দ শুনিতে পাইলাম; কোন্ সুদূর প্রদেশে ঈথরের কণা কাঁপিতে লাগিল, অমনি আমাদের চোখ্ আলোক দেখিল; হঠাৎ দক্ষিণের শীতল বাতাস গায়ে ঠেকিল, সঙ্গে সঙ্গে দেহ পুলকে ভরিয়া গেল। এগুলি কম রহস্যময় ঘটনা নয়! বিজ্ঞান ইহাদের মোটামুটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাণীর চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল বহিঃপ্রকৃতির উত্তেজনাকে স্নায়ু-সূত্র দিয়া দেহের ভিতরে লইয়া যায়, ইহাতেই ঐ সকল বিচিত্র অনুভূতির উৎপত্তি হয়। আবার দেখা যায়, সব অনুভূতি আমাদের নিকটে সমান প্রভাব বিস্তার করে না। বাঁশীর শব্দ আমাদের নিকটে যেমন প্রীতিকর বোধ হয়, বজ্রের ধ্বনি সে রকম হয় না,—তাহা পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকার তাপ, আলোক প্রভৃতি মৃদু উত্তেজনায় আমাদের দেহ আরাম পায়, কিন্তু সেইগুলিই যখন তীব্র হইয়া ইন্দ্রিয়কে আহত করে, তখন বেদনার সৃষ্টি হয়।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, বাহির হইতে যে সকল উত্তেজনা আমাদের ইন্দ্রিয়ে আসিয়া ঠেকে, তাহাদের ক্রিয়া দুই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়। উত্তেজনা তীব্র হইলে তাহার অনুভূতি তীব্র হয়। আবার যে-স্নায়ুজাল উত্তেজনাকে বহন করে, তাহা অবস্থা-বিশেষে তীব্রকে মৃদু এবং মৃদুকে তীব্র করিয়া আমাদের অনুভূতি জাগাইয়া তুলে। অর্থাৎ আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলী যে-ভাবে বাহিরের উত্তেজনাকে দেহের ভিতর দিয়া চালায়, অনুভূতি তাহারই অনুরূপ

হয়। অতি মৃদু উত্তেজনা দেহ স্পর্শ করিয়া আমাদের স্নায়ুকে চঞ্চল করিতে পারে না, তাই বাহিরের অতিমৃদু উত্তেজনা আমরা অনুভব করিতে পারি না। আবার প্রবল উত্তেজনায় আমাদের স্নায়ু-মণ্ডলী এত বেশি চঞ্চল হইয়া পড়ে যে, তাহা পীড়াদায়ক হয়। আমাদের স্বদেশবাসী মহাপণ্ডিত সার্ জগদীশচন্দ্র বসু তাহার Plant Autograph নামক নব-প্রকাশিত পুস্তকে বাহিরের উত্তেজনা ও তাহার অনুভূতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে আমরা তাহারই পরিচয় দিব।

বহিঃপ্রকৃতিতে যে সব প্রবল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার উপরে মানুষের হাত নাই। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ-স্ফুরণে বাতাসে এবং ঈথরে যে-আন্দোলন উপস্থিত হইল, মানুষ তাহাকে শান্ত করিতে পারে না। কিন্তু সেই আন্দোলন যখন স্নায়ুকে উত্তেজিত করিয়া প্রবল শব্দ শুনাইতে গেল, তখন মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে হউক বা অপর উপায়ে হউক সেই স্নায়বিক উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে না কি? সার জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন,—পারে না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। বহিঃপ্রকৃতির উত্তেজনা যখন আমাদের স্নায়ু-মণ্ডলীর ভিতর দিয়া চলে, তখন যদি আমরা তাহাকে কোন উপায়ে ইচ্ছামত প্রবল বা মৃদু করিতে সমর্থ হই, তবেই প্রশ্নটির মীমাংসা হইয়া যায়। তখন প্রকৃতির অতি প্রবল আঘাতে আমাদের অনুভূতি প্রবল হইতে পারিবে না। কেবল ইহাই নয়, প্রয়োজন হইলে বাহিরের মৃদু উত্তেজনাকেও প্রবলতর করিয়া আমরা অনুভব করিতে পারিব।

স্নায়ুসূত্রের ভিতর দিয়া উত্তেজনার চলা-ফেরার সঙ্গে ধাতু-তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের সঞ্চলনের অনেক সাদৃশ্য আছে। ধাতু তারের বিদ্যুৎ পরিবহন শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায় না। অর্থাৎ

একই তার দিয়া সর্ব্বদা সমানভাবে বিদ্যুৎ চলা-ফেরা করে। বিদ্যুতের শক্তি বৃদ্ধি কর, তারের ভিতর দিয়া বেশি বিদ্যুৎ চলিবে। বিদ্যুতের শক্তি কম করিয়া দাও, সেই অনুপাতে বিদ্যুতের পরিমাণও কমিয়া আসিবে। অর্থাৎ ধাতু-তার নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া বিদ্যুতের পরিচলনকে কম বা বেশি করিতে পারে না। আমাদের দেহের স্নায়ু-সূত্রের উত্তেজনা-পরিবহন-শক্তি যদি ধাতু-তারেরই মতো স্থির থাকিত, তাহা হইলে কেবল বাহিরের উত্তেজনার মাত্রা অনুসারেই আমাদের অনুভূতি নিয়মিত হইত। কাজেই, এক্ষেত্রে কোনো প্রাণী ইচ্ছা-অনুসারে তাহার অনুভূতির পরিবর্ত্তন করিতে পারিত না। সার্ জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন,—স্নায়ুর উত্তেজনা-বহন-শক্তি ধাতু-তারের বিদ্যুৎ-পরিবহন শক্তির মতো স্থির নয়, তাহা তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং প্রাণীর স্নায়ু অবস্থা-বিশেষে বাহিরের তীব্র উত্তেজনাকে মৃদু এবং মৃদু উত্তেজনাকে তীব্র করিতে পারে না,—এ কথা কেহই উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারেন না। জগদীশচন্দ্র যাহা দেখিয়াছেন, তাহা হইতে এখন নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার অনুভূতি যন্ত্রবৎ চলে না; ইহার পরিবর্ত্তন আছে।

স্নায়ু-সূত্রের উত্তেজনা-পরিবহন-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধিতে আমাদের কোন সুবিধা হয় কি? সুবিধা অবশ্যই আছে। বহিঃপ্রকৃতির প্রবল উত্তেজনাকে যখন আমরা স্নায়ু দ্বারা প্রয়োজন অনুসারে দমন করিতে পারিব, তখন প্রবল অনুভূতির বেদনা হইতে আমাদের মুক্তি হইবে। কেবল ইহাই নয়; বহিঃপ্রকৃতির যে সকল মৃদু উত্তেজনা আমাদের স্নায়ুকে উত্তেজিত করিতে না পারিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়াই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কোন উপায়ে স্নায়ুর পরিবহন-শক্তির বৃদ্ধি করিতে পারিলে তাহাদের বাণী আমরা জানিতে পারিব। ইহা কম লাভের বিষয় নয়। আমাদের পুরাণের তাপসকে যোগ

দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি ; যে-বাণী সাধারণের অগোচর তাঁহারা তাহাও শুনিয়াছেন। এই সকল কাহিনীর সকলি কি অলীক ? অলীক বলিতে ত এখন সাহস হয় না।

যাহা হউক, স্নায়ুর উত্তেজনা-বহন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র কি বলেন, এখন দেখা যাউক। স্নায়ু-সূত্র বাহিরের উত্তেজনায় যে-ধাক্কা পায়, তাহাতে উহার অণুর বিচলন ঘটে। তার পরে সেই বিচলনই স্নায়ুর অণু-পরম্পরায় চলিয়া দেহের ভিতরে প্রবেশ করে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধ করি সহজে বুঝা যাইবে। মনে করা যাউক, কতকগুলি কাঠের বল্‌কে গায়ে-গায়ে ঠেকাইয়া রাখা গিয়াছে। এখন শ্রেণীবদ্ধ বলের এক প্রান্তে ধাক্কা দিলে কি হয়, বলা যায় না কি ? প্রান্তস্থিত বলের ধাক্কায় তাহার পরবর্ত্তী বল ধাক্কা পায়, এবং ঐ প্রকারে ধাক্কাটি এক বল্‌ হইতে অপর বলে সংক্রমিত হইয়া দূরবর্ত্তী প্রান্তে পৌছায়। কিন্তু এই ধাক্কার পরিবহনে মাঝের বল্‌গুলির একটুও বিচলন দেখা যায় না। স্নায়ু-সূত্র বাহিরের উত্তেজনাকে এই রকমেই অণু-পরম্পরায় দেহের ভিতরে চালনা করে। উত্তেজনা বহনের সময়ে স্নায়ুর অণুগুলি বিচলিত না হইয়াই উত্তেজনাকে দূরে লইয়া যায়।

স্নায়ুর অণুগুলির চলধর্ম্মের (mobility) সহিত তাহার উত্তেজনা-বহন-শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে স্নায়ুর অণু যত চলধর্ম্মী, তাহা উত্তেজনা-বহনের পক্ষে ততই অনুকূল। ইহার শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মনে করা যাউক, একই স্নায়ু-সূত্র দিয়া পর পর যেন একই উত্তেজনা প্রবাহিত হইতেছে। এখন যদি কোনো প্রকারে সেই স্নায়ুর চলধর্ম্ম বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উত্তেজনাটিকে সবলে দ্রুত চলিতে দেখা যাইবে না কি ? সেই রকম কোনো প্রক্রিয়ায় স্নায়ুর অণুগুলির চলধর্ম্ম কমাইলে, উত্তেজনা

মৃদুভাবে চলিয়া শেষে হয় ত লোপ পাইয়া বসিবে। অধিক ঠাণ্ডায় এবং ক্লোরোফরম্ প্রয়োগে স্নায়ুর চলধর্ম্ম কমিয়া আসে। তাই ক্লোরোফরম্ বা ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিলে স্নায়ুর ভিতর দিয়া উত্তেজনাকে অতি মৃদুভাবে বহিতে দেখা যায়, এবং মাত্রা বেশি হইলে তাহার উত্তেজনা-বহন শক্তি একেবারে লোপ পাইয়া বসে। খুব বলশালী ব্যক্তি যদি কয়েক বৎসর বিছানায় শুইয়া কাটায়, তাহা হইলে তাহার চলৎ-শক্তি লোপ পায়। ইহা দেহের পেশীর অব্যবহারের ফল। স্নায়ুতেও ইহা দেখা যায়। যে-স্নায়ু দীর্ঘকাল উত্তেজনা বহন করে নাই, তাহা ক্রমে বহন-শক্তি হারায়। তার পরে ক্রমাগত উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, তাহাই আবার সবল হইয়া লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পায়। কেবল ইহাই নয়, কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া বার বার চিন্তা করিলে আমাদের চিন্তা শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

জগদীশচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার কথা মনে করিলে বলিতে হয়—যে-স্নায়বিক উত্তেজনা আমাদের অনুভূতি সৃষ্টি করে, তাহা কেবল মাত্র বহিঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নিয়মিত হয় না; স্নায়বিক অণু অবস্থাভেদে বাহিরের উত্তেজনাকে মৃদু বা প্রবল করিয়া আমাদের মধ্যে বিচিত্র অনুভূতির উৎপত্তি করে।

পদার্থের অণুমাত্রই জড়ধর্ম্মী। তাহা চালাইলে চলে, এবং নাড়াইলে নড়ে। যদি কোনো প্রকারে তাহাকে বিচলিত না করা যায়, তাহা হইলে সে চিরদিনই স্থির থাকে। এই কথাগুলি খুবই সত্য; কিন্তু তাহার কোনো এক নির্দ্দিষ্ট দিকে বিচলিত হইবার ঝোঁক্ নাই, একথা ঠিক নয়। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে কর, শেল্‌ফের তাকে এক সারি বই খাড়া করিয়া সাজানো আছে। এখন যদি দক্ষিণ প্রান্তের বইখানিতে ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না কি? তখন দক্ষিণের বইখানি তাহার

বামের বইখানির ঘাড়ে পড়ে। এই রকমে একের ধাক্কায় তাহার পরবর্ত্তী বই হেলিয়া গিয়া বইয়ের সারিটিকে বামে হেলাইয়া রাখে। এখন মনে করা যাউক, ধাক্কা দিবার পূর্ব্বেই যেন সমস্ত বইগুলিকে একটু করিয়া বামে হেলাইয়া রাখা গিয়াছে। এই অবস্থায় দক্ষিণ প্রান্তের বইখানিতে বামে ধাক্কা দিলে কি হয়, সহজেই অনুমান করা যায়। এখানেও প্রত্যেক বই তাহার পাশের বইয়ের উপরে পড়িয়া সমস্ত বইকে বামে হেলাইয়া ফেলিবে। কিন্তু খাড়া বইগুলিকে বামে হেলাইতে যত জোরে ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল, এখানে তত জোরের আবশ্যক হইবে না। বামে হেলিবার জন্য সেগুলির যে-একটা ঝোঁক্ পূর্ব্বেই ছিল, এখানে তাহার সাহায্যে বইগুলি অল্প ধাক্কায় হেলিয়া যাইবে। এখন ঈষৎ বামে হেলানো বইগুলিকে ডাইনে হেলাইতে গেলে কি হয়, দেখা যাউক। বইগুলির ঝোঁক আছে বামে হেলিবার জন্য, কাজেই, সেই ঝোঁককে কাটাইয়া ডাইনে হেলাইতে গেলে বইয়ে অনেক জোরে ধাক্কা না দিলে চলিবে না।

আর একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি ব্যক্তব্যটা আরো স্পষ্ট হইবে। মনে করা যাউক, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের তিন কোণায় তিন দল সৈন্য যুদ্ধ-সজ্জায় দাঁড়াইয়া আছে। এই তিন দলের প্রকৃতিও যেন তিন রকমের। প্রথম দলের লোকগুলি নিম্পরোয়া,—তাহাদের ভয় নাই, সাহসও নাই। দ্বিতীয় দলের লোকেরা অত্যন্ত সাহসী। ভয় কাহাকে বলে, তাহারা জানে না। তৃতীয় দলের প্রকৃতি আবার অন্য রকমের। তাহাদের মধ্যে, একটিও সাহসী লোক নাই, সকলেই অল্পে ভয় পাইয়া যায়। এখন মনে করা যাউক, শত্রু-পক্ষের একটি বোমা যেন প্রথম দলের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। দলের লোকেরা নিম্পরোয়া; সুতরাং প্রথমে তাহাদের মধ্যে একটু চঞ্চলতা দেখা দিবে, কিন্তু পরক্ষণেই আর সে চঞ্চলতা থাকিবে না। তা'র পরে মনে করা যাউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

দলের প্রত্যেকের সম্মুখে দুইটি বোমা ভীষণ শব্দে ফাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দল সাহসী,—সুতরাং আকস্মিক বিপদে তাহাদের মধ্যে যে চঞ্চলতা দেখা দিল, তাহা উহারা মনের জোরে থামাইয়া দিবে। কিন্তু তৃতীয় দল ইহা পারিবেন না। এই দল ভীরু. ইহার প্রকৃতি দ্বিতীয় দলের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ এই দদের প্রত্যেকেরই ঝোঁক পলাইবার দিকে। কাজেই. সম্মুখে বোমা ফাটিবামাত্র, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ছুটিয়া পলাইবে।

জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে দুই বিপরীত ঝোঁক থাকায় যেমন বাহিরেব উত্তেজনায় পৃথক্ ফল দেখা গেল, স্নায়ুব অণুগুলির মধ্যে যদি সেই রকম বিপরীত ঝোঁক থাকে, তবে তাহাব উত্তেজনা-বহনে ঐ রকম পৃথক্ ফল দেখারই সম্ভাবনা। তখন অবস্থা-বিশেষে বাহিরের অতিমৃদু উত্তেজনায় আমাদের প্রবল অনুভূতির সৃষ্টি হইবে এবং প্রবল উত্তেজনা ক্ষয় পাইয়া অতি-মৃদু অনুভূতির উৎপত্তি করিবে। কেবল ইহাই নয়, ঝোঁকেব মাত্রা যদি উত্তেজনার বিপরীতে অতি প্রবল থাকে, তবে স্নায়ুতে ধাক্কা দিয়া সেই উত্তেজনা লোপ পাইবে। তখন বাহিরের উত্তেজনায় প্রাণীর কোনো অনুভূতিই হইবে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র স্নায়ুব আণবিক ঝোঁকের এই ক্রিয়াব কথা কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। এই কল্পনা যে সত্য. তাহা তিনি জড়. উদ্ভিদ্ ও প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

কোন বাহিরের উত্তেজনাকে ইচ্ছা-অনুসারে প্রবল বা মৃদু করিতে হইলে, স্নায়ুর অণুগুলিতে তদনুরূপ ঝোঁক দিয়া তাড়াতাড়ি সাজানো প্রয়োজন। বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা সহজেই এই কাজটি করা চলে। মনে কবা যাউক, যেন কোন পাত্রস্থিত জলের ভিতর দিয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে বিদ্যুতের প্রবাহ চলিতেছে। বিদ্যুৎ জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া বুদ্বুদের অক্সিজেনকে ছাড়িয়া দেয়; বাকি হাইড্রোজেন থাকে প্রবাহের দক্ষিণে

তাহার পথ রোধ করিয়া। কাজেই, যত জোরেই প্রবাহ চলুক না কেন, তাহা ক্রমে মন্দীভূত হয় এবং হয়ত শেষে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এখন, প্রবাহের দিক পরিবর্ত্তন কর, অর্থাৎ তাহা দক্ষিণ হইতে বামে চলিতে থাকুক। দেখিবে, হাইড্রোজেনের কণা বিপরীত দিকে অর্থাৎ প্রবাহের বামে দাঁড়াইয়া তাহার গতিরোধ করিবে। স্নায়ু-সূত্রের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইয়া এবং তাহার দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া ইচ্ছানুসারে স্নায়ুর অণুগুলিকে উত্তেজনা-বহনের অনুকূল বা প্রতিকূল করা যাইতে পারে।

উদ্ভিদের এবং প্রাণীর স্নায়ু লইয়া পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র যে ফল পাইয়াছেন তাহা অদ্ভুত। পরীক্ষার পূর্ব্বে তিনি উদ্ভিদের স্নায়ুর অণুগুলিকে উত্তেজনা-বহনের অনুকূল করিয়া রাখিয়াছিলেন। তার পরে যে অতি মৃদু উত্তেজনা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য তাহাকেই সেই স্নায়ুর ভিতর দিয়া চালানো হইয়াছিল। ইহাতে উদ্ভিদের স্নায়ুকে প্রবল অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছিল। তার পরে সেই স্নায়ুর অণুগুলির যাহাতে বিপরীত দিকে ঝোঁকে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া প্রবল উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এই প্রবল উত্তেজনায় উদ্ভিদ্ অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। অর্থাৎ এই অবস্থায় বহিঃ-প্রকৃতির অতি প্রবল ধাক্কাকেও উদ্ভিদ্ অগ্রাহ্য করিয়াছিল।

এই ত গেল উদ্ভিদের কথা। প্রাণী লইয়া পরীক্ষা করায় জগদীশচন্দ্র যে ফল পাইয়াছেন, তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক। ব্যাঙের স্নায়ুর অণুগুলিকে উত্তেজনা-বহনের অনুকূল করিয়া অতি মৃদু উত্তেজনা প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ইহাতে অতীন্দ্রিয় প্রবল অনুভূতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তার পরে স্নায়ুর অণুগুলিকে উত্তেজনা বহনের প্রতিকূল করিয়া তাহার গোড়ায় তিনি লবণের ছিটা দিয়াছিলেন। কাটা ঘায়ে লবণের ছিটার উত্তেজনা অতিশয় প্রবল; কিন্তু অণুগুলির ঝোঁক প্রতিকূল থাকায় এই প্রবল উত্তেজনার অনুভূতি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। যে ব্যাঙ্

লবণের ছিটার উত্তেজনায় পা ছুড়িয়া বেদনা জানাইতেছিল, এখন তাহাতে একটুও বেদনার লক্ষণ দেখা যায় নাই।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্নায়ুর অণুগুলিকে যে উত্তেজনা-বহনের অনুকূল ও প্রতিকূল করা যায়, পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে তাহাতে একটুও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু মানুষের ন্যায় উন্নত প্রাণী তাহার ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে দেহের স্নায়ুকে উত্তেজনা-বহনের অনুকূল বা প্রতিকূল করিতে পারে না কি? বোধ করি, কোনো বৈজ্ঞানিকই এ পর্য্যন্ত এই বিষয়টি লইয়া চিন্তা করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার সময়ে জগদীশচন্দ্রের মনে ঐ প্রশ্নটিরই উদয় হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেক চিন্তার বিষয় আছে।

আমাদের দেহের সর্ব্বাংশে যে সকল পেশী (Muscles) বিন্যস্ত আছে, শরীর-তত্ত্ববিদ্ সে-গুলিকে স্বায়ত্ত (Voluntary) পেশী এবং অনায়ত্ত (Involuntary) পেশী—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন। স্বায়ত্ত পেশীকে আমরা ইচ্ছামত চালনা করিতে পারি, কিন্তু অনায়ত্ত পেশীকে যথেচ্ছ চালাইবার শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু কোন কোন ক্ষমতাবান্ পুরুষ যে অনায়ত্ত পেশীকে নিজের ইচ্ছাধীন করিতে পারেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যে-পেশীর চালনায় হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন হয়, তাহা অনায়ত্ত, অর্থাৎ তাহার ক্রিয়ার উপরে মানুষের হাত নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই হৃদ্‌স্পন্দন রোধ করিতে পারে, এ-রকম্ লোকও তিনি দেখিয়াছেন। আমাদের অন্ত্রের (Intestines) পেশীর যে কৃমি-গতি (Peristalsis) আছে, তাহা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। কিন্তু ইচ্ছা অনুসারে কেহ কেহ যে অন্ত্রের কৃমিগতিকে নিয়মিত করিতে পারেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জগদীশচন্দ্র পাইয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, কৃমি-গতিকে ইচ্ছানুসারে বিপরীত দিকে চালনা করিতেও তিনি দেখিয়াছেন। রন্‌জেন্ রশ্মির

(X-Rays) সাহায্যে ফোটোগ্রাফ্ ছবি তোলায় ঐ কৃমি-গতি সুস্পষ্ট হইয়াছিল। সাধনা দ্বারা এবং একাগ্রতার সাহায্যে মানুষ ইচ্ছাশক্তিকে যে কতদূর উন্নত করিতে পারে, কোন বৈজ্ঞানিকই এ পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। সুতরাং, উন্নত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা যে স্নায়ুর উত্তেজনা-বহন-শক্তিকে প্রয়োজন অনুসারে খর্ব্ব ও প্রবল করা যাইতে পারে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো হেতুই নাই। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কি প্রকারে স্নায়ুর কার্য্যকে নিয়মিত করা যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র নিম্নলিখিত একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন।

এক সময়ে জগদীশচন্দ্রকে কুমায়ুন প্রদেশের সীমান্তস্থিত কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। গবেষণার জন্য বন্য লতাপাতা সংগ্রহ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কোন ক্ষুদ্র গ্রামের নিকটে গিয়া শুনিলেন, একটি প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া দিনের পর দিন গ্রামবাসীদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে। সে দিন-দুপুরেও অত্যাচার করিতে ছাড়িতেছে না। কিন্তু নিঃসহায় গ্রামবাসীরা যখন কোন উপায়েই বাঘটিকে মারিতে পারিল না, তখন গ্রামের লোকেরা কালু সিংহের শরণাপন্ন হইল। কালুর একটা পুরাতন বন্দুক ছিল। গ্রামবাসীদের অনুরোধে সে ভাঙ্গা বন্দুকে বারুদ ভরিয়া বাঘ শিকারে বাহির হইল।

সেদিন বাঘটি একটি মহিষকে মারিয়া মাঠে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কালু সেই মরা মহিষের কাছে ঝোপের আড়ালে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কাছে দুই একটি ছোট ঝোপ ছাড়া বড় গাছপালা কিছুই ছিল না। কয়েক ঘণ্টা পরে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাঘটি কালুর চারি হাত তফাতে দেখা দিল। ভয়ে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। বন্দুক তুলিয়া যে শিকারটিকে লক্ষ্য করিবে, সে ক্ষমতাটুকুও

তাহার রহিল না। কিপ্রকারে এই দারুণ ভয় দূরীভূত হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করায় কালু বলিয়াছিল—"যখন দেখিলাম, আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছে, তখন আমি নিজেকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—'কালু সিং! তোমাকে এখানে কে পাঠাইয়াছে? ভাবিয়া দেখ, সমস্ত গ্রামের জীবন-মরণ তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে না কি?—'মনে মনে এই কথা বলার পরে, আমি আর কাপুরুষের মতো লুকাইয়া থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তার পরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। আমার দেহের সেই কাঁপুনি কোথায় চলিয়া গেল, আমি পাহাড়ের মতো দৃঢ় হইলাম। এদিকে বাঘটি আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্যোগ করিল। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু ও আস্ফালন দেখিয়া ভয় পাইলাম না। তার পরে সে যেই আমাকে লক্ষ্য করিয়া ঝাঁপ দিল আমিও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়িলাম। পরক্ষণেই সেই গুলিরই আঘাতে বাঘটি আমার সম্মুখে মারা গেল।"

সুতরাং বহিঃপ্রকৃতির উত্তেজনা আমাদের অনুভূতির উপরে যে প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব তাহা অপেক্ষা কম নয়। স্নায়ুকে নিজের আয়ত্তে রাখিয়া, মানুষ বহিঃপ্রকৃতির উত্তেজনাজাত অনুভূতিকে বদলাইতে পারে। বহিঃপ্রকৃতি জড়ের উপরে যতই প্রভাব দেখাক, মানুষের উপরে তাহার প্রভাব অখণ্ড নয়। মানুষকে অদৃষ্টের ক্রীড়ানক বলা, মহা ভুল। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরে জয়ী হইবার তেজ তাহার মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বর্ত্তমান আছে। যে পথ দিয়া বাহিরের উত্তেজনা দেহে প্রবেশ করে, তাহার চাবি মানুষেরই হাতে আছে। সে ইচ্ছা করিলেই সে পথ মুক্ত রাখিতে পারে এবং রোধও করিতে পারে। যে অশ্রুত বাণী শ্রোতার সন্ধানে আমাদের চারিদিকে নিয়ত ঘুরিয়া মরিতেছে,

তাহা স্বকর্ণে শুনিবার উপায় মানুষেরই আয়ত্তে আছে। বাহিরের নানা কোলাহল ও উপদ্রব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইবার উপায়ও সে জানে। উদ্ভিদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণীর দিকে অগ্রসর হইলে, তাহাদের যে বিচিত্র রূপ নজরে পড়ে, তাহা উহাদের প্রাণেরই অভিব্যক্তির মূর্ত্তি। স্বদেশ ভক্তের আত্ম-বলিদানে, যোগীর অপরূপ-রতনের সন্ধানে, যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ফুটিয়া উঠে, তাহাতে আমরা সেই প্রাণেরই অভিব্যক্তির ধারা দেখিতে পাই। এই অভিব্যক্ত প্রাণ বাহিরের বন্ধনে বাঁধা পড়ে না, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে সকলের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

জড়ের পুলক, প্রাণের স্পন্দন, জীবনের অপূর্ব্ব ছন্দ, ভিতরে বাহিরে ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা—এগুলি যত বিচিত্র, তাহাদের যোগসূত্র ততই দৃঢ়! যখন দেখা যায়, উত্তেজনার হিল্লোল স্নায়ুর ভিতরে চলিয়া ভক্তের ভক্তিতে মাতার মাতৃত্বে, কবির কবিত্বে এবং ভাবুকের ভাবধারায় মূর্ত্তিমান্ হইয়া ছায়াবাজী দেখাইতেছে, তখন সত্যই অবাক্ হইতে হয়। তখন জানিতে ইচ্ছা হয়, এই জড়-দেহ এবং সেই ছায়ার মধ্যে কোন্‌টি ধ্রুব, কে অক্ষয় এবং কে অমৃত।

অনেক জাতি, অনেক রাজা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পৃথিবী শাসন করিয়াছে। আজ ভূতলে তাহাদের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে সকল রাজবংশের ঐহিক শক্তিতে জগৎ কম্পমান হইত আজ তাহাদেরই বা চিহ্ন কোথায়? এখন মাটি খুঁড়িয়া দুই চারিখানি ইষ্টকে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। এই চিহ্নও দু'দিন পরে লোপ পাইবে। জড়ের এই কি নিয়তি? ইহা জড়ের একটি রূপ বটে, কিন্তু ইহার একটি অক্ষয় রূপও আছে। পরম্পরার পুঞ্জীভূত চিন্তা ও ভাবসম্পদ্, যাহা এখন আমাদের সম্মুখে হোমাগ্নির শিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে, তাহাই ঐ অক্ষয় রূপ। মানুষ যখন স্বাধিকারে, সিদ্ধিতে এবং জড়ে অমৃতের সন্ধান করে, তখন ব্যর্থমনোরথ হয়। এই জগতে চিন্তা ও ভাবই অমৃত।

সমাপ্ত।

রায়-সাহেব জগদানন্দ রায় মহাশয়ের

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী

যে-সকল আবিষ্কারের দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান জগদ্বাসীকে চমকিত করিয়াছে, নিম্নের চারিখানি পুস্তকে তাহার অধিকাংশই বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের কিছুই জানেন না, এই পুস্তকগুলি পাঠ করিলে তাঁহারা **অনেক** জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন :—

১।	প্রাকৃতিকী	... ... ৩
২।	প্রকৃতি-পরিচয়	... ... ১॥/
৩।	বৈজ্ঞানিকী	... ... ১॥
৪।	সার জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার	... ২॥

নিম্নের পুস্তকগুলিতে গল্পের মতো করিয়া অতি সরল ভাষায় নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবৃত করা হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যা প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা কিছুই বাদ যায় নাই। বালক বালিকারা এই সকল পুস্তক পাইলে আগাগোড়া না পড়িয়া ছাড়িবে না। যে সকল পাঠক-পাঠিকা বিজ্ঞান পড়েন নাই, তাঁহারা বিজ্ঞানের নানা শাখার সহিত পরিচিত হইবেন :—

১।	গ্রহনক্ষত্র	১৸৹	৬।	পাখী	১৲
২।	বিজ্ঞানের গল্প	১৲	৭।	বাংলার পাখী	১॥৹
৩।	মাছ ব্যাঙ সাপ	১॥৹	৮।	শব্দ	১৲
৪।	পোকামাকড়	২৲	৯।	আলো	২৲
৫।	গাছপালা	২॥৹	১০।	চুম্বক	১।৹
			১১।	চলবিদ্যুৎ	২৲

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।